রাজা রামমোহন : বঙ্গদেশের অর্থনীতি
ও
সংস্কৃতি

ডঃ কুমুদকুমার ভট্টাচার্য

বর্ণপরিচয়
২১৪/১ বামাচরণ রায় রোড কলকাতা ৭০০০৩৪

অষ্টাদশ শতকের মেদিনীপুরের চোয়াড়-বিদ্রোহের নায়ক
গোবর্ধন দিকপতি,

উনিশ শতকের ওয়াহাবী-বিদ্রোহের নায়ক
তিতুমীর
ও
বিশ শতকের কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের নায়ক
হরেকৃষ্ণ কোঙার-এর
অমর স্মৃতির উদ্দেশে

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মনসা চিন্তিতং কর্ম ইতিহাস সমন্বিতম্

—ঋক্‌বেদ

History is the presentation in chronological order of successive changes in the means and relations of production.

D. D. Kosambi

এই লেখকের রচিত গ্রন্থ

১. শরৎচন্দ্র ও বাংলার কৃষক [দ্বিতীয় মুদ্রণ] ॥ ১২ টাকা

২. উনিশ শতকের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও কবি গোবিন্দ দাস ॥ ১৮ টাকা

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ পুরস্কার-প্রাপ্ত গ্রন্থ।
রায়ত-কৃষকের উপরে ভূস্বামীশ্রেণীর অত্যাচার-সম্পর্কিত
'মগের-মুল্লুক' কাব্য ও কবি-জীবন সম্পর্কে আলোচনা।]

৩. আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা ॥ ৫০ টাকা

[বৈদিক যুগ থেকে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত এদেশের শিক্ষা-বিস্তারে
শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণীসংঘর্ষের ইতিহাস।]

৪. রামমোহন-ডিরোজিও : মূল্যায়ন ॥ ১৮ টাকা

গ্রন্থ-প্রসঙ্গে

রাজা রামমোহন রায়ের দ্বিজন্মশতবর্ষ পালনোপলক্ষে বিভিন্ন সেমিনারে ও সভায় গিয়ে রামমোহন সম্পর্কে সকলের বক্তৃতায় আজন্মলালিত ধারণার সমর্থন পেয়েছিলাম। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও যে-সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তা পাঠ করে রামমোহনের সমর্থনে একটা সুস্পষ্ট চিন্তা গড়ে উঠেছিল। ভেবেছিলাম, রাজা রামমোহন শ্রেণীস্বার্থ-অতিক্রমণকারী উনিশ শতকের বিদ্রোহী নায়ক। বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের জন্য তাঁর ভালোবাসা আমাকে উদ্বেলিত করেছিল। তখন বুঝতে পারিনি, তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ ভারতবর্ষে দেবতাদের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে।

কিন্তু মোহভঙ্গ ঘটল অচিরেই, যখন রায়ত-প্রসঙ্গে বাংলার বিদ্বৎসমাজের মনোভাব কি ছিল সে-সম্পর্কে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলাম। পুরোনো পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন গ্রন্থ পড়তে গিয়ে দেখলাম যে, ইতিহাসকারেরা শ্রেণী-নিরপেক্ষ নন। শোষকশ্রেণীর প্রসাদভিক্ষু ইতিহাসবিদেরা শ্রেণীস্বার্থে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে বিকৃত-খণ্ডিত কিংবা গোপন করে যে-ভাবে ইতিহাস রচনা করেছেন, তা 'ইতিহাস' শব্দের আভিধানিক অর্থের বিপরীত। অথচ তাঁদের সযত্ন-রচিত ইতিহাস নামক গল্প-কাহিনীকে আমরা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করি — আমাদের মানসলোকে গড়ে ওঠে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের দেব-মূর্তি —ঢাকা পড়ে তাঁদের মানব-রূপ। এমনই এক দেব-বিগ্রহ হলেন রাজা রামমোহন রায়।

কারোর হাতে যদি দেব-বিগ্রহের অঙ্গহানি ঘটে, যদি তার রঙ মুছে গিয়ে খড়-মাটি বেরিয়ে পড়ে, তাহলে যে-দেব-ভক্তেরা ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হন এবং সক্ষম হলে দেব-বিদ্রোহীর গলা, নিদেনপক্ষে তাঁর হাত চেপে ধরেন, সে অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। তবে আমাকেও সে-অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হ'ল। দেখতে পেলাম তাঁদের কুৎসিত মুখ-ব্যাদান যখন অধ্যয়ন-শেষে লবণ-শিল্পে রাজা রামমোহনের ভূমিকার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে একটি অতি বিপ্লবী বাংলা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলাম। সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় নিজেদের বিপ্লবী চেতনার ধারক-বাহক-রূপে পরিচয় দিলেও তাঁরা বিরুদ্ধ-কণ্ঠস্বর শুনতে প্রস্তুত নন। তাই প্রবন্ধটি ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে সম্পাদক মহাশয় লিখেছেন, "……—র (শূন্য স্থানে পত্রিকাটির নাম রয়েছে। সৌজন্য-বশত পত্রিকার নাম উল্লেখ করলাম না। —লেখক) পক্ষে 'বঙ্গদেশের লবণ-শিল্প ও রাজা রামমোহন' বৃহদাকার বিশিষ্ট প্রবন্ধ। আমরা এখন রাম-মোহনের বিরোধিতা করে কিছু প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক।"

তবে সান্ত্বনা এই যে, বিশ শতকের শেষভাগের পশ্চিম বাংলায় দেব-

ভক্তেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ রয়েছেন। তা প্রমাণিত হ'ল যখন 'চতুষ্কোণ', 'দর্পণ,' 'দিগদর্শন', 'তিস্তা থেকে গঙ্গা', 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকা রামমোহন সম্বন্ধে রচিত আমার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তীব্র। তাই রাজা রামমোহন সম্পর্কে আমার অনুসন্ধান অব্যাহত থাকলেও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ-রচনা থেকে বিরত হয়েছিলাম।

সুদীর্ঘ কাল পরে   সালে রাজা রামমোহন-সম্পর্কিত আমার সামগ্রিক চিন্তাধারা সূত্রাকারে 'রামমোহন-ডিরোজিও : মূল্যায়ন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় উপলব্ধি করেছিলাম যে, দেবভক্ত পণ্ডিত ব্যক্তিরা দেড় শ' বছর ধরে ধূপ-ধুনো দিয়ে মানুষ-রামমোহনকে আড়াল করতে চাইলেও ব্যর্থ হয়েছেন। একালের সমাজ-সচেতন ও যুক্তিনিষ্ঠ পাঠকসমাজ সমকালীন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজা রামমোহনের সঠিক মূল্যায়ন চান। অনেক পাঠক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার জন্য অনুরোধ করে চিঠি লিখেছেন।

'রামমোহন-ডিরোজিও : মূল্যায়ন' গ্রন্থটি যে বুর্জোয়া-মতাদর্শে বিশ্বাসী পণ্ডিতদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলবে, তা অনুধাবন করতে পারিনি। কিন্তু উপলব্ধি করলাম তখনি, যখন আনন্দবাজার পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনার নামে শ্রীঅশোক রুদ্রের রুদ্রমূর্তি প্রত্যক্ষ করলাম। তিনি আতঙ্কিত হয়ে লিখেছেন (৩১.৩.৮৬), "বেশ কিছুদিন যাবতই পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে—উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবীদের, যাঁদের একসময় চিন্তা, কর্ম ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য 'রেনেসাসের' নায়ক বলে অভিহিত করা হত, তাঁদের সকলকেই ভাঙা কুলোয় আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করার। এই প্রবণতাটির জন্ম দিয়েছিলেন নকশালেরা। আশ্চর্যের কথা, নকশালদের এই একটিমাত্র অবদান আর সকলেই মেনে নিয়েছেন, দক্ষিণ-পন্থী পণ্ডিত নীহাররঞ্জন রায় পর্যন্ত।" এবং 'কুমুদবাবু পণ্ডিত-গবেষক নন।"

অসংখ্য ধন্যবাদ পণ্ডিত-ব্যক্তি শ্রীঅশোক রুদ্র মহাশয়কে। তিনি আমাকে 'পণ্ডিত-গবেষক' মনে করে ভুল করেননি। তবে ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর 'পাণ্ডিত্য' দেখে খোদাওন্দ তালার কাছে তাঁর জন্য দোয়া মাঙতে হয়। কিন্তু ইতিহাস সম্পর্কে পণ্ডিত ব্যক্তিদের এই জাতীয় মন্তব্য ইতিহাস সম্পর্কে স্বল্পজ্ঞান, না ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা? এই শতাব্দীর ছয় এর দশকের শেষদিকে নকশালপন্থীদের আবির্ভাবের বহুপূর্বেই উনিশ শতকের তথা-কথিত 'নবজাগরণ' ও তার নায়কদের নতুনভাবে মূল্যায়নের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ভারতের স্বাধীনতা-লাভের পরে শ্রীঅশোক মিত্র ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে এই বিষয়ে প্রচলিত ধারণার বিরোধী মন্তব্য করেছেন। বর্তমান গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর অভিমত উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্রী এ. আর. দেশাই তাঁর 'Social Background of Indian

Nationalism' গ্রন্থে লিখেছেন, "A capitalist nation has a high sense of patriotism and nationalism since it is socially,economically and politically highly integrated. That is why throughout the whole history of British conquest of India one hardly comes across Britons who betrayed the interests of their own country in India in contrast to hundreds of Indians, princes, generals or merchants who went over to the British and assisted them to dominate India."

মার্কসবাদী পণ্ডিত শ্রী মোহিত মৈত্র বলেছেন, "Tradition has recognised it as Renaissance, but it is now being rightly challenged. If it was Renaissance, it was of a very weak and limited type. Though it did not touch the life of the fighting common man it brought about a change in the environments of cities among higher and middle classes. Further it must be realised here that British capitalism which was forcibly imposed on the country also brought certain changes in the life of the people. The newly created Indian middle class also imbibed some features of British bourgeois society but this class did not practically extend beyond the limits of Calcutta."

'দুর্বল ও সীমাবদ্ধ' হলেও এই আন্দোলনকে 'নবজাগরণ' নামে চিহ্নিত করতে মার্কসবাদী বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেই দ্বিধা করেননি এবং এই আন্দোলনের নায়ক রাজা রামমোহনকে সামন্ত-স্বার্থ-বিরোধী নেতা-রূপে অভিহিত করেছেন এবং সে-কারণে উক্ত গ্রন্থটিকে তাঁরা প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা সমালোচনা করলেও মনে পড়ছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) নেতা বিমান বসুর আলোচনা। এই গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "একদিন আপনি থাকবেন না, আমিও থাকবো না। কিন্তু থাকবে এই দেশ আর সাধারণ মানুষ। পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থায় ভবিষ্যতের মানুষ বিচার করবেন কাদের বক্তব্য সঠিক।" প্রকৃতপক্ষে তাঁর আলোচনাতে উৎসাহিত হয়ে বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি-লগ্ন থেকেই শ্রেণীর আবির্ভাব ও সেইসূত্রে শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বর্তমান। শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্বে সমাজভুক্ত মানুষ দু'টি শিবিরের মধ্যে যে কোনো একটির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন। যতদিন শোষকশক্তি ক্ষমতাশালী থাকে, ততদিন অর্থনৈতিক দিক থেকে মধ্যবর্তী পর্যায়ের মানুষ শোষিত হলেও নিজেদেরকে শোষিত শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করেন না; তাঁরাও

কিঞ্চিৎ লাভের আশায় শোষকশ্রেণীর ভাবাদর্শ গ্রহণ করে শোষণমূলক অর্থনীতির অংশীদার হন। এই ইতিহাসের ব্যতিক্রম নয় উনিশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস। সে-ইতিহাস হ'ল শ্রেণী-সংঘর্ষের ইতিহাস—কৃষকশ্রেণীর রক্তক্ষরণের ইতিহাস, ভূস্বামীশ্রেণীর সমৃদ্ধির ইতিহাস, মধ্যশ্রেণীর অংশভাগী হওয়ার ইতিহাস, বিদেশী বণিক-শক্তির সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে এদেশীয় পরগাছাদের উত্থানের ইতিহাস। এই ঐতিহাসিক সত্যকে ভুলে যান বলে রামমোহন-মূল্যায়নে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকের বিড়ম্বনা ঘটে —অজ্ঞাতসারে তাঁরা বুর্জোয়া ভাবাদর্শে আচ্ছন্ন হয়ে রাজা রামমোহনকে সমাজ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন। তখন তাঁদের কাছে মনে হয়, রাজা রামমোহন 'আধুনিক ভারতের জনক,' 'ভারতে বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নায়ক।' কিমাশ্চর্যমতঃপরম্, যিনি শাস্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে যথাযথভাবে শাস্ত্রীয় অনুশাসন পালনের জন্য সমগ্র জীবন আন্দোলন করেছেন এবং আজীবন উপবীত ধারণ করেছেন, তিনিই হলেন 'বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নায়ক'! এভাবেই বুর্জোয়া-সেবাদাস পণ্ডিতদের প্রচারে রাজা রামমোহন দেব-রূপ লাভ করেছেন।

সুতরাং মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমকালীন সমাজ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের পটভূমিতে উনিশ শতকের 'নবজাগরণ'-এর স্বরূপ ও সীমাবদ্ধতা এবং রাজা রামমোহনের কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক (যা কৃষকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত) দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে। তাঁকে দেখেছি মানুষ-রূপে, দেবতা কিংবা দানব-রূপে নয়। তাঁর রাজনৈতিক মতামত নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনার অবকাশ না থাকলেও এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাজা রামমোহনের রাজনৈতিক আদর্শ তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় কিংবা বিপরীত কোটিতে নয়। তাঁর রাজনৈতিক চেতনা অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

রাজা ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। রামমোহন ও তাঁর সহযোগী প্রিন্স দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার প্রমুখ ইংরেজ-সরকারের প্রতি 'অবিচলিত আনুগত্য ও অসীম আস্থা' প্রকাশ করে বলেছেন, এ-দেশে "ব্রিটিশ-শাসনের ন্যায় তাঁদের আনুগত্য চিরস্থায়ী হবে।" কারণ "যাঁরা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থেকে ঐশ্বর্যশালী হয়েছেন এবং যাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে শান্তিতে জমিদারী ভোগ করছেন, তাঁরা তাঁদের বিচক্ষণতা দ্বারা ইংরেজ-শাসনাধীনে ভবিষ্যৎ উন্নতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে সক্ষম।"

রাজা ব্রিটিশ-বিরোধী সমালোচনার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ইংরেজ-সরকারকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, কানাডার ন্যায় ভারতও ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। কিন্তু ঘটনাক্রমে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-অধীনতা থেকে মুক্ত হলেও

জ   র   মতে তা হবে দু'টি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী দেশের অর্থাৎ ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে এবং তাতে বাণিজ্যিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকবে। রামমোহনের এই উক্তিতে জাতীয়তাবোধের কোনো পরিচয় নেই। এমন-কি তাঁর 'উদারনৈতিক ধর্মমতের'ও কোনো প্রকাশ নেই। কেবলমাত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর শ্রেণী-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার প্রয়াস —যে-শ্রেণী ব্রিটিশ বণিকদের সঙ্গে মৈত্রী- বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে 'ব্যবসায়ে নিযুক্ত থেকে' 'শান্তিতে জমিদারী ভোগ' করতে চেয়েছেন। তাই শ্রেণীস্বার্থে রাজা অভয় দিয়ে ব্রিটিশ-সরকারের ভারত-উপনিবেশ হারানোর আতঙ্ক দূর করার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন।

এই সমালোচনা রাম-ভক্তদের দেবার্চনায় বিঘ্ন ঘটাবার কারণ হলেও আমি নাচার। বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী বলেই সমকালীন ঘটনাবলীকে অস্বীকার করে গগন-বিলাসী পণ্ডিতদের মতো রাজা রামমোহনের মূল্যায়ন করিনি; গতানুগতিক সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে সত্য-দর্শনের চেষ্টা করেছি। জানি না, আমার এই প্রয়াস সফল হয়েছে কি না —তার বিচার করবেন সমাজ-সচেতন পাঠকসমাজ।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি 'রাজা রামমোহন ও বঙ্গদেশের কৃষক' নামে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। কিন্তু অধ্যাপক-আন্দোলনের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় প্রবীণ মার্কসবাদী নেতা অধ্যাপক অনিল বসাক গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি পাঠ করে বর্তমান নাম দেওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর উপদেশ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

প্রাচীন পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থ সংগ্রহে সাহায্য করেছেন বেহালা কলেজ অব কমার্সের অধ্যক্ষ শ্রী সুনীল কুমার রায়, হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী নিমাই চক্রবর্তী ও ডায়মণ্ডহারবার কলেজের অধ্যাপক শ্রী অসিত দাসগুপ্ত। তাঁদের সাগ্রহ সহযোগিতা আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

গ্রন্থ-প্রকাশের কাজে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন বন্ধুবর শ্রী বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় (বিদ্যোদয় লাইব্রেরী) এবং অগ্রজ-প্রতিম সর্বজনপ্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীত-শিল্পী অধ্যাপক চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের আন্তরিক সহায়তা ভিন্ন গ্রন্থ-প্রকাশ আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন বন্ধুশিল্পী শ্রী সজল রায় এবং প্রচ্ছদ ও ফটোপ্লেট মুদ্রণে নিঃস্বার্থ সাহায্য করেছেন অগ্রজ-প্রতিম কবি ও সাহিত্যিক শ্রী সুধীর মুখোপাধ্যায়। মুদ্রণ-সংক্রান্ত সর্ববিধ কাজে সহযোগিতা করেছেন বন্ধুবর শ্রী শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রী দেবব্রত বসু, অনুজপ্রতিম শ্রী সুবীর দত্ত ও শ্রী তপন দে। তাঁদের ভালোবাসা আমার আগামী দিনের চলার পাথেয়। তাঁদের কাছে আমি চিরঋণী।

পাণ্ডুলিপির অনুলেখন করেছেন আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা অতসী ভট্টাচার্য। এবং সস্নেহ শাসনের জন্য সর্বদাই সক্রিয় ছিল কনিষ্ঠা কন্যা অঙ্গনা। প্রতিকূল সমালোচনার মাঝে নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন আমার সহধর্মিনী শ্রীমতী অমলা ভট্টাচার্য। তাঁদের প্রতি রইল আমার স্নেহ, প্রীতি ও ভালোবাসা।

মুদ্রণ-প্রমাদ সম্বন্ধে সতর্ক থাকলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে। গ্রন্থ-শেষের শুদ্ধিপত্রে সেগুলি সংশোধিত হ'ল। বিশ্বাস করি, সংবেদনশীল পাঠকেরা এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিকে ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখবেন।

বিজ্ঞ পণ্ডিতদের তীব্র ভ্রুকুটি সত্ত্বেও সমাজ-সচেতন লেখক হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থে শতাব্দী-লালিত ভ্রান্ত ধারণা যুক্তির নিরিখে নিরসনের চেষ্টা করেছি। যদি এই গ্রন্থ মোহবদ্ধ সমাজে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য সৃষ্টিকরে, নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করতে শেখায়, তবেই আমার সুদীর্ঘকালের পরিশ্রম সার্থক হবে।

কুমুদকুমার ভট্টাচার্য

রাজা রামমোহন : বঙ্গদেশের অর্থনীতি
ও
সংস্কৃতি
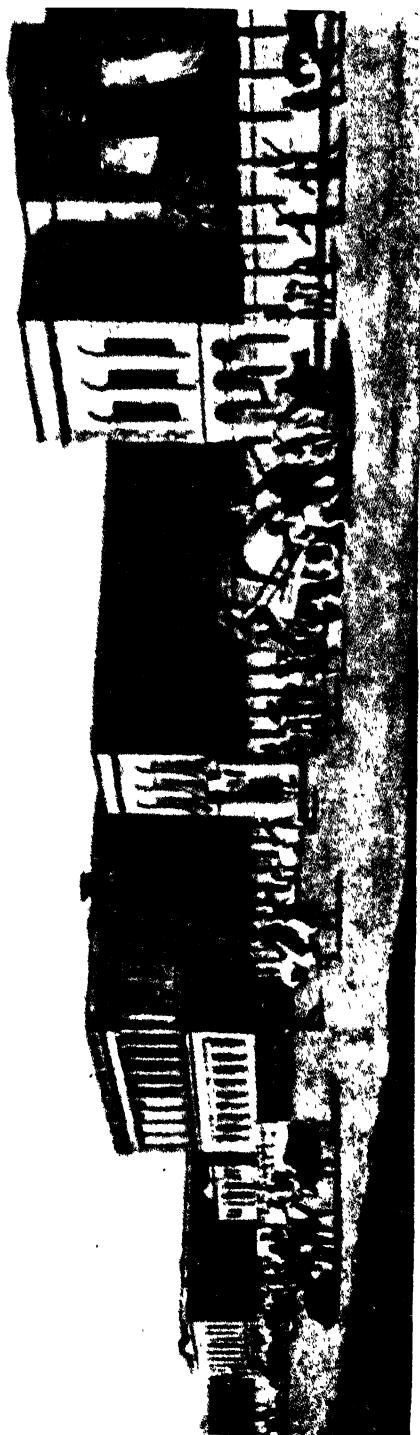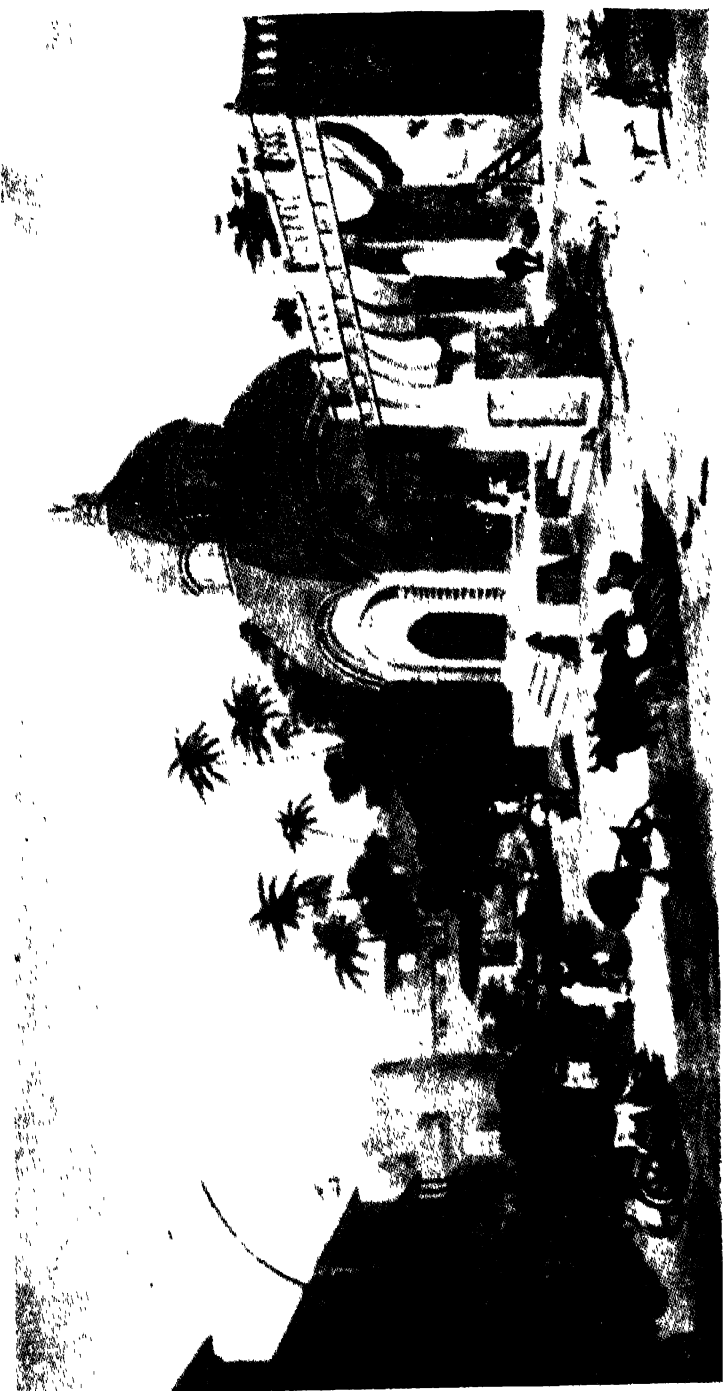
সকালের কলক

১৭৯২ সনের সাহেবপাড়া

১৮৫৩ সালের সাহেবপাড়া

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের নেটিভ-পল্লী

সাহেবের পরিচর্যায় রত ভৃত্য

সাহেবের সেবায় নিরত পরিচারকবৃন্দ

ভূস্বামী-গৃহে আমন্ত্রিত সাহেবদের আমন্ত্রণে বাই-নাচ

ভূস্বামীদের উৎসবে বাই-নাচ

রাজগৃহে বাই-নাচ

নীলগাছ ১১৬ক

নীলগাছ কাটছেন চাষীরা ১১৬খ

বঙ্গদেশে নীল চাষ

নীলকুঠিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য গরুর গাড়িতে নীলগাছ বোঝাই করছেন চাষীরা ১১৬গ

নীলকর সাহেবের কুঠি ১২৬ঘ

নীলগাছ পোড়ানোর চুল্লী ১২৬ঙ
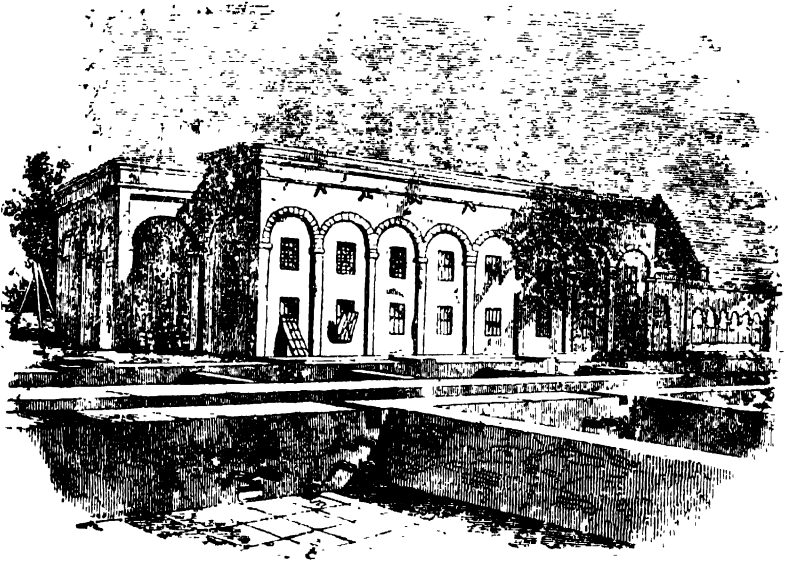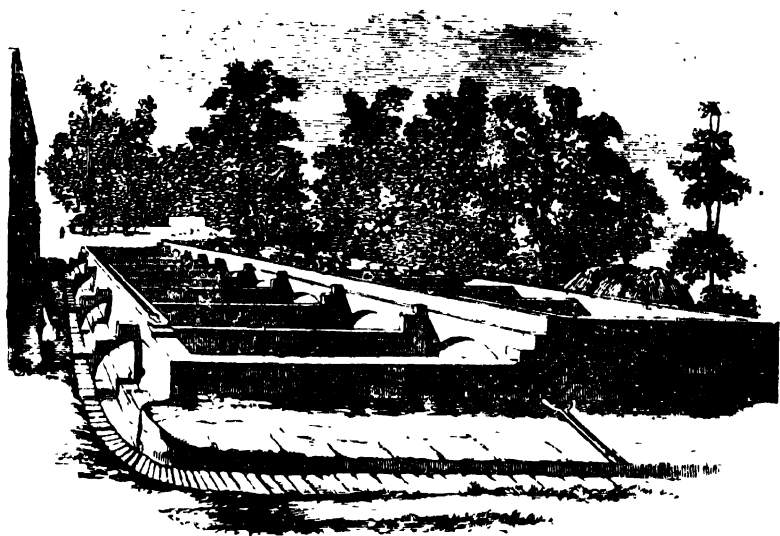
নীলগাছ ডুবিয়ে রাখার জন্য চৌবাচ্চা ১১৬চ

নীল-পেষাই ১১৬ছ

নীল-পেটানো হচ্ছে

১৬জ

নীলকর সাহেবের পাহারাদারের ঘর

১৬ঝ

১
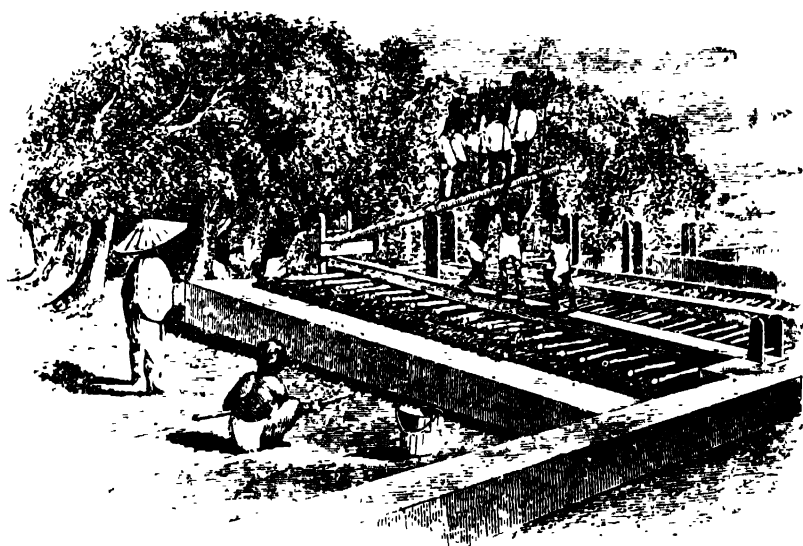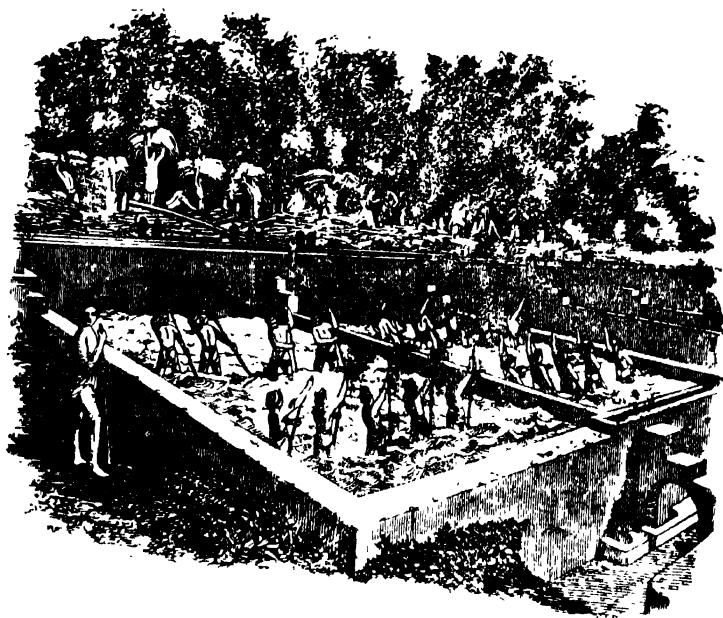
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসন-কার্যে অপদার্থতা ও অক্ষমতা ব্রিটিশ-শক্তিকে ভারতে সাম্রাজ্য-স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছিল। অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকশক্তির সঙ্গে এদেশে উপস্থিত হয়েছিল 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' নামে এক উন্নত ব্রিটিশ-বণিকশক্তি। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বরে টমাস স্মাইথের সভাপতিত্বে গঠিত হয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি; অংশীদার ছিল ৮০ জন, আর প্রারম্ভিক পুঁজি ছিল ত্রিশ হাজার পাউণ্ড। পরের বছরে অর্থাৎ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বরে রাণী এলিজাবেথ ভারতবর্ষ-সহ অন্যান্য পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকার দিয়ে কোম্পানিকে পনেরো বছরের বাণিজ্য-সনদ দান করেন। এ-সময়ে কোম্পানির অংশীদার ছিল ২১৭ জন এবং পুঁজি ছিল আটষট্টি হাজার পাউণ্ড। তাঁরা ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এসে উপস্থিত হন এবং এই বছরেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে সুরাট বন্দরে প্রথম বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্যের স্বার্থে প্রভুত্ব-বিস্তারে সচেষ্ট হন। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি বাংলাদেশের হুগলীতে প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন—এটাই ছিল 'বাংলায় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ মাইল-স্টোন।'[১]

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ আগস্ট জব চার্নক তৃতীয়বার সুতানুটির ঘাটে এসে নামলেন। অরণ্য-পরিবেষ্টিত সুতানুটি গ্রামেই স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে তিনি কোম্পানির বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করলেন। বিদেশী-বণিকদের কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে কলকাতা গড়ে উঠল। অন্যদিকে বাংলার নবাব-সিংহাসন নিয়ে চলেছিল যুদ্ধ-সংঘর্ষ। যুদ্ধে সফররাজ খানকে

পরাজিত করে ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল আলিবর্দী খান বাংলার নবাব হলেন। মাতামহ আলিবর্দীর ক্রোড়ে নবাব-রাজহর্মে সিরাজদ্দৌলা যখন শিশু তখন ভাবী ইংরেজ-মহিমাও কলিকাতায় সওদাগরের কুঠিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অসহায় শিশু জীবন যাপন করিতেছিল। উভয়ের মধ্যে একটি অদৃষ্ট বন্ধন বাঁধিয়া দিয়া ভবিতব্যতা আপন নিদারুণ কৌতুক গোপন করিয়া রাখিয়াছিল।'[২]

কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দুর্বলতা ও শিথিলতার জন্য যখন দেশীয় নৃপতিরা দিল্লীর নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করে নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করছিলেন এবং পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছিলেন, তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভবিষ্যতের পালা-বদলের নাটকে নাম-ভূমিকা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্রমাগত প্রভাব বিস্তার করছিলেন এবং ঢাকা-মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে কলকাতাকে ভবিষ্যতের প্রধান নিয়ামক কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলছিলেন। তাই সামন্ত-শক্তির প্রতিনিধি নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করে বণিকশক্তির ক্ষমতার উৎস-স্থলকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলেন, তখন নবাবের পক্ষভুক্ত জগৎশেঠ-উমিচাঁদ, রাজবল্লভ-কৃষ্ণচন্দ্র, মীরজাফর-মীরণ প্রভৃতি দেশীয় বণিক, জমিদার ও নবাব-পরিবারের আত্মীয়স্বজন পক্ষ পরিবর্তন করে ইংরেজ-বণিকদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করছিলেন। 'এই পক্ষ-ত্যাগের পশ্চাতে তাঁদের কোনো উন্নত আদর্শ কিংবা রাজনৈতিক চেতনা ছিল না; অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। কারণ 'মাঝে মাঝে কিছু সংঘর্ষ দেখা দিলেও অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলার অথনীতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপরে এত বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল যে, এই প্রদেশের বিত্তবান ও বণিকশ্রেণীর সামনে যখন বেছে নেবার প্রশ্ন উঠল, তখন সর্বশক্তি দিয়ে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করতে তারা সামান্য দ্বিধাও করল না।'[৩] তারফলে ইংরেজ-কোম্পানি ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর রণক্ষেত্রে অভিনীত প্রহসনের মধ্য দিয়ে অবলীলাক্রমে বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলেন। শাসক-শোষকের পরিবর্তন ঘটল। সামন্ত-শক্তির বদলে ব্রিটিশ-বণিক শক্তি এদেশের শাসক-রূপে আবির্ভূত হল; কালো চামড়ার পরিবর্তে বিদেশী সাদা চামড়া সর্বাত্মক শোষণের ক্ষমতা লাভ করল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শোষণে-পীড়নে এদেশের গ্রামীণ জীবনে নেমে এল অমানিশার অন্ধকার।

কোম্পানির ক্ষমতা-লাভের পূর্ব-ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইংরেজরা বাংলার নবাব আজিমুশ্শানকে খুশি করে সাবর্ণ চৌধুরীদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব ১৩০০০ টাকা দিয়ে কিনে নেন। এর জন্য তাঁরা মোগল-দরবারে বার্ষিক ১১৯৪ টাকা চৌদ্দ আনা এগারো পাই খাজনা পাঠাতেন। প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করার জন্য তাঁরা র‍্যালফ স্পেলডন নামে একজন ইংরেজকে কালেক্টর-পদে নিয়োগ করেন। তিনিই হচ্ছেন কলকাতার প্রথম বিদেশী জমিদার বা কালেক্টর। 'অন্যান্য জমিদারদের মতো কোম্পানীও লাভ করল জমিদারী

শাসনের সব ক্ষমতা। জমিদারী লাভের মাধ্যমেই কোম্পানি দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রথম অনুপ্রবেশ করে। বলা বাহুল্য যে, তিনটি গ্রাম নিয়ে এ ক্ষুদ্র জমিদারী ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়ে কালে সমগ্র দেশই কোম্পানীর জমিদারীতে পরিণত হয়।'[৪] তবে তাঁরা উক্ত তিনটি গ্রামের প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় ও মুসলমানী আইন অনুসারে বিচার-ব্যবস্থা স্থাপনের অধিকার পেলেও ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাদশাহের কাছ থেকে কোনো ফরমান পাননি ; ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগল বাদশাহ ফারুখশিয়ার সেই ফরমান-সহ আরো ৩৮টি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব কেনার অধিকার তাঁদের দিয়েছিলেন, অবশ্য উপঢৌকনের বিনিময়ে।[৫]

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ আগস্ট দিল্লীর বাদশাহ শাহ্ আলমের কাছ থেকে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি-সনদ লাভ করেন। বিনিময়ে তাঁরা দিল্লীর সম্রাটকে নিয়মিতভাবে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা ও বাংলার নবাবকে বাৎসরিক ৫৩,৮৬,১৩১ টাকা রাজস্ব দেবেন। ক্লাইভ কোর্ট অব ডাইরেক্টর্সকে জানিয়েছেন যে, এর ফলে 'নবাব এখন বস্তুত কোম্পানীর পেনশনার মাত্র। বাদশাও তাই। সমস্ত কোম্পানীর হাতে।...দেওয়ানীর ফলে কোম্পানীর যে আয় হবে তা দিয়ে কোম্পানীর সমস্ত খরচ কুলিয়ে ব্যবসার সমস্ত পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব।'[৬] অর্থাৎ এদেশে ব্যবসা করার জন্য ব্রিটেন থেকে পুঁজি আনার প্রযোজন নেই, পুঁজি এখান থেকে সংগ্রহ করা যাবে। বাস্তবে ঘটল তাই। ব্রিটেন থেকে সোনা-রূপা নিয়ে এসে কোম্পানি যে-ব্যবসা করতেন, পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ব্রিটেন থেকে সোনাদানা আমদানি বন্ধ করে দিয়ে এদেশ থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে সেই ব্যবসা করেছেন। এমন-কি তাঁরা দূর-প্রাচ্যের বাণিজ্যের জন্য বাংলাদেশ থেকে সোনা-রূপা রপ্তানি করেছেন। এমনিভাবে সমগ্র এশিয়ায় কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্যের পুঁজির যোগানদার হয় বাংলাদেশ —সে হয় রিক্ত ; আর এর মুনাফা ভোগ করে ব্রিটেন —সে হয় সমৃদ্ধ।

দেওয়ানি-লাভের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পুঁজি সংগ্রহের জন্য পুরানো রাজস্ব-ব্যবস্থার পরিবর্তে যে-নতুন রাজস্ব-ব্যবস্থা চালু করলেন, তারফলে বহু পুরানো বনেদী জমিদারের (যেমন, নাটোর, নদীয়া, দিনাজপুর প্রভৃতি) জমিদারি হাত-ছাড়া হল ; সর্বোচ্চ হারে রাজস্ব দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই সমস্ত জমিদারি দখল করে আবির্ভূত হলেন নয়া জমিদাররা। এঁদের ভয়ঙ্কর শোষণ-অত্যাচারের ফলে বাংলার কৃষক-সমাজ রক্তশূন্য হয়ে পড়লেন, ঘরে ঘরে শোনা গেল মৃত্যুর আর্তনাদ।

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে প্রাচীন ভারতীয় গ্রাম-সমাজে জমির উপরে গ্রামের সমস্ত মানুষের যে-যৌথ অধিকার ছিল এবং যৌথ অধিকারভোগী কৃষকদের পক্ষ থেকে সমবেতভাবে উৎপন্ন মোট ফসলের একটা নির্দিষ্ট অংশ ভূমিকর (রাজস্ব) হিসাবে শাসক-প্রতিনিধি 'জমিদার'কে দেবার যে-ব্যবস্থা হিন্দু ও মোগল আমলে প্রচলিত ছিল, তা বাতিল করে ব্রিটিশ-বণিকরা সর্বোচ্চ হারে মুদ্রায় কর দেবার ব্যবস্থা

প্রবর্তন করলেন এবং জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য মহম্মদ রেজা খাঁ, সীতাব রায়, দেবী সিংহ প্রভৃতিকে 'সুপারভাইজার' বা 'নাজিম' নিযুক্ত করলেন। জমির মালিক হলেন কোম্পানি এবং কৃষকরা হলেন রায়ত। জমিদারি ইজারা দেবার জন্য কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রতি বছরে নিলাম ডাকা হত। নিলামে যে-ব্যক্তি সর্বোচ্চ হারে খাজনা দেবার প্রতিশ্রুতি দিতেন, কোম্পানি তাঁকেই খাজনা আদায়ের ভার দিতেন। ফলে ব্রিটিশ-বণিকদের অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে নাজিমরা ও নয়া ইজারাদাররা চাষীদের কাছ থেকে অবাধ লুণ্ঠনের অধিকার লাভ করলেন এবং জোর-জুলুম করে প্রজাদের কাছ থেকে তাঁদের শেষ কানাকড়িটি পর্যন্ত কেড়ে নিতে আরম্ভ করলেন।

এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম বছরেই (১৭৬৫-৬৬ খ্রী:) কোম্পানির কর্মচারীরা প্রায় দ্বিগুণ রাজস্ব (২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা) আদায় করলেন, যেখানে তার পূর্ববর্তী বছরে অর্থাৎ ১৭৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আদায়ীকৃত ভূমিরাজস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা।[৭] এভাবে একদিকে বলপূর্বক রাজস্ব আদায়, অন্যদিকে কর্মচারীদের বেআইনী উৎকোচ গ্রহণ ও ব্যক্তিগত ব্যবসার নামে লুণ্ঠন এবং কোম্পানির 'প্রকাশ্য' ব্যবসা অর্থাৎ রাজস্বের এক অংশ লগ্নি করে এদেশ থেকে পণ্য 'ক্রয়ের' নামে বলপূর্বক কেড়ে নিয়ে ইউরোপে চালান করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা অর্জন বাংলার কৃষি-অর্থনীতিতে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয় সৃষ্টি করল। ১৭৬৯ সনে ব্রিটিশ-কোম্পানির মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট রিচার্ড বেচার কোম্পানির কর্তাদের কাছে লিখেছেন, "ইংরেজ মাত্রেরই ইহা মনে করিতে ক্লেশ হইবে যে কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করিবার পর এই দেশের লোকের অবস্থা পূর্বের অপেক্ষা অনেক খারাপ হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে সত্য, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এই সুন্দর দেশে স্বেচ্ছাচারী রাজাদের অধীনেও স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ ছিল, কিন্তু যখন ইহার শাসনভার প্রধানত ইংরেজদের হাতে আসিল তখন হইতে ইহা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে।

"আমার এখনো মনে পড়ে যে, এদেশবাসীরা যখন স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারিত তখন ইহার কী ঐশ্বর্য ও সম্পদ ছিল। ইহার বর্তমান ধ্বংসের অবস্থা দেখিয়া আমি খুবই দুঃখিত।"[৮]

কেবলমাত্র 'প্রকাশ্য' ব্যবসার জন্য পণ্য 'ক্রয়' নয়, বণিক-কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলার নবাব-সিংহাসনকে নিলামে চড়িয়ে বহু লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পরে তাঁরা একজনের পরে আর একজনকে নবাব করেছেন এবং তার বিনিময়ে উৎকোচ গ্রহণ করেছেন। সিরাজদ্দৌলার পরে মীরজাফর, মীরজাফরের পরিবর্তে মীরকাশিম, আবার মীরজাফর, তারপরে তাঁর পুত্র নাজমউদ্দৌলাকে নবাবের গদিতে বসানোর বিনিময়ে শ্বেতাঙ্গ বণিকরা যে উৎকোচ আদায় করেন, তার কয়েকটি হিসাব দেওয়া হল :

'সিরাজদ্দৌলার বদলে মীরজাফরকে নবাব করবার সময় ক্লাইভ দক্ষিণা পেয়েছিল

২,১১,৫০০ পাউণ্ড, ওয়াটস ১,১৭,০০০ পাউণ্ড, কিলপ্যাট্রিক ৬০,৭৫০ পাউণ্ড, ওয়াল্‌স ৫৬,২৫০ পাউণ্ড, ড্রেক ৩১,৫০০ পাউণ্ড, ম্যানিংহাম ও বেশার প্রত্যেকে ২৭,০০০ পাউণ্ড, সক্রাফটন ২২,৫০০ পাউণ্ড, বোডাম, ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড, মাকেট, কোলেট, আমিয়ট ও মেজর গ্রাণ্ট প্রত্যেকে ১১ হাজার পাউণ্ডের কিছু বেশি করে। সবচেয়ে কম পেয়েছিল লুশিংটন মাত্র ৫,৬২৫ পাউণ্ড। আবার মীরজাফরের বদলে মীর-কাশিমকে নবাব করবার সময় ভ্যানসিটার্ট নিয়েছিল ৫৮,৩৩৩ পাউণ্ড, হলওয়েল ৩০,৯৩৭ পাউণ্ড, ম্যাকগুইয়ার ২৯,৩৭৫ পাউণ্ড, সামনার ২৮,০০০ পাউণ্ড, কেলড ২২,৯১৬ পাউণ্ড, এবং স্মিথ ও ইয়র্ক প্রত্যেকে ১৫,৩৫৪ পাউণ্ড করে। অনুরূপভাবে নাজমউদ্দৌলাকে নবাবের গদিতে বসাবার সময় ক্লাইভ দক্ষিণা পেয়েছিল ৫৮,৩৩৩ পাউণ্ড, কার্নাক ৩২,৬৬৬ পাউণ্ড, জনস্টোন ২৭,৬৫০ পাউণ্ড, স্পেনসার ২৩,৩৩৩ পাউণ্ড, সিনিয়র ২০,১২৫ পাউণ্ড, মিডলটন ১৪,২৯১ পাউণ্ড, লেসেস্টার ১৩,১২৫ পাউণ্ড, প্লেডেল, বার্ডেট ও গ্রে প্রত্যেকে ১১,৬৬৭ পাউণ্ড করে, ও জি. জনস্টোন ৫,৮৩৩ পাউণ্ড। এছাড়া মেজর মুনরো ও তার সহকারীরা সকলে মিলে ১৬,০০০ পাউণ্ড পেয়েছিল। এ তো গেল নবাব অদল বদলের সময়ের প্রাপ্তিযোগ। এছাড়া, জমিদারি বিলি ব্যবস্থার সময়ও তারা যথেষ্ট ঘুষ নিত। এক কথায়, এযুগে ইংরেজদের ঘুষ নেবার কোন সীমা ছিল না।'[৯]

বর্বরোচিত এই লুণ্ঠনযজ্ঞের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে পার্লামেণ্টারী তদন্ত কমিটির সামনে ক্লাইভ বলেছেন, "ভেবে দেখুন একবার পলাশীর বিজয়ের পর আমার অবস্থা। একজন মহান রাজা (নবাব) আমার ইশারায় উঠে আর বসে, একটি ঐশ্বর্যশালী শহর (মুর্শিদাবাদ) আমার পদানত ; শহরের মহাধনী ব্যাঙ্কার-ব্যবসায়ীরা আমার একটু হাসি পাবার জন্য শশব্যস্ত। আমার আগমনে খুলে দেওয়া হয় ধনভাণ্ডার —সোনা, রূপা, হীরা, মুক্তা, জহরত আমার দুপাশে করছে থৈ থৈ। মিঃ চেয়ারম্যান, ভেবে দেখুন কে সম্বিত রক্ষা করতে পারে এসব দেখে ? হাত যে আরও বাড়াইনি, আমার এ বিনয়ে আমি নিজেই অবাক।"[১০]

এই অপরিসীম শোষণ-লুণ্ঠনের ফলে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১১৭৬ সন) বাংলা ও বিহারের বুকে এক অশ্রুতপূর্ব দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এল। 'বাঙলা চিরকালই ধানের রাজা। সারা ভারতবর্ষের শস্যাগার। এ-দেশের ধান চাল দেশে বিক্রি করে পাশ্চাত্য বণিকেরা বহু অর্থ সংগ্রহ করেছে। মাদ্রাজও আহার্যের জন্য চিরকালই বাঙলার ওপর নির্ভর করেছে। সেই বাঙলা দেশে এমন নিদারুণ দুর্ভিক্ষ, যার কবলে পড়ে মানুষ মানুষের মাংস খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছে ; অদৃষ্টের কি চরম পরিহাস ! কিন্তু একি শুধু অদৃষ্টের খেলা ; মানুষের হাত কিছুই নেই ? আছে। কার ? ইংরেজ বণিকের।'[১১]

ইংরেজ-বণিকদের সৃষ্ট এই 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে' বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুর শিকারে পরিণত হল। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে 'প্রত্যেক দিনে হাজার হাজার মানুষ অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল। মৃত ব্যক্তিদের দাহ করার জন্য জীবিত

লোক ছিল না। প্রতিদিন নদী দিয়ে শত শত মৃতদেহ ভেসে যেত।'[১২] এবং 'অনাহার-ক্লিষ্ট ও নিরাশ্রয় জনতা খাদ্যের সন্ধানে মরীয়া হয়ে জনমানবহীন গ্রামগুলিতে হানা দিয়ে ফিরত। ক্ষুধার জ্বালায় উন্মত্ত হয়ে জীবন্ত মানুষ মৃতদেহ ও মুমূর্ষু মানুষের দেহ দাঁত দিয়ে কামড়ে খেত। তেমনি শিয়াল কুকুরও জীবন্ত মানুষ, মৃতদেহ ও মুমূর্ষু মানুষের মাংস কাড়াকাড়ি করে খেত। মানুষের আর্তনাদে দেশ ভরে গিয়েছিল।'[১৩]

তৎকালে প্রচলিত একটি ছড়ায় জানা যায় :

"একচেটে ব্যবসা দাম খরতর।
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হ'ল ভয়ঙ্কর ।।
পতিপত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে।
মরে লোক, অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে ।।"[১৪]

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সর্বগ্রাসী ধ্বংসের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বীরভূম জেলার তৎকালীন 'সুপারভাইজার' হিগিন্স সাহেব লিখেছেন, "গত দুর্ভিক্ষের ধ্বংস-ক্রিয়া এত ভয়ঙ্কর যে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বহু শত গ্রাম জনমানবহীন, এমনকি বড় বড় শহরেও তিন-চতুর্থাংশ গৃহ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। চাষীর অভাবে বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরসমূহ পতিত অবস্থায় চাষের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।" তারপরে তিনি কৃষক-প্রজাদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "মৃতাবশিষ্ট হতভাগ্য চাষীরা সকলেই দুর্ভিক্ষের ফলে এমন দুর্দশাগ্রস্ত যে কাহারও কর দিবার ক্ষমতা নাই। তাহাদের চাষের বলদ ও যন্ত্রপাতি বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াও করের অতি সামান্য অংশই আদায় হইতে পারে। কিন্তু তাহাই হইবে চাষীদের এই অঞ্চল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার নিশ্চিত কারণ এবং তাহার ফলে ভবিষ্যতে চাষের কাজও অচল হইয়া থাকিবে।"[১৫]

মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট বেচার ১৭৭০ সনের ১২ জুলাই মুর্শিদাবাদ শহর ও গ্রামের দুর্ভিক্ষচিত্র তুলে ধরে লিখেছেন যে, শহরে প্রত্যেকদিন পাঁচ শ' করে লোক মরছে, আর গ্রামে মৃত্যুর সংখ্যা বলা নিরর্থক; কেননা কে গোণে কে জীবিত আর কে মৃত?[১৬]

কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের কারণ কি? কারা এই মন্বন্তরের জন্য দায়ী? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী লেখক ইয়ংহাসব্যাণ্ড। তিনি লিখেছেন, "তাহাদের (ইংরেজ বণিকগণের) মুনাফা শিকারের পরবর্তী উপায় হইল চাউল কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখা। তাহারা নিশ্চিত ছিল, জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য এই দ্রব্যটির জন্য তাহারা যে মূল্যই চাহিবে তাহাই পাইবে।...চাষীরা তাহাদের প্রাণপাতকরা পরিশ্রমের ফসল অপরের গুদামে মজুদ হইতে দেখিয়া চাষবাস সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িল। ইহার ফলে দেখা দিল খাদ্যাভাব। দেশে যাহা কিছু খাদ্য ছিল তাহা (ইংরেজ বণিকগণের) একচেটিয়া দখলে চলিয়া

গেল।...খাদ্যের পরিমাণ যত কমিতে লাগিল ততই দাম বাড়িতে লাগিল। শ্রমজীবী দরিদ্র জনগণের চিরদুঃখময় জীবনের উপর পতিত হইল এই পুঞ্জীভূত দুর্যোগের প্রথম আঘাত। কিন্তু ইহা এক অশ্রুতপূর্ব বিপর্যয়ের আরম্ভ মাত্র।

"এই হতভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ কোন অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা নহে। কিন্তু দেশীয় জনশত্রুদের সহযোগিতায় একচেটিয়া শোষণের বর্বরসুলভ মনোবৃত্তির অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ যে অভূতপূর্ব বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখা দিল, তাহা এমনকি ভারতবাসীরাও আর কখনো দেখে নাই বা শুনে নাই।

"চরম খাদ্যাভাবের এক বিভীষিকাময় ইঙ্গিত লইয়া দেখা দিল ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ও বিহারের সমস্ত ইংরেজ-বণিক, তাহাদের সকল আমলা-গোমস্তা, রাজস্ব-বিভাগের সকল কর্মচারী, যে যেখানে নিযুক্ত ছিল সেইখানেই দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ধান চাউল ক্রয় করিতে লাগিল। এই জঘন্যতম ব্যবসায়ে মুনাফা হইল এত শীঘ্র ও এরূপ বিপুল পরিমাণে যে, মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে নিযুক্ত একজন কপর্দকশূন্য ভদ্রলোক এই ব্যবসা করিয়া দুর্ভিক্ষ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ৬০ হাজার পাউণ্ড (দেড় লক্ষাধিক টাকা) য়ুরোপে পাঠাইয়াছিলেন।" তারপরে লেখক মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "বঙ্গদেশের সমগ্র ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ এরূপ একটি নূতন অধ্যায় যোজনা করিয়াছে, যাহা মানবসমাজের সমগ্র অস্তিত্বকাল ব্যাপিয়া ব্যবসা-নীতির এই ক্রূর উদ্ভাবনী শক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, আর পবিত্রতম ও অলঙ্ঘনীয় মানবাধিকারসমূহের উপর কত ব্যাপক, কত গভীর ও কত নিষ্ঠুর ভাবে অর্থ-লালসার উৎকট অনাচার অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এই নূতন অধ্যায়টি তাহারও একটি কালজয়ী নিদর্শন হইয়া থাকিবে।"[১৯] অর্থাৎ কেবলমাত্র খরা-অনাবৃষ্টির জন্য মন্বন্তর হয়নি; এই দুর্ভিক্ষের মূলে ছিল বৃটিশ-বণিকদের সীমাহীন লুণ্ঠন-প্রয়াস। (অথচ পরবর্তীকালে [১৮৮২ খ্রী:] 'জাতীয়তা মন্ত্রের উদ্গাতা' বঙ্কিমচন্দ্র ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য অনাবৃষ্টিকেই দায়ী করেছেন। তিনি লিখেছেন, "অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল. যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না।"—আনন্দমঠ;- ১ম খণ্ড; ১ম পরিচ্ছেদ। 'ইংরাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী' নন বলেই কি বঙ্কিমচন্দ্র এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের জন্য ইংরেজদের দায়ী করতে চাননি?)

কোম্পানি-কর্মচারীদের শোষণ-লুণ্ঠনের জন্য কেবলমাত্র ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ নয়, ১৭৮৪, ১৭৮৭ ও ১৭৮৯ সনেও বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এবং এই সমস্ত দুর্ভিক্ষ বাংলার জনপদগুলিকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। ১৭৮৭ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য উইলিয়াম ফুলার্টন লিখেছেন, "পূর্বে বাংলাদেশ সকল জাতির শস্যের ভাণ্ডার এবং প্রাচ্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পদের কেন্দ্র বলিয়া

পরিগণিত হইত। কিন্তু আমাদের অতিরিক্ত কুশাসনের ফলে গত বিশ বৎসরের মধ্যে এই দেশের অনেক স্থান প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। অনেক স্থলে জমিতে চাষ হয় না—বিস্তৃত জঙ্গল তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। কৃষকের ধন লুণ্ঠিত, শিল্পীরা উৎপীড়িত। পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে—এবং ইহার ফলে লোকসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে।"[১৮] কর্নওয়ালিস ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখের 'মিনিটে' লিখেছেন, "এই সমস্ত দুর্ভিক্ষের কারণে হিন্দুস্থানের কোম্পানি-শাসিত অঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ অরণ্যে আচ্ছন্ন এবং তা হিংস্র বন্য পশুদের আবাসস্থল।"[১৯]

তদানীন্তন কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের অ্যাটর্নি উইলিয়াম হিকি তাঁর স্মৃতিকথায় ১৭৮৯ সনের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "কলকাতা শহরের মধ্যে ও আশেপাশে বুভুক্ষু জনতার আর্তনাদ বাড়তে লাগল, পথঘাট সব ভর্তি হয়ে গেল। ঘরের দরজা খুলে বাইরে পা বাড়ালেই তাদের ক্ষুধার আর্তনাদ ও মৃত্যুযন্ত্রণার কাতরানি শুনতে হত। কত মানুষ, শিশু ও নারী যে পথের উপর মরে পড়ে থাকত তার ঠিক নেই। মোটামুটি একটা হিসেব থেকে জানা যায় যে কয়েক সপ্তাহ ধরে গড়ে প্রতিদিন কমপক্ষে পঞ্চাশ জন করে বুভুক্ষু মারা গেছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল এই যে কলকাতার মতন শহরে পথের উপর ক্ষুধার যন্ত্রণায় তিলে তিলে এরা মৃত্যু বরণ করেছে নিঃশব্দে মুখ বুজে, কোন অভিযোগ করেনি, প্রতিবাদ করেনি, দোকানপাট লুট করেনি, বাড়িঘরে হানা দেয়নি, এমনকি দরজায় দরজায় ঘুরে চেঁচিয়ে ভিক্ষা করেনি পর্যন্ত। এ বোধ হয় এই ভারতবর্ষের মতন দেশেই সম্ভব। এ দেশের শান্তশিষ্ট নিরীহ অহিংস লোক কেবল অজানা এক অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তে ও নীরবে কিভাবে যে তিলে তিলে মৃত্যুও বরণ করতে পারে, তা এই মন্বন্তরের মর্মান্তিক দৃশ্য স্বচক্ষে দেখলে বোঝা যায়।"[২০]

অথচ প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে স্বৈরাচারী ও উৎপীড়ক সামন্ত-শাসকদের অধীনে বাংলাদেশ ছিল সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা। বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এমন এক সময়ে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেছিলেন যখন বিদেশী বণিকরা বাংলাদেশে ঘাঁটি তৈরি করছেন, মোগল সাম্রাজ্যের বনিয়াদ ক্রমেই শিথিল হয়ে ভেঙে পড়ছে। বাংলাদেশ ভ্রমণ করে বার্নিয়ের লিখেছেন, "বাংলাদেশে দু'বার বেড়াতে এসে যে-অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি, তাতে আমার মনে হয় যে মিশর সম্বন্ধে এতদিন যা বলা হয়েছে, সেটা বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। বাংলাদেশে ধান চাল এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে আশপাশের এবং দূরের অনেক দেশে ধান চালান দেওয়া হয় এখান থেকে। গঙ্গানদীর উপর দিয়ে নৌকাভরা ধান চালান যায় পাটনায় এবং সমুদ্রপথে যায় দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন বন্দরে, মুসলিপত্তম ও করোমাণ্ডাল উপকূলের অন্যান্য বন্দরে। বিদেশেও ধান চাল যায় বাংলাদেশ

থেকে, প্রধানত সিংহলে ও মালদ্বীপে। ধান ছাড়াও বাংলাদেশে চিনি পাওয়া যায় প্রচুর এবং গোলকুণ্ডা, কর্ণাট প্রদেশে এই চিনি চালান যায়। বাইরে আরব, মেসোপোটামিয়া ও পারস্য দেশ পর্যন্ত বাংলার চিনি রপ্তানি করা হয়। ...এক কথায় বলা যায়, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও খাদ্যদ্রব্যের কোনো অভাব নেই বাংলাদেশে। প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের এই প্রাচুর্যের জন্যই পর্তুগীজ ও অন্যান্য খ্রীষ্টানরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন বসতিকেন্দ্র থেকে ডাচদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে এসে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশে আস্তানা গেড়ে বসেছে।" অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের শস্যসম্পদের উপরে বিদেশী শ্বেতাঙ্গদের লোভাতুর দৃষ্টি পড়েছিল। তাই বার্নিয়ের পুনরায় বলেছেন, "বাংলাদেশের প্রতি বিদেশী বণিকদের আকৃষ্ট হবার প্রধান কারণ হল, বাংলায় পণ্যদ্রব্যের বৈচিত্র্য বেশি। বাণিজ্যের উপযোগী এত রকমের সুন্দর সুন্দর পণ্য আর কোথাও উৎপন্ন হয় বলে মনে হয় না।...তুলো ও রেশমের এত রকমের জিনিস তৈরি হয় বাংলায় এবং এত প্রচুর পরিমাণে হয় যে এই বাংলাদেশকে হিন্দুস্থানের কাপড়-চোপড়ের প্রধান আড়ৎ বললে ভুল হয় না। শুধু হিন্দুস্থানের বা মোগল সাম্রাজ্যের নয়, প্রতিবেশী সমস্ত দেশের এবং ইউরোপেরও কাপড়চোপড়ের আড়ৎ হল বাংলাদেশ। সরু মোটা, রঙিন, নানারকমের তাঁতের কাপড় তৈরি হয় বাংলায়। তাঁতের কাপড়ের এরকম প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য আমি কোথাও কখনও দেখিনি। দেখলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। ডাচরা এই সব কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে জাপানে ও ইউরোপে চালান দেয়। ইংরেজ ও পর্তুগীজ বণিকরা এবং দেশীয় বণিকরাও প্রধানত এই কাপড়ের ব্যবসায়ই করে। তাঁতের কাপড়ের মতন সিল্কের কাপড়ও প্রচুর তৈরি হয় এবং তার বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। সিল্কের কাপড়ও বাংলাদেশ থেকে সব জায়গায় চালান যায়, লাহোরে, কাবুলে এবং ভারতবর্ষের বাইরে অন্যান্য দেশে। পারস্য, সিরিয়া, সৈয়দ বা বৈরাটের সিল্কের মতন বাংলাদেশের সিল্ক খুব সূক্ষ্ম না হলেও, এত সুলভ মূল্যে সিল্ক কোথাও পাওয়া যায় না।"[২১]

'বাংলাদেশের প্রতি খ্রীষ্টানদের এই বিশেষ প্রীতিই' বাংলার সর্বনাশের কারণ। শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ব্রিটিশ-বণিকদের শোষণ-কৌশলে হয়ে পড়ল রিক্ত-নিঃস্ব। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর মৃত্যু সত্ত্বেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিচলিত হলেন না। তাঁরা পূর্ববর্তী বছরের (১৭৬৯ খ্রীঃ) তুলনায় দুর্ভিক্ষের বছরেও (১৭৭০ খ্রীঃ) ৯ লক্ষ টাকা বেশি রাজস্ব আদায় করলেন এবং তাঁদের ভয়াবহ শোষণের নগ্ন প্রকাশ ঘটল ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের কর আদায়ের মধ্যে — এই বছরে তাঁরা ১৭৭০ সনের তুলনায় ১৭ লক্ষ টাকা বেশি কর আদায় করলেন। কোম্পানির কাউন্সিল কলকাতা থেকে ১৭৭১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে লণ্ডনে যে-রিপোর্ট পাঠান তাতে বলা হয়েছে, "সম্প্রতি যে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং ফলে বহুলোকের প্রাণনাশ হইয়াছিল তাহা সত্ত্বেও বর্তমান বৎসরে রাজস্ব

বৃদ্ধি হইয়াছে।"[২২] এক-তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু সত্ত্বেও ইংরেজ-শাসকরা 'নাজাই কর' নামে এক অকল্পনীয় জুলুমবাজীর মাধ্যমে এই অধিক খাজনা আদায় করেছিলেন। কর-আদায়ের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে ১৭৭২ সনের ৩ নভেম্বর তারিখের চিঠিতে হেস্টিংস বলেছেন, "জোরজবরদস্তি করে পুরাতন পরিমাণের রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।"[২৩] নাজাই করের মর্মকথা হল, যে-সব গ্রামে কৃষকরা মারা গেছেন বা পালিয়ে গেছেন, তাঁদের বাকি খাজনা যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে। হেস্টিংসের পূর্বোক্ত চিঠিতে বলা হয়েছে —"এর নাম 'নাজাই' এবং তা ছিল জমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিম্নস্তরের প্রজাদের উপরে ধার্য খাজনা। যারা মারা গেছে কিংবা পালিয়ে গেছে, তাদের জন্য যে ক্ষতি, সেই ক্ষতি তাদের প্রতিবেশীদের উপরে এর দ্বারা ধার্য খাজনার মাধ্যমে পুষিয়ে নেওয়া যায়।"[২৪]

এ-সময়কার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী আলেকজাণ্ডার দাও ১৭৭২ সনে মন্তব্য করেছেন যে, 'মুঘল সাম্রাজ্যের পতন বাংলার অর্থনীতির ধ্বংসের কারণ নয়। স্বাধীন নবাবদের আমলে বরং বাংলা অধিকতর সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে। নবাবদের নীতি ছিল 'মধুর চাকের মধু খাওয়া, চাক ধ্বংস করা নয়।' কিন্তু ইংরেজরা করলে তার বিপরীত। এরা মধু খেয়ে মধুর চাক পর্যন্ত ধ্বংস করে দেয়। তিনি বলেন, "বাংলার অর্থনীতির অবনতি শুরু হয় সেদিন থেকে, যেদিন থেকে বিদেশী বণিকরা দেশের ক্ষমতা কেড়ে নেয়। গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে স্থায়ী সুবিধালাভের চেষ্টা না করে কোম্পানীর লোকরা তৎপর হয়ে উঠে কিভাবে রাতারাতি নিজেদের ভাগ্যোন্নতি করা যায়।" পলাশী যুদ্ধের পর কোম্পানীর শোষণ-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে বলেন যে, কোম্পানীর অবিমৃষ্য দ্বৈতশাসন ও লাগামহীন শোষণই একদা সমৃদ্ধশালী বাংলাকে ভিখারীতে পরিণত করে। কোম্পানীর আধিপত্য বিস্তারের পর থেকে বাংলা থেকে প্রতি বছর যে সম্পদ পাচার হয় এর পরিমাপ করে দাও মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর দেড় কোটি টাকা ব্রিটেন গ্রহণ করে এবং এ বিপুল অর্থের পরিবর্তে বাংলাদেশ এক কপর্দকও লাভ করেনি।'[২৫]

মহামন্বন্তরের দু'বছর পরে ২২ মে, ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৭৭৪ খ্রী:) হুগলী জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগরের নিকটস্থ রাধানগর গ্রামে সমৃদ্ধশালী সামন্ত-পরিবারে রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ নবাব-সরকারের দায়িত্বশীল কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁর প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার রাজ-সরকারের কাছ থেকে 'রায় রায়ান' উপাধি পেয়েছিলেন। পিতামহ ব্রজবিনোদ রায় নবাব আলিবর্দী ও সম্রাট শাহ আলমের অধীনে কাজ করতেন। সম্রাট শাহ আলম ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র পূর্ব প্রদেশসমূহের শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনে কাজ করতেন। তবে জমির আয়ের উপরে প্রধানত নির্ভরশীল ছিলেন বলে দুর্ভিক্ষের আক্রমণে তাঁর বাৎসরিক আয় কমে গিয়েছিল।

তখন চারিদিকে এক অস্থির অর্থনৈতিক অবস্থা। ফলে কোম্পানির আয় হ্রাসের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচশালা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ইজারাদারদের পাঁচ বছরের (১৭৭২-১৭৭৭ খ্রী:) জন্য জমি বন্দোবস্ত দিলেন এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রতি জেলায় কালেক্টর নিয়োগ করলেন।

কিন্তু এই পঞ্চবার্ষিকী বন্দোবস্তের দ্বারা জমির উপরে অত্যধিক খাজনা আরোপ করা হয়েছিল যা জমিদারদের মাধ্যমে রায়তদের উপরে চেপে বসেছিল। নাটোরের (বর্তমানে বাংলাদেশভুক্ত রাজশাহী জেলা) রাণী ভবানী ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন, "আমি একজন প্রাচীন ও বনেদী জমিদার এবং আমি যে-অঞ্চলের জমিদারি দেখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, সেই অঞ্চলের আমার প্রজাদের দুঃখকর অবস্থা দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"[২৬] রিচার্ড বেচার ১৭৬৯ সালে লিখেছিলেন যে, দেওয়ানি-লাভের পরে বৃটেনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ এবং এদেশের প্রশাসনিক-সামরিক-বাণিজ্যিক ব্যয় বহন করার জন্য কোম্পানির সর্ব-প্রথম বিবেচ্য বিষয় ছিল কিভাবে সবচেয়ে বেশি টাকা এদেশ থেকে আদায় করা যায়। 'কলকাতা কাউন্সিলের প্রধান ফিলিপ ডাকরেস রিপোর্ট' দেন যে, বাংলার অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছেছে এবং এর জন্য দায়ী "মহাদুর্ভিক্ষের জের, মুদ্রা পাচার, কৃষি-উন্নয়নে সরকারের ঔদাসীন্য এবং সর্বোপরি নিলামদার কর্তৃক নির্মম শোষণ।" ঢাকা প্রাদেশিক কাউন্সিলের প্রধান রিচার্ড বারওয়েল মন্তব্য করেন যে, দেওয়ানি লাভের পর থেকে দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি ঘটতে থাকে এবং ১৭৭২ সনের নিলামী বন্দোবস্তের পর থেকে দেশের কৃষি ও কৃষক-সম্প্রদায় প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। মুর্শিদাবাদ প্রাদেশিক কাউন্সিলের প্রধান জর্জ ভ্যান্সিটার্ট বলেন, "১৭৫৭ সালে প্রথম যখন আমরা এদেশে প্রাধান্য বিস্তার করি তখন বাংলার যে অবস্থা ছিল সে অবস্থা বর্তমানেও বিদ্যমান একথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। এদেশ এখন একটি বিরাট ধ্বংসস্তূপ। এর কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের অচল অবস্থা, মুদ্রা পাচার, ইজারাদারের অত্যাচারে ক্ষেতখামার ফেলে রায়তের পলায়ন,।"[২৭] কিন্তু পঞ্চবার্ষিক চুক্তির দ্বারা কোম্পানির অভীষ্ট পূরণ না হওয়ায় কর্নওয়ালিস ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করলেন।

এ-সময়ে রামমোহনের পিতা রামকান্ত জমিদারি সংগ্রহ করেন। ১৭৯১ সনে তিনি কোম্পানির কাছ থেকে নয়-বছরের জন্য-ভুরস্যুট পরগণা ইজারা নিয়েছেন এবং ১৭৯৪ সালে মেদিনীপুরের চেতোয়া পরগণায় হরিরামপুর নামে একটা বড় তালুক রামমোহনের বড় ভাই জগমোহনের নামে কিনেছেন। তখন রামমোহনের বয়স বাইশ এবং তিনি গ্রামে থেকে পিতার ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধান করছেন।

২

বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

ব্রিটিশ-পূর্বযুগে 'ভারতে জমির মালিক ছিল পল্লীবাসী উপজাতি, সম্প্রদায় বা সামাজিক গোষ্ঠী —ভারতে জমি কোনদিন রাজার সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়নি।...সামন্ত-প্রভু বা সম্রাট এই দুই-এর কারোর আমলেই কৃষক ছাড়া আর কারোর জমির উপর মালিকানা-স্বত্ব ছিল না।'[১] ভারতে ভূমি-মালিকানার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে কার্ল মার্কস ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২ জুন এঙ্গেলসকে লিখেছেন, "...প্রাচ্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মূল ভিত্তি হল...জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি। এটাই হল আসল চাবিকাঠি, এমনকি প্রাচ্যস্বর্গেরও।"[২] এই চিঠির উত্তরে ৬ জুন এঙ্গেলস লেখেন, "জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অভাব সত্যিই গোটা প্রাচ্যের চাবিকাঠি। এর মধ্যেই তার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস।"[৩] এটাই ছিল পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের ভূমি মালিকানার পার্থক্য। ইউরোপে ভূমি-স্বত্ব যে-রকম সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছিল, প্রাচ্য ভূখণ্ডে সে-ধরনের কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ ছিল না। তবে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রথা যে ভারতবর্ষে আদৌ বিকাশ-লাভ করেনি, তা নয়। বৈদিক যুগে ব্যক্তিগত অধিকারের কথা সুস্পষ্ট। পিতার জমির উন্নতি-মানসে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে অত্রির কন্যা অপালার প্রার্থনা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ :

> ইমানি ত্রিণি বিষ্টপা তানি ইন্দ্র
> বি রোহয়। —ঋ. ৮. ৯১.৫.

'গোষ্ঠীস্বত্ব (Tribal Ownership), সংঘস্বত্ব (Communal Ownership) ও যৌথস্বত্বের (Joint Ownership) পাশাপাশি ব্যক্তিস্বত্ব (Individual Ownership) ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকেই ছিল। বৌদ্ধযুগে এই উভয় স্বত্ব-প্রথার উল্লেখযোগ্য বিকাশ

হয়েছিল দেখা যায়। বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগে সংঘস্বত্ব ও যৌথস্বত্ব-প্রথা ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসে এবং ব্যক্তিগতস্বত্ব-প্রথার উৎকট বিকাশ হতে থাকে। কিন্তু এই ভারতীয় ভূমিস্বত্বের সঙ্গে ইউরোপীয় ভূমিস্বত্বের স্বরূপের মৌল পার্থক্য আছে। এদেশে ব্যক্তিগত ভূমিস্বত্ব কোনোদিন বিধিবন্ধনে আবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়নি, দেশীয় প্রথানুসারে স্বত্ব স্বীকৃত হয়েছে মাত্র। ইউরোপের রাজা তাঁর রাজত্বের সর্বময় কর্তা ; ভূসম্পত্তি, কৃষক, কারিগর, কর্মচারী সবারই মালিক রাজা। রাজার অধীন ব্যারণরাও ক্ষুদে রাজা। রাজা যখন তাঁদের কর্তৃত্ব করার অধিকার দেন, তখন তাঁরা নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভূসম্পত্তি ও লোকজন সকলের উপর কর্তৃত্ব করার বিধিবদ্ধ অধিকার পান। কর্তৃত্ব সেখানে দখলী স্বত্বেরই নামান্তর মাত্র। ভারতবর্ষে রাজা নিজে ভূমির স্বত্বভোগ করতেন না ; তাই তাঁর অধীন সামন্তদের আংশিক বা আঞ্চলিক স্বত্ব দেবার অধিকারও তাঁর ছিল না। রাজা দিতেন রাজস্ব আদায়ের অধিকার, শাসনব্যবস্থা তদারক করার অধিকার। জৈমিনির 'পূর্ব-মীমাংসা'তে বলা হয়েছে : 'রাজা কোনো ভূমি হস্তান্তর করতে পারেন না, কারণ রাজা ভূমির মালিক নন। মালিক তারা যারা খেটে সেই ভূমি চাষ করে।' সায়নাচার্য বলেন : 'রাজার কর্তব্য হল অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া, আর নিরপরাধকে আশ্রয় দেওয়া। জমির মালিক রাজা নন, যারা আবাদ করে ফসল ফলায় তারা।' ভারতবর্ষে তাই রাজায় রাজায় যুদ্ধবিগ্রহের ফলে রাজ্য হস্তান্তরিত হয়েছে মাত্র, ভূমিস্বত্বের রূপ বদলায়নি। বিজয়ী রাজা শুধু রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেছেন। ভূস্বামীদের ভূমিস্বত্ব অথবা প্রজাদের প্রজাস্বত্ব নিয়ে ভারতবর্ষে যে সামন্তযুগের ইউরোপের মতন হানাহানি বিশেষ হয়নি তার কারণ হল ভারতীয় গ্রাম্য-সমাজের গঠন-বৈশিষ্ট্য। সেই খ্রী: পূ: ২০০০ বছর আগের বৈদিক যুগ থেকে ব্রিটিশপূর্ব মোগল বাদশাহের যুগ পর্যন্ত ভারতীয় গ্রাম্য-সমাজের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি দেখা যায়। পরিবর্তন যে একেবারেই হয়নি তা নয়, কিন্তু যা হয়েছে তা প্রধানত বাহ্য, মৌল কোনো রূপান্তর ঘটেনি।'[৪]

পাঠান ও মোগল আমলে বাংলাদেশে চৌধুরী, ক্রোরী, কানুনগো, আমিল, শীকদার, পাটোয়ারী প্রভৃতি রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত রাজকর্মচারীরা ক্রমে ক্রমে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জমিদার-রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছেন। 'দেশীয় প্রথানুসারে পুরুষানুক্রমে রাজস্ব আদায় করার জন্য এইসব রাজকর্মচারী ক্রমে ভূমির মধ্যস্বত্বাধিকারী হয়ে উঠলেও সেকালের জমিদাররা আজকালকার জমিদারদের মতন ভূমির স্বত্ববিশিষ্ট ভূম্যধিকারী হয়ে ওঠেননি। ভূমির মধ্যস্বত্বাধিকারীদের মতন গ্রাম্যসমাজের প্রজারাও পুরুষানুক্রমে একই স্থানে বসবাস ও চাষবাস করার জন্য উত্তরাধিকার-সূত্রে তার স্বত্ব ভোগ করত। কিন্তু এ সবই হল প্রথানুগত্য, বিধিবদ্ধতা এর মধ্যে কোথাও ছিল না।'[৫]

খাজনা-আদায়ে প্রথানুসারে বংশানুক্রমিক অধিকার লাভ করলেও জমিদাররা

জমির মালিকানা-স্বত্ব লাভ করেননি। তাঁদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে 'দস্তুর-উল্-অমাল্-ই-বেকাস' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, (১) উৎপন্ন শস্যের মোট পরিমাণের ভিত্তিতে স্বীকৃত বাৎসরিক জমা দিতে জমিদার অঙ্গীকারবদ্ধ। ফসলী জমির প্রকৃত পরিমাণ সরকারি খাতায় যে হারে উল্লিখিত রয়েছে, জমিদার সেই হারেই কৃষকের কাছ থেকে নির্ধারিত জমার অংশ সংগ্রহ করবেন। (২) বিঘা প্রতি নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব বাদে জমিদার অন্য কোনো প্রকার কর কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করতে পারবেন না। (৩) জমিদার এমন কোনো দাবি করতে পারবেন না যারফলে কৃষক গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হন। (৪) যে সব কৃষক গ্রাম ত্যাগ করেছেন, তাঁরা যাতে পরের বছরে গ্রামে ফিরে এসে বসবাস করেন, এবং নিজ নিজ জমিতে চাষবাস পুনরায় শুরু করেন, তার ব্যবস্থা জমিদারকে করতে হবে। (৫) নিজেদের জমি বিনা মজুরিতে চাষ করানোর জন্য কৃষকদের উপরে প্রচলিত প্রথার অতিরিক্ত চাপ জমিদার দিতে পারবেন না। (৬) রায়তের ক্ষতি করা চলবে না।

আলোচ্য তথ্য বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে কৃষককে কোনোমতেই জমিদারের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন প্রজা বলে গণ্য করা যায় না। কয়েকটি নির্ধারিত শর্তে জমি চাষ করার অধিকার কৃষকের ছিল। কৃষকের উপরে ধার্য ভূমি-রাজস্ব সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা নির্দিষ্ট হত এবং ঐ ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ সম্পর্কীয় বিশদ হিসাব সরকারি দপ্তরে রক্ষিত হিসাবের খাতায় লেখা থাকত। জমিদারের দায়িত্ব ছিল কেবলমাত্র সরকারি হিসাবের তালিকানুসারে ভূমি-রাজস্ব আদায় করা এবং একথাও পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছিল যে, নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব বাদে কৃষকদের কাছ থেকে অন্য কোনো প্রকার কর আদায় করার অধিকার জমিদারের নেই।

তাছাড়া উক্ত তথ্য থেকে আরো জানা যায় যে, জমিদারের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কৃষককে নির্দিষ্ট পরিমাণে বেগার দিতে হত। তবে এই বেগারের নির্দিষ্ট মাপকাঠি স্থানীয় দেশাচার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। বহুপূর্ব থেকে যে-সামন্ততান্ত্রিক সূত্রে জমিদার-কৃষক সম্পর্ক আবদ্ধ ছিল, সেই সূত্রের জের হিসাবেই বেগার পদ্ধতি চলে এসেছে। কিন্তু তাসত্ত্বেও অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় কৃষককে একজন স্বাধীন মানুষ বলা যায়, যে মানুষ কয়েকটি নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী তাঁর জমি চাষ করতেন এবং জমিদার মারফৎ তাঁর উৎপন্ন ফসলের একাংশ ভূমি-রাজস্ব বাবদ সরকারকে দিতেন। এই শর্ত ও নিয়মাবলী পাট্টা নামক দলিলে লেখা থাকত এবং জমিদার এই দলিল কৃষকের হাতে তুলে দিতেন। যে-সব জমিদার ও ইজারাদার ভূমি-রাজস্ব জমা দেবার দায়িত্ব নিতেন, পাট্টা বিলি করা তাঁদের অবশ্য কর্তব্য ছিল। পাট্টায় ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ও নির্ধারণ পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে একথাও লিখিত থাকত যে, নির্দিষ্ট ভূমি-রাজস্ব ছাড়া কৃষকের কাছ থেকে অন্য কোনো প্রকার কর জমিদার আদায় করতে পারবেন না।

যে সব শর্তে কৃষককে জমি দখলের অধিকার দেওয়া হত, তা পাট্টায় সুস্পষ্ট-ভাবে লেখা থাকত। এই শর্তগুলির মধ্যে ছিল, কৃষককে কতটা জমি দেওয়া হল, মোট দেয় ভূমি-রাজস্ব এবং তাঁর বাৎসরিক কিস্তির পরিমাণ, চুক্তির মেয়াদ এবং শস্য উৎপাদনের ক্ষতি হলে কি হারে ভূমি-রাজস্ব মকুব করা হবে। সাধারণত কৃষকের উপরে ধার্য রাজস্বের পরিমাণ সরকারি কর্মচারীরাই নির্দিষ্ট করে দিতেন; কিন্তু তা আদায় করার দায়িত্ব ছিল জমিদারের।[৬]

তবে মোগল আমলের 'ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীর কোনো স্থান ছিল না। কারণ সে-ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকার প্রত্যেক গ্রামে গ্রাম্য মাতব্বরের সহায়তায় কৃষকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতো। এ জন্য মোগল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা কোনো বংশানুক্রমিক জমিদারি স্বত্বের জন্ম দেয়নি এবং জমির ওপর দখলী স্বত্বের ভিত্তিতে মোগল আমলে কোনো অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠারও কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

'তবে মোগল ভূমি-রাজস্ব নীতির এই কাঠামো সত্ত্বেও তার মধ্যে কিছু কিছু ব্যতিক্রমও থাকতো। প্রথমত, অনেক হিন্দু রাজারা নিজেদের এলাকাকে এমন স্বাধীনভাবে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করতেন যে তাঁদের থেকে একটা বাৎসরিক কর আদায় ব্যতীত কেন্দ্রীয় মোগল সরকারের আর করার কিছু থাকতো না। কাজেই এই রাজারা কৃষকদের থেকে নিজেদের এজেন্টদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতেন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ কর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় মোগল সরকার নিজেদের কর্মচারীদের মাসিক অথবা বাৎসরিক মাইনে নগদ টাকায় না দিয়ে তাদের এক একটি এলাকার রাজস্ব আদায়ের অধিকার দান করতো। এ ভাবেই এই মোগল কর্মচারীরা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারি তত্ত্বাবধান সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে নিজ নিজ নির্দিষ্ট এলাকায় রাজস্ব আদায় করে যেতো। তৃতীয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারগ্রাম্য মাতব্বরদের ওপর নির্ভর না করেই সরাসরিভাবে নিজেদের কর্মচারীদের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের হিসাব দেখাশোনা করতো এবং তাদের থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দিতো।

'উপরোক্ত তিন ধরনের ব্যবস্থার ফলে ভূমি-ব্যবস্থার সাধারণ কাঠামোর মধ্যে কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা দিলেও আইনত এবং কার্যত জমির ওপর রাষ্ট্র অথবা জমিদার-জাতীয় কোনো শ্রেণীর দখলী স্বত্ব মোগল আমলে ছিলো না। জমির সত্যিকার মালিক তখন ছিলো তারাই যারা নিজেরা গ্রামে কৃষিকার্যের দ্বারা জমিতে ফসল উৎপাদন করতো। কাজেই সে সময় যাদের জমিদার বলা হতো তারা ছিলো সরকারের রাজস্ব-আদায়ের এজেন্ট মাত্র, ভূস্বামী অথবা জমির মালিক নয়।'[৭]

'বাংলাদেশে জমিদাররা রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট রাজস্ব দিয়ে দিত এবং তার নিজের সংগ্রহের সঙ্গে দেয় রাজস্বের পার্থক্যটাই ছিল তার লাভ। সেখানে সে রাষ্ট্রের

জন্যে রাজস্ব-সংগ্রহকারী হিসেবে বিনা খাজনায় কিছু জমি দখল করতে পারত। যেখানে সে নিজেই রাজস্ব সংগ্রহ করে সেখানে সে মালিকানার অধিকারী নয় বরং 'নানকার'-এর অধিকারী (সেবার জন্য কিছু ভাতা)। জমিদাররা তাদের প্রাপ্তি নগদ অর্থে বা খাজনামুক্ত জমির মাধ্যমে লাভ করত।[৮]

মোঘল যুগে কৃষকসমাজ প্রধানত দুটি স্তরে বিভক্ত ছিল: খুদকাস্ত ও পাইকাস্ত। খুদকাস্ত রায়তরা নিজেদের জমি নিজেরা চাষ করতেন এবং যে-গ্রামে জমি, সেই গ্রামেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। এই জমির উপরে তাঁদের বংশানুক্রমিক দখলী স্বত্ব ছিল। তাঁরা গরু, হাল, বীজ ইত্যাদি উৎপাদনের উপকরণের অধিকারী ছিলেন। পাইকাস্ত রায়তেরা যে জমিদারের অধীনস্থ গ্রামে বসবাস করতেন, সেই গ্রামের জমি চাষ করতেন না; তাঁরা গ্রামের বাইরে সেই জমিদারের জমি অথবা অন্য জমিদারের জমি চাষ করতেন এবং জমির উপরে তাঁদের কোনো দখলী স্বত্ব ছিল না। পাইকাস্ত রায়তদের মধ্যে আবার দু'টি ভাগ ছিল—একদলের উৎপাদনের কোনো উপকরণ ছিল না; খুদকাস্ত রায়তেরা উৎপাদনের উপকরণগুলি ধার দিতেন। অন্যদল উৎপাদনের উপকরণের অধিকারী ছিলেন। রায়তদের সর্বশেষ স্তরে ছিলেন আধিয়ার ও বর্গাদার কিংবা ভূমিহীন কৃষক যাঁরা অন্যের জমিতে ফসলের বিনিময়ে চাষ করতেন।

পাঠান ও মোগল যুগে রাজস্ব-আদায়কারীরা ক্রমে ক্রমে প্রতিপত্তিশালী ধনী জমিদার হয়ে উঠেছেন। বর্ধমান, দিনাজপুর, নদীয়া প্রভৃতি প্রাচীন জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠা এইভাবে হয়। মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭২২ সালে সমগ্র বাংলাদেশকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করে সেগুলিকে ২৫টি জমিদারি ও ১৩টি জায়গীররে বন্দোবস্ত করেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক বন্দোবস্তের নাম 'জমা কামেল্ তুমারী'।

'মাসিরুল উমারা' পুস্তকে বলা হয়েছে যে, মুর্শিদকুলি খাঁ তিনটি বিভিন্ন রাজস্ব-হারের বিধান দিয়েছিলেন। যে সব এলাকায় বৃষ্টি ফসল পাকবার কাজে সাহায্য করে, সেই সকল এলাকায় উৎপন্নের অর্ধেক অংশ ভূমি-রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হত। যে সকল এলাকায় কূপের সাহায্যে সেচের কাজ করা হত, সেই সকল এলাকায় উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে সরকারের এবং দুই-তৃতীয়াংশ কৃষকের প্রাপ্য ছিল। তবে যে সকল এলাকায় খালের সাহায্যে জলসেচ হত, সেই সব এলাকায় রাজস্ব-হারের মান ভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে নির্ধারিত হত। আখ বা আঙুর জাতীয় পণ্যের জন্য ঐ হার এক-নবমাংশ থেকে এক-চতুর্থাংশের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। একদিকে সর্বাধিক উর্বর জমির ক্ষেত্রে—যেখানে অল্প পুঁজি ও শ্রমে কৃষিকাজ সম্পাদিত হত—সেখানে উৎপন্নের অর্ধেক অংশ রাজস্বের হার হিসাবে নির্দিষ্ট হত। অন্যদিকে যে সকল জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি ও শ্রম নিয়োগ করতে হত, সেই সকল এলাকার জন্য রাজস্ব অপেক্ষাকৃত স্বল্প হারে নির্ধারিত হত। ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণে কৃষকের আর্থিক অবস্থারও বিচার করা হত।[১০]

'নবাব সুজা খাঁর আমলে মুর্শিদের নির্দিষ্ট রাজস্বের মধ্যে ৪২,৬২৫ টাকা মাত্র বাদ যায় এবং সুজা খাঁ স্বয়ং ১৯ লক্ষ টাকারও বেশি নতুন আব্ওয়াব ধার্য করে উক্ত বন্দোবস্ত পাকা করেন। এই জমিদারী বন্দোবস্তই পরবর্তী বন্দোবস্তগুলির, এমনকি দশসালা তথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত্তিস্বরূপ।'[১১]

মোগল যুগের ভূমি-ব্যবস্থা ও ভূমি-সম্পর্ককে ভেঙে দিয়ে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। ফলে বাংলার কৃষকরা চরম দুর্গতি-দুর্দশার সম্মুখীন হলেন এবং কৃষি-ব্যবস্থার চরম অবনতি ঘটল। ইংরেজ-বণিকরা দেওয়ানি লাভ করে জমির মালিক হয়ে বসলেন এবং জমিদারদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে ধার্য খাজনা আদায় করার জন্য রেজা খাঁ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেবী সিংহ, হরেরাম প্রভৃতি নিষ্ঠুর উৎপীড়কদের নিযুক্ত করলেন। তারা কৃষকদের ঠেঙিয়ে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে গ্রামের বুকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে খাজনা ও আব্ওয়াব আদায় করল বটে, কিন্তু কোম্পানির স্বার্থের চেয়েও তাদের নিজেদের আখের গুছোবার দিকেই নজর ছিল বেশি। তাছাড়া ভূমি-রাজস্ব এরূপ বিপুল হারে বৃদ্ধি করা হয়েছিল যে, পীড়ন-পেষণ-লুণ্ঠন সত্ত্বেও তা কারোর পক্ষেই আদায় করা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সারা বাংলায় কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দিল। এই কৃষক-বিদ্রোহকে দমনকল্পে সেনাবাহিনী নিয়োগের ব্যয়ভার বহনের জন্য এবং রাজস্ব আদায়ের অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য কর্নওয়ালিস ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বোচ্চ হারে রাজস্ব নির্দিষ্ট করে জমিদারদের সঙ্গে যে দশসালা বন্দোবস্ত করলেন, সেই বন্দোবস্তও রাজস্ব-সংগ্রহের অনিশ্চয়তা দূর করতে সক্ষম হয়নি। অথচ কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টর্স স্থায়ী রাজস্ব-নীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন; তাঁরা অনুভব করেছিলেন রাজস্ব-নীতির অনবরত পরিবর্তন দেশীয় বিত্তশালী অধিবাসীদের বিশেষত জমিদারদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে এবং কোম্পানি-শাসনের স্থায়িত্ব সম্পর্কে তাঁরা আস্থা হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় ১৭৯৩ সনে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি হেনরী ডানডাস্-এর কাছে দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী করার জন্য নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করে লর্ড কর্নওয়ালিস যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ডানডাস্ ব্রিটেনের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পিটের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা করে সেই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন এবং পরিণতিতে ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ তারিখে দশ বছরের বন্দোবস্তকে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের নির্দেশে 'চিরকালের জন্য অপরিবর্তনীয়' বলে ঘোষণা করা হল। এই ঘোষণা 'কর্নওয়ালিস কোড' নামে পরিচিত এবং এই কোডে রেগুলেশনের সংখ্যা ছিল ৪৮ টি।

লর্ড কর্নওয়ালিস ঘোষণা করলেন যে, দশ বছরের চুক্তি শেষ হওয়ার সময়ে জমিদাররা যে-রাজস্ব জমা দিতেন, সেই নির্দিষ্ট রাজস্বের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। তাঁরা এবং তাঁদের আইনসম্মত উত্তরাধিকারীরা পূর্ব-নির্দিষ্ট খাজনায়

তাঁদের জমিদারি চিরকালের জন্য ভোগ করতে পারবেন। কিন্তু এই সুবিধাভোগের বিনিময়ে তাঁরা নিম্নলিখিত বিধি-নিষেধগুলি মেনে চলবেন :

(১) খরা, বন্যা অথবা যে-কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য নির্দিষ্ট ভূমি-রাজস্ব প্রদান স্থগিত রাখা কিংবা হ্রাস করার দাবি উত্থাপনের কোনো অধিকার জমিদারদের থাকবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব দিতে অক্ষম হলে তাঁদের সম্পূর্ণ জমিদারি কিংবা জমিদারির একটি অংশ — যার দ্বারা বাকি রাজস্ব পরিশোধ করার জন্য নিলাম করা হবে।

(২) অধীনস্থ রায়ত-কৃষকদের কিংবা তালুকদারদের যাঁরা জমিদারদের মাধ্যমে খাজনা দেন, তাঁদের জমি, বাড়ি কিংবা তাঁদের অন্যান্য সম্পত্তি ক্রোক করা কিংবা বিক্রি করার কোনো আইনসম্মত অধিকার জমিদারদের থাকবে না।

(৩) লাঙ্গল, বীজ, শস্য, কারিগরি যন্ত্র ও কৃষিতে নিযুক্ত গবাদি পশু ক্রোক করার অধিকারও তাঁদের থাকবে না।

(৪) কোনো জমিদার রায়তদের কাছ থেকে কোনো অজুহাতে আবওয়াব কিংবা মাথট আদায় করতে পারবেন না। এই জাতীয় প্রত্যেকটি বেআইনী আদায়ের জন্য তাঁকে আদায়ীকৃত অর্থের তিনগুণ জরিমানা করা হবে। সে-কারণে জমিদাররা রায়তদেরকে দেয় অর্থের পরিমাণ লিখে পাট্টা দেবেন এবং তাঁরা জেলা-আদালতে পাট্টার চেকমুড়িগুলিকে নিবন্ধভুক্ত করতে বাধ্য থাকবেন।

এভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চিরকালের জন্য সরকারি রাজস্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়ায় জমিদাররা যেমন উপকৃত হলেন, অন্যদিকে তাঁরা যে-সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করতেন, সেগুলির অনেকাংশ কেড়ে নেওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। তারফলে ভূস্বামীশ্রেণীর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য তাঁরা এই নতুন আইনকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হলেন। অবশ্য এই প্রতিরোধ ব্রিটিশ-শাসনকে উৎখাত করা কিংবা তাঁদের পছন্দমত একটা বিকল্প ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য কোনো সংগঠিত আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেনি। সরকারি রাজস্ব-আদায় যাতে অনিশ্চিত হয়ে উঠে, সেজন্য তাঁরা ছোট ছোট দলে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করে রাজস্ব-আদায়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সরকারি রাজস্ব মকুব করা, জমির নির্ধারিত মূল্য হ্রাস করা, তালুকগুলিকে বিভক্ত করার নীতিকে বন্ধ করা, পাট্টা আইন প্রত্যাহার এবং সর্বোপরি রায়ত-কৃষকদের দমন করার ঐতিহ্যগত ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ছিল তাঁদের প্রধান দাবি। এই সমস্ত দাবি আদায়ের জন্য ভূস্বামীশ্রেণী নানাবিধ কৌশলের দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় রাজস্ব-আদায় ক্রমেই অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল।

১৭৯৩ সনের অষ্টম আইন অর্থাৎ পাট্টা আইন ভূস্বামীশ্রেণীকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। এই আইনের দ্বারা প্রজাদের কাছ থেকে আসল জমা ছাড়া আবওয়াব

ইত্যাদি পীড়নমূলক অর্থ আদায় করাকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন ব্যবস্থায় প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় কোনো নির্দিষ্ট আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। ভূস্বামীকে আসল জমা ছাড়া কত কর দিতে হবে, তা রায়তরা জানতেন না। সে-সময়ে প্রায় সমস্ত কিছুর জন্য রায়তদের কর দিতে হত। খাজনা সংগ্রহের জন্য ব্যয়-বাবদ কর, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কর, রাস্তা তৈরির জন্য কর, বাড়ি, হাট, বাজার ইত্যাদির জন্য কর,* জমিদার-বাড়িতে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবানুষ্ঠানের জন্য কর, কাশী, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে জমিদার-পরিবারের যাওয়ার জন্য কর ইত্যাদি প্রজাদের কাছ থেকে 'আব্ওয়াব' নামে আদায় করা হত। আসল জমার সঙ্গে এই সমস্ত কর যুক্ত হয়ে যে-পরিমাণ অর্থ রায়তদের দিতে বাধ্য করা হত, তা তাঁদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। অথচ ১৫৮৮ সালে রাজা তোডরমলের দ্বারা নির্দিষ্ট আসল জমার অতিরিক্ত কোনো কর প্রজাদের কাছে দাবি করার কোনো অধিকার জমিদারদের ছিল না। (তোডরমল ভূমি জরিপ করে যে রাজস্বের হার নির্ধারণ করেন,তা আসল জমা নামে অভিহিত। আসল জমার উপরে অতিরিক্ত করকে বলা হত আব্ওয়াব। জমির মূল্যবৃদ্ধির জন্য খাজনার হার বৃদ্ধিকল্পে আব্ওয়াব ধার্য করা হত। নবাব আলীবর্দী খানের পর থেকে আব্ওয়াব অত্যাচারে পরিণত হয়। জমিদাররা তাঁদের মর্জিমাফিক আব্ওয়াব আদায় করতেন।)

সুতরাং রায়তদের কাছ থেকে এই জাতীয় উৎপীড়নমূলক কর আদায় বন্ধ করার জন্য পাট্টা আইনে বলা হল : (১) ভূস্বামীশ্রেণী রায়তদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ আদায় করবেন। তার অতিরিক্ত নতুন আব্ওয়াব আদায় করা নিষিদ্ধ হল। (২) নির্দিষ্ট আসল জমার অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের চেষ্টা করা হলে দেওয়ানি-আদালতে শাস্তি দেওয়া হবে। (৩) প্রত্যেকটি জমিদারকে দশ বছরের ইজারার ভিত্তিতে রায়তকে পাট্টা দিতে হবে। জমির উৎকর্ষতা, প্রতি বিঘার খাজনা ও অন্যান্য শর্ত ইত্যাদি পাট্টায় অর্থাৎ চুক্তির দলিলে উল্লেখ করতে হবে। (৪) পাট্টার চেকমুড়ি দেওয়ানি-আদালতে নিবন্ধভুক্ত করার জন্য পেশ করতে হবে। (৫) খুদকাস্তের পাট্টাকে নাকচ করা যাবে না।

কিন্তু জমিদারদের প্রবল প্রতিরোধের জন্য কোম্পানি-সরকার নতি স্বীকার করেন। ১৭৯৯ সালের আইনের দ্বারা ভূস্বামীশ্রেণীর সমস্ত সামন্ত-ক্ষমতা পুনর্বহাল করা হয়। ১৮১২ সনের পঞ্চম আইনে বলা হল যে, দশ বছরের ইজারার মেয়াদের পাট্টা আইন বাতিল করা হল এবং ভূম্যধিকারীশ্রেণী তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী ইজারা প্রদানের সময় ও যে-কোনো হারে খাজনা নির্দিষ্ট করতে পারবেন। রায়ত ও জমিদারদের মধ্যবর্তী একটি মধ্যস্বত্বাধিকারীশ্রেণী প্রতিষ্ঠার অধিকার ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের আইনে দেওয়া হয়। 'এ সবই কর্নওয়ালিস কোডের আদর্শ-বিরোধী আইন। কেন কোম্পানীর সরকার জমিদারদের কাছে নতি স্বীকার করে? কারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। সামাজিক নেতা হিসেবে জমিদার-

দের সমর্থন-লাভ কোম্পানীর একটি রাজনৈতিক প্রয়োজন। কোম্পানীর যুদ্ধ-নীতির অর্থ যোগায় বাংলার মাটি। সে মাটি নিয়ন্ত্রণ করে জমিদার। অতএব যে কোন মূল্যে জমিদারের আনুগত্য আদায় করা ছিল সরকারের ঔপনিবেশিক প্রয়োজন।'[১২]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা করসংগ্রাহক জমিদাররা জমির মালিক-রূপে ঘোষিত হওয়ায় তার প্রতিক্রিয়া হল সুদূরপ্রসারী। এই আইনে রায়তদের স্বার্থরক্ষার কথা বলা হলেও তা ছিল অর্থহীন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা বলীয়ান হয়ে প্রবল প্রতাপশালী জমিদাররা সহজেই আইনকে অস্বীকার করে নিরক্ষর-নিঃসম্বল প্রজাদের দমন-পীড়ন করতেন। হিন্দু-মুসলিম যুগের ভূমি-ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ইউরোপের ভূমি-ব্যবস্থার অনুকরণে ব্রিটিশ-বণিকরা এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাহায্যে যে-নতুন ভূমি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন, তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য।

(ক) ইতোপূর্বে জমিদাররা কর-সংগ্রহকারী ছিলেন মাত্র; জমির উপরে তাঁদের কোনো স্বত্ব ছিল না। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী জে. এইচ. হ্যারিংটন বলেছেন, "রাষ্ট্রের পক্ষে রায়ত ও জমির উপস্বত্বভোগীদের কাছ থেকে আঞ্চলিক রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করেন জমিদার।...একদিক থেকে তাঁকে তাঁর জমিদারির নির্দিষ্ট রাজস্বের বাৎসরিক কণ্ট্রাক্টর বা ইজারাদার বলা যায়।"[১৩] অথচ কোম্পানি-সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা এই ইজারাদারদের জমির স্বত্ব দান করলেন অর্থাৎ ভূমির মূলস্বত্বভোগী হলেন জমিদাররা। এই নতুন ভূস্বামীশ্রেণীর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে হ্যারিংটন বলেছেন, "জমিদার তাঁর জমিদারির মালিক—উত্তরাধিকার, দান বা কেনা-বেচা থেকে তিনি এই মালিকানা-স্বত্ব লাভ করতে পারেন—তাঁর দায়িত্ব হল—তাঁর জমিদারির নির্দিষ্ট স্থায়ী রাজস্ব যথাসময়ে গভর্নমেণ্টকে পরিশোধ করা। তাঁর দেয় রাজস্ব চুকিয়ে দিয়ে তিনি আইনসঙ্গতভাবে উপস্বত্বভোগী ও প্রজাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মুনাফা ও খাজনা যতটা সম্ভব আদায় করতে পারেন এবং তা ভোগও করতে পারেন।"[১৪] অর্থাৎ জমিদাররা চিরস্থায়ী-স্বত্বে তাঁদের ভূসম্পত্তি ভোগ করবেন, জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করতে পারবেন, রায়তদের কাছ থেকে ইচ্ছানত খাজনা আদায় করবেন এবং সরকারকে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণে রাজস্ব দেবেন; কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের (চৈত্র সংক্রান্তির সূর্যাস্তের) মধ্যে রাজস্ব জমা দিতে না পারলে তাঁদের জমিদারি নিলাম হবে।[১৫] পরবর্তীকালে এই জমিদাররা আবার শাসকগোষ্ঠীর সম্মতি নিয়ে তাঁদের সহকারী-রূপে সৃষ্টি করেছিলেন 'তালুকদার', 'জোতদার' প্রভৃতি উপস্বত্বভোগীদের একটা বিরাট শ্রেণী।

(খ) ইতোপূর্বে কৃষকরা যৌথভাবে জমির ফসল ভোগ করলেও জমি কেনা-বেচার অধিকার তাঁদের ছিল না। তারফলে ঋণগ্রস্ত কৃষকের জমিজমা আত্মসাতের

সুযোগ মহাজনের ছিল না। এবারে তাঁরা জমি কেনা-বেচা, দান-বন্ধক দেবার অধিকার লাভ করলেন। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম জমি হল পণ্য —ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রী। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থার জন্য ঋণগ্রস্ত কৃষকের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে মহাজনরা তাঁদের ভূমিহীন কৃষকে পরিণত করলেন! ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের কালেক্টর তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, "ক্রয়-বিক্রয় ও ক্রোক করার… প্রথার ফলে বাংলার ভূসম্পত্তির ক্ষেত্রে যে প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে, তার অপেক্ষা অধিকতর পরিবর্তন বোধহয় কোনও যুগে কোনও দেশেই কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ বিধিবিধানের দ্বারা সংঘটিত হয়নি।"[১৬]

(গ) ইতোপূর্বে যৌথ মালিকানায় কৃষকগণ সমষ্টিগতভাবে উৎপন্ন ফসলের (যে বছরে যা উৎপাদিত হবে) একটা নির্দিষ্ট অংশ সম্রাটের প্রতিনিধি-রূপে জমিদারকে দিতেন। এবারে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি কৃষককে (যৌথভাবে নয়) জমির নির্ধারিত মূল্যের ভিত্তিতে (উৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে নয়) নগদ মুদ্রায় (ফসলে নয়) একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা (ফসলের উৎপাদন যাই হোক, না কেন) দিতে হবে। অর্থাৎ ফসল ভালো হোক, মন্দ হোক, অজন্মা হোক, আর নাই হোক, কি পরিমাণ জমি আবাদ হয়েছে বা হয়নি, ইত্যাদি কোনো বিষয়ই বিবেচনা করা হবে না —কেবলমাত্র প্রত্যেক বছরে নিয়মিতভাবে জমির মালিককে খাজনা বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে।

এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পশ্চাতে ব্রিটিশ-বেনিয়াদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তাঁরা অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন যে, বাৎসরিক বা পাঁচসালা বন্দোবস্তের দ্বারা ভূসম্পত্তিহীন রাজস্ব-আদায়কারী জমিদারদের মাধ্যমে যে-পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়, তা দিয়ে কোম্পানির ক্রমবর্ধমান প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয়-নির্বাহ সম্ভব নয়। অথচ কোম্পানির রাজত্ব বজায় রাখতে হলে কৃষক-বিদ্রোহ দমন করতে হবে, রাজত্ব বাড়াতে হলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য দখলের জন্য ক্রমশ যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে এবং কোম্পানির অংশীদারদের ক্রমবর্ধমান লভ্যাংশের দাবি পূরণ করতে হবে। তাই তাঁরা 'মাছের তেল দিয়ে মাছ ভাজা'র নীতি গ্রহণ করলেন। এ-সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, "ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হচ্ছিল, বড় বড় যুদ্ধ চালানো হচ্ছিল এবং শাসনকার্যও পরিচালিত হচ্ছিল ভারতের জনসাধারণের অর্থে। এই সমস্ত কাজের জন্য ব্রিটিশ জাতি একটি পয়সাও খরচ করেনি।"[১৭]

এদেশে শোষণ-নিপীড়ন কিছু দেশীয় কর্মচারীর সাহায্যে চালালেও কোম্পানির ব্যাপক সামাজিক ভিত্তি ছিল না। অথচ স্থায়ীভাবে শোষণ-কার্য চালাতে গেলে বিপুল সংখ্যক দেশীয় সমর্থক সংগ্রহের প্রয়োজন। তাই এমন কতকগুলি সামাজিক স্তর সৃষ্টি করতে হবে যা ব্রিটিশ-কোম্পানির শাসন-শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করবে। বাৎসরিক বন্দোবস্ত ও পাঁচসালা বন্দোবস্তের ফলে ধ্বংসোন্মুখ

পুরানো বনেদী জমিদারদের মধ্যে অনেকেই ব্রিটিশ-বিরোধী কৃষক-সংগ্রামে উৎসাহ-মদত-নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এঁদের সম্পর্কে তাই কোম্পানির কর্তৃপক্ষ গভীর সন্দেহ পোষণ করতেন এবং সে-কথা হেস্টিংস স্পষ্ট করেই বলেছেন, "বড় বড় জমিদারেরা তাঁদের প্রচণ্ড প্রভাব ব্যবহার করে থাকেন সরকারের বিরুদ্ধে এবং সেইজন্যই তাঁদের প্রভাব নষ্ট করা বাঞ্ছনীয়।"[১৮] সুতরাং নতুন নতুন দেশীয় বন্ধু সৃষ্টি করতে হবে যারা সমস্ত রকমের বিদ্রোহ-বিক্ষোভের বিরুদ্ধে ইংরেজ-শাসনকে সমর্থন-সাহায্য করবে। এই গূঢ় অভিসন্ধি নিয়ে তাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করলেন। শাসকগোষ্ঠীর এই আশা ব্যর্থ হয়নি। তাই লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ৮ নভেম্বর তারিখে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন, "বহু দিকে এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যতই গলদ থাকুক না কেন, একটি বিষয়ে উহার অপরিসীম গুরুত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। কোন ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ বা বিপ্লবের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এমন এক বিপুল সংখ্যক ধনী জমিদারশ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে যাঁহাদের স্বার্থ ব্রিটিশ-শাসন বজায় রাখার প্রশ্নের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং জনসাধারণের উপর যাঁহাদের প্রভূত প্রভাব রহিয়াছে।"[১৯]

কিন্তু ইংরেজ-শাসকদের সৃষ্ট এই নয়া জমিদারদের কি কোনোরকম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা ছিল? এঁদের সৃষ্টি করার পিছনে কি ব্রিটিশ-শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ছিল? এঁদের অর্থনৈতিক চেতনা কি ধরনের ছিল? জমিদারি কেনার জন্য এঁরা কোথা থেকে অর্থ সংগ্রহ করলেন? এঁরা কোন্ ধরনের সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন? এঁদের বংশ-পরিচয় কি? এঁরা কি নিজেদের জমিদারিতে বসবাস করতেন এবং নিজেরা কি কৃষিকাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন অথবা অন্য ব্যক্তিদের ইজারা দিয়েছিলেন? ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের প্রতি এঁদের কি মনোভাব ছিল? কৃষকদের প্রতি এঁরা কি ধরনের ব্যবহার করতেন? এঁরা কি জমিদারির আয়েতে এবং গ্রামে প্রভুত্ব বিস্তারেই সন্তুষ্ট ছিলেন? এঁদের কি কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না?—উনিশ শতকের 'নবজাগরণ' আন্দোলনের যথার্থ স্বরূপ অনুধাবন এবং এই আন্দোলনের পরিচালকদের কার্যাবলীর মূল্যায়ন ও রাজা রামমোহনের ভূমিকা নির্ণয় করতে হলে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ইতিহাসের বুকে খুঁজে পেতেই হবে।

যাঁরা ছিলেন ভূমিস্বত্ববিহীন করসংগ্রাহক, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আনুকূল্যে তাঁরা ভূমিস্বত্বাধিকারী হলেন। ১৮১২ সনের সিলেক্ট কমিটি তাঁদের Fifth Report-এ বলেছেন যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে জমিদারদের এমন অধিকার দিয়েছেন যা বাংলাদেশে তাঁরা কোনো-কালে ভোগ করেননি ("rights hitherto unknown and unenjoyed in Bengal")। এই কথা বলে তাঁরা মন্তব্য করেছেন যে, বাংলাদেশে স্থায়ী জমিদারিস্বত্ব এমন লোকদের দেওয়া হয়েছে যাঁদের কোনোরকম দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা নেই। Fifth

Report-এ যে-সমস্ত বিশেষণে এই জমিদারদের ভূষিত করা হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি হল এই : জমিদাররা হলেন 'নির্বোধ কিংবা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, অলস, লম্পট, অমিতব্যয়ী, অভাবী, অত্যাচারী, অজ্ঞ, লোভাতুর, ডাকাতপোষক, প্রতিবন্ধক-সৃষ্টিকারী ও ব্যাধিগ্রস্ত।'[২০]

জমিদারি-পরিচালনা বিষয়ে ভূস্বামীশ্রেণীর অজ্ঞতা-অক্ষমতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে স্যার জন শোর ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জুন তারিখের 'মিনিটে' লিখেছেন যে, জমিদারির কাজ সম্পর্কে জমিদারদের জ্ঞান ছিল খুবই অল্প। জমিদারি-পরিচালনায় তাঁরা ছিলেন অমনোযোগী। এমনকি তাঁদের জমিদারি বিপদাপন্ন হলেও তাঁরা সতর্ক হতেন না। শোর আরো লিখেছেন, যদি কোনো জমিদারকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তাঁর জমিদারির খাজনা কত, কোন্ পদ্ধতিতে খাজনা দাবি করা হয় এবং কিভাবে তা নির্দিষ্ট করা হয়, তাঁর জমিদারিভুক্ত কোনো পরগণার প্রধান ফসল কি এবং সেই ফসলের উৎপাদন বেড়েছে অথবা কমেছে, তাহলে তাঁর উত্তর হবে যে, তিনি এ-সব বিষয়ে মাথা ঘামান না অথবা তিনি উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার জন্য তাঁর দেওয়ানকে কিংবা অন্য কোনো আমলাকে নির্দেশ দেবেন।[২১]

জে. সাদারল্যাণ্ড বলেছেন, "বড় বড় জমিদাররা তাঁদের জমিদারি থেকে বহু দূরে শহরে বসবাস করেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের প্রজাদের সম্বন্ধে ইউরোপীয় বিচারক কিংবা জেলা-শাসকদের তুলনায় কম জানেন।"[২২]

খাজনার সঙ্গে ভেট, ভাণ্ডারি, নায়েব-নজর, খোদ-নজর, রোশন, পেয়াদা, দাখিলা, চাঁদা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বেআইনী আবওয়াব, মাথট এবং শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়ন, পূজা, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে মাগন আদায় করার জন্য জমিদাররা রায়তদের উপরে বলপ্রয়োগ করা ছাড়াও রাতের অাঁধারে প্রজাদের ধনসম্পত্তি লুঠ করার জন্য ডাকাত নিয়োগ করতেন। ১৭৯২ সনের ৭ ডিসেম্বরে গভর্নর-জেনারেলের 'মিনিটে' বলা হয়েছে, "জমিদারদের (বর্ধমান, নদীয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলের) দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য থানাদার পাইক ইত্যাদি বহাল করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তার ব্যয়ভার বহনের জন্য সরকার পৃথক ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁদের নির্দিষ্ট জমার হিসাবের মধ্যেই এই খরচ ধরা হয়েছিল। যেসব জমিদারের উপর এই দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁরা তা সাধুভাবে পালন করা প্রয়োজনবোধ করলেন না। পেশাদার ডাকাতদের সাধারণত তাঁরা থানাদার নিযুক্ত করতেন। এই থানাদাররা লুঠতরাজ করার কাজেই তাঁদের সাহায্য করত। গ্রামের প্রজাদের ধনসম্পত্তি রক্ষা করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না।...বড় বড় ডাকাতের দলগুলির সঙ্গে জমিদারদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ সর্বত্র দেখা যায়।"[২৩]

ওয়েলবি জ্যাকসন তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, "ডাকাতির কমিশনার আমাকে জানালেন যে, জমিদারের লাঠিয়ালরা অধিকাংশই বাঙ্গালী নয়, উত্তর-পশ্চিম ও

বিহারের বাছা বাছা ভাড়াটে গুণ্ডা। জমিদাররা এই সব বিহারী ও পাঠান লাঠিয়াল বেতন দিয়ে রাখতেন প্রজাদের উপরে অত্যাচার করার জন্য।"[২৪]

ইংরেজ-শাসকরা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্যই যে এই জাতীয় ঘৃণ্য ব্যক্তিদের হাতে বাংলার জমিদারি ও কৃষকের জান-মানের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তা জানা যায় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-সচিবের একটা চিঠিতে, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে যে বহু প্রকারের রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে মহারাণীর সরকার কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না। ... ইহার ফলে যে-শাসনব্যবস্থা ভূস্বামীদের এইরূপ বিরাট সুযোগ স্বেচ্ছায় দান করিয়াছে এবং যে-শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্বের উপর ঐ ভূস্বামীদের অস্তিত্ব নির্ভর করে, সেই শাসনব্যবস্থার প্রতি ভূস্বামীগণের আনুরক্তি ও আনুগত্যের মনোভাব জাগ্রত না হইয়া পারে না।"[২৫]

'অত্যাচারী, লোভাতুর, ডাকাতপোষক' ব্যক্তিরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে পুরানো জমিদারদের কাছ থেকে জমিদারি কিনে নিয়ে বাংলার ভাগ্যাকাশে নয়া জমিদার-রূপে দেখা দিলেন। এই বন্দোবস্ত অনুসারে দুর্দশাগ্রস্ত বহু বনেদী জমিদার তাঁদের দেয় অনাদায়ী বিপুল পরিমাণ রাজস্ব নির্দিষ্ট সময়ে রাজকোষে জমা দিতে অক্ষম হওয়ায় ইংরেজ-সরকার অনাদায়ী রাজস্বের জন্য তাঁদের কাছ থেকে জমিদারি কেড়ে নিয়ে বা প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি নিয়ে নিলামে বিক্রি করে দিতেন এবং এইসব জমিদারি যাঁরা কেনেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই হলেন কলকাতার মতো শহরের একশ্রেণীর একপুরুষের ধনিক —যাঁরা ইংরেজ-আমলে কলকাতা শহরে দেওয়ানি-মুচ্ছুদ্দিগিরি করে, হাট-বাজারের ইজারা নিয়ে, লবণের ব্যবসার ইজারাদারি করে প্রচুর ধন উপার্জন করেছিলেন। কিন্তু এই সঞ্চিত ধন লগ্নি করার মতো কোনো উপায় তাঁদের ছিল না। লর্ড কর্নওয়ালিস একটা চিঠিতে (৬ মার্চ, ১৭৯৩ খ্রী:) লিখেছিলেন, "স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে সঞ্চিত বিপুল অর্থ লগ্নি করার কোনো উপায় নেই। ...জমির উপরে ভোগদখলের অধিকার সংরক্ষণের ঘোষণা হলে সেই অর্থ ভূসম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হবে।"[২৬]

তাই কোম্পানি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা দেওয়ান-বেনিয়ান-মুচ্ছুদ্দিদের জমিদারি কেনার সুযোগ করে দিল এবং 'প্রদেশের বেশির ভাগ জমি দ্রুতগতিতে করায়ত্ত হল কয়েকটি শহুরে পুঁজিপতির, যাদের অতিরিক্ত টাকা ছিল এবং তা তারা সাগ্রহে খাটাল জমিতে।'[২৭] তারফলে 'ভূতপূর্ব বংশানুক্রমিক উচ্ছন্ন ভূমিমালিকগণের ওপর অপ্রশমিত ও অসংযত লুণ্ঠন চালানো সত্ত্বেও আদি জমিদারশ্রেণী কোম্পানির চাপে অচিরেই অন্তর্হিত হয় ও তার জায়গা নেয় ব্যবসায়ী দাঁওবাজেরা. সরকারের খাস তত্ত্বাবধানে দেওয়া মহাল ছাড়া বাংলার সমস্ত জমিই এখন এদের হাতে। এই দাঁওবাজেরা পত্তনি নামক বিভিন্ন প্রকারের জমিদারি প্রজাবিলির প্রবর্তন করেছে। ব্রিটিশ সরকারের প্রসঙ্গে নিজেদের

মধ্যস্বত্বভোগী অবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে তারাও আবার পত্তনিদার নামক 'বংশানু-ক্রমিক, মধ্যস্বত্বভোগীর একটা শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে, এরা আবার তৈরী করেছে গড় পত্তনিদার ইত্যাদি —ফলে গড়ে উঠেছে মধ্যস্বত্বভোগীদের একটা নিখুঁত বহু-ধাপ ব্যবস্থা, যা তার গোটা ভার চাপাচ্ছে হতভাগ্য কর্ষকের ওপর।'[২৮]

বাংলাদেশের সমগ্র জমির অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ করতেন বর্ধমান, রাজশাহী, দিনাজপুর, নদীয়া, বীরভূম, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলের রাজা-মহারাজারা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার পরবর্তী প্রথম দশকের মধ্যে তাঁরা দেখেছেন যে, তাঁদের সুবৃহৎ জমিদারি ভূমি-রাজস্ব বাকি থাকার জন্য বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বিক্রি হয়েছে। যেমন ১৭৯১ সনে রাজশাহীর রাজা রামকৃষ্ণের সঙ্গে বার্ষিক রাজস্ব ২২,৫০,২০০ সিক্কা টাকার চুক্তিতে দশ বছরের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। তারপর থেকেই তাঁর বিশাল জমিদারি খণ্ড খণ্ড করে বিক্রি হতে শুরু হল এবং পরবর্তী শতকের প্রারম্ভে তাঁর সমগ্র জমিদারির মালিক হলেন ছোটো ছোটো নতুন জমিদার। নিম্নলিখিত সারণীতে[২৯] দেখা যাবে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কিভাবে তাঁর সমগ্র জমিদারি ধীরে ধীরে টুকরো টুকরো করে বিক্রি করা হয়েছিল এবং পরিণতিতে তাঁরা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ তাঁদের জমিদারি ছিল বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। সারণীর প্রথম সারিতে দেখা যাবে, টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া জমিদারির বিভিন্ন অংশের সদর জমা; দ্বিতীয় সারিতে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটি খণ্ডের বিক্রিত মূল্য ও তৃতীয় সারিতে রয়েছে বিক্রির তারিখ :

বিক্রিত জমির সদর জমা	প্রত্যেকটি খণ্ডের নিলামে বিক্রিত মূল্য	বিক্রয়ের তারিখ
এক শত সিক্কা টাকার ভিত্তিতে	এক শত সিক্কা টাকার ভিত্তিতে	
১১৬৩	১০৬০	৪ জুন, ১৭৯৩ খ্রী:
২৮৪	৬৭৪	১৪ জুন, ১৭৯৩ ”
২৫৯৪	২৫৯৪	২৭ এপ্রিল, ১৭৯৫ ”
১৪৩	১৯০	২৯ জুন, ” ”
১০৪	১০০	১ আগস্ট, ” ”
১৯১৯	৫১০	১০ সেপ্টেম্বর, ” ”
৬০৯	৪১৩	১৩ অক্টোবর, ” ”
১০২	১৭২	৩১ মার্চ, ১৭৯৬ ”
২৮৯	৪৫২	২৭ জুন, ” ”
৯৭	১৪৫	২৭ মে, ১৭৯৭ ”
৮১	৩৪	” ” ”
১৩৭	৭৪	” ” ”
৭৩৮	১২৮০	১ জুলাই, ” ”

বিক্রিত জমির সদর জমা	প্রত্যেকটি খণ্ডের নিলামে বিক্রিত মূল্য	বিক্রয়ের তারিখ
এক শত সিক্কা টাকার ভিত্তিতে	এক শত শিক্কা টাকার ভিত্তিতে	
২৩১	৩৫০	২৪ জুলাই ১৭৯৭ খ্রী:
৬৫	২৯	৫ আগস্ট, " "
১০৮	১১৬	১৪ সেপ্টেম্বর, " "
৮০	৭২	১৫ অক্টোবর, " "
৫৪	২৬	৪ জানুয়ারি, ১৭৯৮ "
৪৬	৫০	৬ জুলাই, " "
৩০৬	১৩২	১০ " " "
২৪৮	৯৫	২৩ " " "
৪৭	৭৫	২৩ সেপ্টেম্বর, " "
৪০০	২৫১	১২ নভেম্বর, " "
৬৯৬	৪৬৪	১০ ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৯ "
৮১৫	২৬০	২৫ " " "
২২১	৯৯	১২ মার্চ, " "
৬৬৯	৬০৩	২৩ " " "
৯৯২	৬১১	১৮ মে, " "
৬৩০	৩০৪	১০ জুন, " "
৪১৩	১৬০	৬ জুলাই, " "
২৭০	২৪১	২০ " " "
৬৭	২৩	" " " "
৩১১	৫৯৭	" " " "
১১২	২২	২৮ আগস্ট, " "
৪০১	১৩৯	" " " "
২৫৪	২৩০	১৯ অক্টোবর, " "
১৪	৫	৭ মে, ১৮০০ "

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে জমি হস্তান্তর নাটকের দ্রষ্টা ছিলেন রাজা রামমোহন এবং ইউরোপীয় জেলা-শাসকদের চেয়ে আরো ভালভাবে তিনি পুরানো জমিদারদের ভাগ্য পরিবর্তনের কথা জানতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পঁচিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের সমগ্র ভূসম্পত্তির শতকরা ৫৫% ভাগ জমি নিলামে বিক্রি হয়ে নতুন হাতে চলে গিয়েছিল। এই সময়ে যাঁরা নিলামে জমিদারি কিনে নিয়ে জমিদার হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন 'চতুর ফড়িয়া ব্যবসায়ী'।

এই চতুর 'ব্যবসায়ী দাওবাজ'দের মধ্যে কয়েকজনের উত্থানের ইতিহাস

সংক্ষেপে পর্যালোচনা করলে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের উপরে এঁদের নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করা যাবে। কলকাতা শহরের নব্য অভিজাতশ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতা যাঁরা, বংশ-পরিচয়ের কিংবা ধন-কৌলিন্যের দিক থেকে তাঁরা অজ্ঞাতকুলশীল ও দরিদ্র ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। শোভাবাজারের রাজপরিবার, পোস্তার রাজ-পরিবার, জোড়াসাকোঁর ঠাকুরপরিবার, সিমলার দে-সরকার-পরিবার, পাইকপাড়ার সিংহ-পরিবার, ঝামাপুকুরের মিত্র-লাহা-পরিবার, খিদিরপুরের ভূকৈলাসের ঘোষাল-পরিবার, হাটখোলার ও রামবাগানের দত্ত-পরিবার, বড়বাজারের মল্লিক-বংশ প্রভৃতি কলকাতার উচ্চশ্রেণীর পরিবার-প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রায় অখ্যাত ও অজ্ঞাত। এঁরা এবং এঁদের বংশধররা সকলেই প্রায় ইংরেজদের অধীনে দেওয়ান, বেনিয়ান, মুন্‌শী, খাজাঞ্চী, সরকার প্রভৃতি পদে চাকরি করে ও সাহেবদের ঋণ দিয়ে কোম্পানির কাগজ ও অন্যান্য দ্রব্য কেনা-বেচা করে এবং ঠিকাদারি, ইজারাদারি ও তেজারতি ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন এবং কোম্পানির অনুগ্রহে গ্রামের জমিদারি ও শহরের ভূসম্পত্তি কিনে কলকাতা শহরের রাজা-মহারাজা অথবা ধনী জমিদার-রূপে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছেন।

কলকাতার নাগরিক সমাজে যে নয়া জমিদার-ব্যবসায়ীদের অভিজাতগোষ্ঠী বিলাসে-ব্যসনে, আমোদে-স্ফূর্তিতে খ্যাতিলাভ করেন, ১৮৩৯ সালের সরকারি কাগজপত্রে তাঁদের নাম-পরিবারের একটি তালিকা[৩০] পাওয়া যায়। তালিকাটি হল এই :

বাগবাজার	৬	শোভাবাজার	৬
শ্যামবাজার	৪	নিমতলা	২
জোড়াবাগান	১	সিমলা	৩
গরানহাটা	১	জোড়াসাঁকো	৩
পাথুরিয়াঘাটা	১৮	বড়বাজার	১১
মেছুয়াবাজার	১	চোরবাজার	৪
কলুটোলা	৬	পটলডাঙা	১
বহুবাজার	৩	মলঙ্গা	৩
জানবাজার	৪	খিদিরপুর	২
কাশীপুর	৩	ভবানীপুর	২

এই ৪৮টি পরিবারের মোট প্রায় ১০০ জন উনিশ শতকের প্রথম ভাগে কলকাতা শহরে স্বনামধন্য ছিলেন।

রাজা রামমোহন জন ডিগবীর দেওয়ান-রূপে অর্থোপার্জন করেছেন, তেজারতির কারবারে কোম্পানির কর্মচারীদের চড়া সুদে ঋণ দিয়েছেন, যেমন আরো দশজন ধনী 'বাবু' কলকাতায় বসে লগ্নি-কারবার করতেন,[৩১] বিলিতি হুণ্ডি ও কোম্পানির কাগজের কেনা-বেচা করেছেন এবং এ-ভাবে উপার্জিত অর্থের দ্বারা ক্রমান্বয়ে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের বড় বড় তালুক কিনে কলকাতার সমাজে বড় জমিদার-রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কলকাতার ঠাকুরবাড়িও এই ইতিহাসের ব্যতিক্রম নন। দশসালা বন্দোবস্তের পূর্বে তাঁরা ভূস্বামীশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। দ্বারকানাথের প্রপিতামহ দরিদ্র জয়রাম 'ফোর্ট উইলিয়ম' নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত থেকে বিত্তশালী হয়েছেন এবং জয়রামের পুত্র নীলমণি উড়িষ্যার কালেক্টরের সেরেস্তাদারি করে আরো সম্পদশালী হয়ে উঠেছেন ও কলকাতায় ভূসম্পত্তি ক্রয় করেছেন। নীলমণির নাতি দ্বারকানাথ পিতামহ-প্রপিতামহের পথ অনুসরণ করেছেন এবং বিভিন্নভাবে প্রভূত অর্থোপার্জনের দ্বারা বাংলাদেশ ও উড়িষ্যার বড় বড় জমিদারি ক্রয় করে প্রিন্স-রূপে পরিচিত হয়েছেন। তিনি জমিদারদের ল-এজেণ্ট রূপে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ে দালালির কাজ করেছেন; ইউরোপের ব্যবসায়ীদের অর্ডার-অনুযায়ী নীল এবং সিল্ক কিনে তিনি সে-দেশে চালান দিয়েছেন।[৩২] দ্বারকানাথ চব্বিশ পরগণার কালেক্টর এবং সল্ট-এজেণ্ট প্লাউডেনের দেওয়ান-রূপে ছয় বছর (১৮২৩-২৯ খ্রী:) কাজ করেছেন এবং তারপরে 'কাস্টমস্, সল্ট অ্যাণ্ড ওপিয়ম্ বোর্ড'-এর পাঁচ বছর (১৯২৯-৩৪ খ্রী:) দেওয়ান ছিলেন।

ঠাকুর-পরিবারের আর-একজন প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুর (জয়রামের পুত্র) প্রথমে চন্দননগরে ফরাসীদের কাছে চাকরি করেছেন এবং পরে তিনি সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য এডওয়ার্ড হুইলারের দেওয়ানি করে যে ধনোপার্জন করেছিলেন, তা দিয়ে তিনি ১৭৯০ সালে নাটোরের রাজার রংপুরের একটি বৃহৎ পরগণা কিনেছিলেন যার বার্ষিক সদর জমা ছিল ৬০,০০০ সিক্কা টাকা। দর্পনারায়ণের পুত্র গোপীমোহন ঠাকুর রাজশাহী, নদীয়া ও যশোহরের রাজাদের কাছ থেকে ১,১১,৬০০ সিক্কা টাকায় জমিদারি কিনেছিলেন। পিতৃসম্পত্তি ছাড়া তাঁর ক্রীত জমিদারির বার্ষিক জমা ছিল ৮৬,৪০৫ সিক্কা টাকা। তাছাড়া তিনি আত্মীয় ও ভৃত্যদের নামে কত জমি কিনেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে ১৮১৮ সনের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সংবাদে জানা যায় যে, মৃত্যুকালে তাঁর জমিদারি ও অন্যান্য সম্পত্তির মূল্য ছিল আশী লক্ষ টাকা।[৩৩]

নিঃস্ব মতিলাল শীল প্রথম জীবনে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে যে-অর্থ সংগ্রহ করেন, তা দিয়ে তিনি একদিকে যেমন কলকাতার ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে শিশি-বোতল ও কর্কের ব্যবসা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি 'স্ট্রাণ্ড ফ্লাওয়ার মিল', 'অস্ওয়াল্ড শীল অ্যাণ্ড কোং', 'কেলসল অ্যাণ্ড কোং' ইত্যাদি কুড়িটি ব্রিটিশ-কোম্পানির বেনিয়ান ছিলেন। বেনিয়ানগিরি ছাড়াও তিনি জমির ব্যবসা করে প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর মত প্রতিপত্তিশালী জমির মালিক সেকালে শহরে আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। ভূসম্পত্তি থেকে খাজনা বাবদ মতিলালের বার্ষিক আয় ছিল ৩,৬০,০০০ টাকা।

তাছাড়া কান্দি ও পাইকপাড়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাধাকান্ত সিংহ নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে ইংরেজ-কোম্পানিকে সরাসরি দলিলপত্র দিয়ে সাহায্য করার জন্য কোম্পানি তাঁকে পুরস্কৃত করেন এবং এই

বংশের আর একজন প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হেস্টিংসের গুপ্ত চক্রান্তের সহায়ক ছিলেন এবং তাঁর আনুকূল্যে বীরভূমের আমিন, কলকাতার কৌন্সিল ও বোর্ড অব রেভিনিউর দেওয়ান এবং দিনাজপুরের নাবালক রাজার অভিভাবক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহকে হেস্টিংস কলকাতার দেওয়ান-পদে নিযুক্ত করেছিলেন। পাঁচসালা বন্দোবস্তের সময় তিনি নাটোর রাজবংশের কিয়দংশ সম্পত্তি কিনে নেন ও দিনাজপুরের জমিদারির কতকাংশ দখল করেন। এইভাবে তিনি ক্রমে ক্রমে যে-বিশাল জমিদারি কিনে রাজা হয়েছিলেন, তার বার্ষিক জমা ছিল ৪,৭৫,৭১৩ সিক্কা টাকা।[৩৪]

কাশিমবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু বা কৃষ্ণকান্ত নন্দী প্রথম জীবনে এক মুদির দোকানে ও পরে ইংরেজ-কুঠিতে মুহুরীর কাজ করতেন। নবাবের ভয়ে ভীত হেস্টিংসকে তিনি পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। পরে হেস্টিংসের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের মুচ্ছুদ্দি হয়ে তাঁর সকল রকম দুষ্কার্যের সহায়ক হন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস গভর্নর হলে তিনি বহু জমিদারি উপহার পান এবং নাটোরের রাজার জমিদারির কিছু অংশ আত্মসাৎ করেন। কাশীর রাজা চৈৎ সিং-এর উপর আক্রমণে কান্তবাবু প্রধান ষড়যন্ত্রকারীর ভূমিকা নেওয়ায় পুরস্কারস্বরূপ লুণ্ঠিত সম্পত্তির কিছু অংশ পান। হেস্টিংসের সদয় দাক্ষিণ্যে কান্তবাবুর পুত্র লোকনাথ নন্দী 'রাজা' হন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে কান্তবাবু রংপুর, গাজীপুর ও আজিমগড়ের বহু জমি কিনেছিলেন। তবে তাঁর জমিদারি মূলত ভাগলপুর ও রংপুরের বাহারবন্দ পরগণাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁর পুত্র লোকনাথ স্বনামে ও বেনামে ঢাকা থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত প্রায় সমস্ত জেলায় জমি কিনেছিলেন। ১৮০৮ সালে এই সমস্ত ভূসম্পত্তির বার্ষিক জমার মোট পরিমাণ ছিল, ২,৪২,১০৫ সিক্কা টাকা।[৩৫]

শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ দেবের পিতা রামচরণ গোবিন্দপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন। পিতার মৃত্যুর পরে নবকৃষ্ণ হেস্টিংসের ফারসী-ভাষার মুন্সী নিযুক্ত হন। সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলেছিল তার লেখাপড়া তিনিই করেছিলেন। সিরাজের মৃত্যুর পরে তাঁর গুপ্ত ধনভাণ্ডার থেকে নবকৃষ্ণ, মীরজাফর, আমীর বেগ ও রামচাঁদ রায় বহু কোটি টাকার ধনরত্ন পান। তিনি ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন এবং ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ক্লাইভের সহায়তায় 'মহারাজ বাহাদুর' উপাধি পেয়েছিলেন।[৩৬]

পোস্তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত ধর ওরফে নকু ধর প্রথম মারাঠা যুদ্ধের সময়ে কোম্পানিকে সাহায্য করেন; বিনিময়ে কোম্পানি তাঁর দৌহিত্র সুখময় রায়কে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। মহারাজা সুখময় ইলাইজা ইম্পের দেওয়ানি করেছেন। আন্দুল রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রামচরণ রায় গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট ও জেনারেল স্মিথের দেওয়ান ছিলেন। খিদিরপুরের ভূকৈলাস রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ভেরেলস্ট সাহেবের দেওয়ান ও বেনিয়ান

ছিলেন এবং কোম্পানির সাহায্যে সন্দীপের জমিদারি আত্মসাৎ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এঁরা সকলেই জমিতে অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন।

তেলেনীপাড়ার ব্যানার্জী-পরিবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পরে জমিদার-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিবারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী পুত্রদের নামে নদীয়া ও বর্ধমান জেলার ১১টি পরগণা কিনেছিলেন —যার বার্ষিক জমার পরিমাণ ছিল ১,৭৩,৮৮৮ সিক্কা টাকা।

নড়াইলের রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কালিশঙ্কর রায় প্রথম জীবনে ছিলেন লাঠিয়াল এবং সেইসূত্রে তিনি মাত্র কয়েক বিঘা জমির মালিক ছিলেন। পরবর্তী-কালে রাজশাহীর নাটোর-রাজের দেওয়ান-রূপে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে জমি কিনে জমিদার হন এবং মৃত্যুকালে তিনি জমিদারি বাবদ বার্ষিক কয়েক লক্ষ টাকা রাজস্ব সরকারকে দিতেন। কিন্তু এই সমস্ত জমি ছিল নাটোরের রাজার।[৩৭]

দিনাজপুরের মাণিক-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মাণিকচাঁদ ছিলেন পাটনার অধিবাসী। তিনি ভাগ্যান্বেষণে রংপুরে এসে উপস্থিত হন এবং রংপুরের কালেক্টর জন এলিয়টের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এলিয়টের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেন এবং ১৭৯৩ সনে এলিয়ট যখন দিনাজপুরে কালেক্টর-রূপে বদলী হন, তখন তিনি মাণিকচাঁদ ও তাঁর পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে যান। মাণিক এলিয়টের দেওয়ান পদে এবং তাঁর পৌত্র ফুলচাঁদ সহকারি দেওয়ান-পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে এলিয়ট মাণিকচাঁদকে দিনাজপুরের রাজার দেওয়ান-পদে এবং ফুলচাঁদকে নিজের দেওয়ান-পদে নিয়োগ করেন। এইভাবে তাঁরা এলিয়টের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হয়ে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে দিনাজপুরের রাজার জমিদারির একটি বড় অংশ কিনেছিলেন। তাঁর ভূসম্পত্তির বার্ষিক জমার পরিমাণ ছিল ১,৩৬,৩৩৪ সিক্কা টাকা।[৩৮]

কৃষ্ণচরণ দত্ত এবং তাঁর ভাইপো অভয়চরণ দত্ত (পরবর্তীকালে 'মিত্র' উপাধি গ্রহণ) ইংরেজ-আনুকূল্যে কলকাতার অভিজাতমাজে ধনী জমিদার-রূপে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছিলেন। এডওয়ার্ড কোলব্রুক ও হেনরী কোলব্রুকের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষ্ণচরণ ঢাকার দেওয়ান হয়েছিলেন এবং তাঁর সুপারিশে এডওয়ার্ড কোলব্রুক অভয়চরণকে চব্বিশ পরগণার দেওয়ান-পদে নিযুক্ত করেছিলেন। তাছাড়া কৃষ্ণচরণের ভাই আনন্দময়ী রাজশাহীর দেওয়ান হয়েছিলেন। সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাঁরা অগাধ ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন এবং সেই অর্থ তাঁরা ব্যবসায়ে ও জমিতে বিনিয়োগ করেছিলেন। স্বনামে ও বেনামীতে তাঁরা বড় বড় ভূসম্পত্তি ক্রয় করেছিলেন। সঠিক হিসাব জানা না গেলেও কেবলমাত্র নদীয়ার জমিদারির বার্ষিক জমা ছিল ৫৮, ৪৭৯ সিক্কা টাকা।[৩৯]

রাণাঘাটের পাল-চৌধুরী-পরিবার জমি কিনে জমিদার হওয়ার পূর্বে কলকাতায় লবণের ব্যবসার এজেন্ট ছিলেন। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দুই ভাই কৃষ্ণচন্দ্র পাল ও শম্ভুচন্দ্র পাল প্রথম জীবনে পানের ব্যবসা করতেন। কিন্তু ১৭৯০ সালের মধ্যে

তাঁরা লবণের ব্যবসা করে কলকাতার ধনীসমাজে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র যুগ্মভাবে যশোহর ও নদীয়ার রাজাদের ভূসম্পত্তি কিনে জমিদার হয়েছিলেন। এই সমস্ত জমির বার্ষিক জমা ছিল ১,৩২,৭১৪ সিক্কা টাকা। জমিদার হলেও তাঁরা সুদের ব্যবসা, হুণ্ডি ও কোম্পানির কাগজ কেনা-বেচা এবং শস্য, চিনি, ঘি, কাপড়, নীল ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা করতেন।[৪০]

মুর্শিদাবাদের দানীশমন্দ নিত্যানন্দ রায় প্রথম জীবনে ছিলেন তাঁতি। পরবর্তীকালে তিনি কোম্পানির বেনিয়ান হয়ে প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। সমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছ থেকে 'দানীশমন্দ নিত্যানন্দ' উপাধি কিনেছিলেন। তাঁর ভূসম্পত্তির অধিকাংশই মুর্শিদাবাদ,বীরভূম, রাজশাহী, দিনাজপুর ও হিজ্রিকপুরের রাজাদের ছিল। তাঁর জমিদারির বার্ষিক জমা ছিল ১,২০,৬১৩ সিক্কা টাকা। তাছাড়া অন্যান্য জেলাতে বেনামীতেও তাঁর বহু ভূসম্পত্তি ছিল।[৪১]

ধনৈশ্বর্যের দিক থেকে মুর্শিদাবাদের কান্দি রাজপরিবারের পরে সম্ভবত দ্বিতীয়জন হলেন হুগলী জেলার সিঙ্গুড়ের দ্বারকানাথ বাবু। অথচ ১৭৯৯ সালে জমি কিনে জমিদার হওয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন অজ্ঞাতকুলশীল। তাঁর পিতা গোপীনাথ শীল অর্থোপার্জনের আশায় পাঞ্জাব থেকে বাংলাদেশে এসে সিঙ্গুড়ের মল্লিক-পরিবারে গৃহভৃত্যের কাজ করেন। দ্বারকানাথের বাল্যাবস্থায় পিতার মৃত্যু হয়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে তিনি ধনী ব্যক্তি-রূপে খ্যাতিলাভ করেন। অনেকের অনুমান, তিনি ডাকাতির দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। ১৭৯৯ সনের পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে তিনি যে-বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন, তা তৎকালীন ধনী বেনিয়ান ও ব্যবসায়ীদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। এ-সময়ে তাঁর বিশাল জমিদারির বার্ষিক জমা ছিল ৪,৭৪,৮৫২ সিক্কা টাকা।[৪২]

বাগবাজারের মুখার্জী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় রাজশাহীর কালেক্টর রুস সাহেবের, মিণ্ট মাষ্টার হ্যারিস সাহেবের ও আফিমের এজেণ্ট হ্যারিসন সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ানি করে তিনি প্রভূত বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন। দেওয়ান হরি ঘোষ (এঁর নাম থেকেই 'হরি ঘোষের গোয়াল' প্রবাদের-উৎপত্তি) কোম্পানির মুঙ্গের দুর্গের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ানি করে তিনি যে-প্রভূত পরিমাণে ধনোপার্জন করেন ও জমিদারি ক্রয় করেন, তা তৎকালীন কলকাতার অনেক ধনীকেই টেক্কা দিয়েছিল।[৪৩]

জোড়াসাঁকোর সিংহ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা শান্তিরাম সিংহ (কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রপিতামহ) পাটনার 'চীফ' মিডলটন সাহেবের ও স্যার টমাস রামবোল্ডের দেওয়ানি করতেন। সিমলার রামদুলাল দে 'ফেয়ারলি ফার্গুসন অ্যাণ্ড কোম্পানি'র দেওয়ান ছিলেন। কুমোরটুলির মিত্র-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম মিত্র কলকাতায় ইংরেজের জমিদারি-কাছারির দেওয়ান ছিলেন। জোড়াবাগানের

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার পটুয়ার আফিমের এজেন্সির দেওয়ানি করে সমৃদ্ধিলাভ করেন। কলুটোলার সেন-বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামকমল সেন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঘোষ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা অভয়চরণ ঘোষ এবং হাটখোলার দত্ত-বংশের পূর্বপুরুষদের মধ্যে রামচন্দ্র দত্ত, জগৎরাম দত্ত প্রমুখ কোম্পানির দেওয়ানি ও বেনিয়ানি করেছেন। ভুলুয়া ও চট্টগ্রামের নিমক-মহলের এজেন্ট হ্যারিস সাহেবের দেওয়ান ছিলেন রামহরি বিশ্বাস। দেওয়ানি করে তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তি করেন। ব্যানার্জী-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রামসুন্দর ব্যানার্জী পাটনার আফিমের এজেন্টের দেওয়ানি করে জমিদার হয়েছেন। কুমোরটুলির সরকার-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বনমালী সরকার পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের দেওয়ানি করে অতুল সম্পদের মালিক হয়েছেন। শ্যামবাজারের বসু-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণরাম বসু হুগলীতে কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন এবং লবণের ব্যবসা করে ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন।[৪৪]

বেনিয়ানগিরিতে বা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা-লাভ করে যাঁরা প্রভূত ধনসম্পত্তি করে ভূসম্পত্তি কিনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হৃদয়রাম (হিদারাম) ব্যানার্জী, রঘুনাথ ব্যানার্জী, অক্রুর দত্ত, নিমাইচরণ মল্লিক, মনোহর মুখার্জী, বারানসী ঘোষ, রামচন্দ্র মিত্র, বিশ্বনাথ মতিলাল, মদনমোহন দত্ত, বৈষ্ণবচরণ শেঠ, গঙ্গানারায়ণ সরকার, প্রাণকৃষ্ণ লাহা প্রমুখ। নিমাইচরণ মল্লিক 'ককারেল ট্রেল অ্যাণ্ড কোম্পানি'র বেনিয়ান ছিলেন। হিকি সাহেবের বেনিয়ান ছিলেন রঘুনাথ ব্যানার্জী ও হৃদয়রাম ব্যানার্জী। রামচন্দ্র মিত্র ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত বেনিয়ান। কলকাতা বন্দরে যে-সব জাহাজ আসত, সেই সব জাহাজের ক্যাপ্টেনদের বেনিয়ানি করে তিনি প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি করেছিলেন। গঙ্গানারায়ণ সরকার পামার কোম্পানির খাজাঞ্চি ছিলেন। ব্যবসা দ্বারা তিনি এত অর্থ উপার্জন করেছিলেন যে, তাঁকে কলকাতার শ্রেষ্ঠ ধনীদের অন্যতম বলা হত। বিশ্বনাথ মতিলাল প্রথম জীবনে এক লবণের গোলায় মাসিক আট টাকা বেতনে চাকরি করতেন। পরে বেনিয়ানি করে মৃত্যুকালে নগদ পনেরো লক্ষ টাকা এবং একাধিক বাজার-সহ বহু বিষয়-সম্পত্তি রেখে যান।[৪৫]

এই ইতিহাস তৎকালীন সমস্ত ধনী ব্যক্তিদের। জমিদারি, দেওয়ানি, বেনিয়ানি ও মুচ্ছুদ্দিগিরি—এই ছিল তাঁদের আয়ের সূত্র। ব্যবসা করে তাঁরা যে-অর্থ উপার্জন করেছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে সেই অর্থ জমিতে বিনিয়োগ করে জমিদার হয়েছেন। তবে যাঁরা উনিশ শতকের বাংলাদেশে নতুন রাজা-মহারাজা কিংবা বড় জমিদার-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ত্রিশের বেশি নয় এবং জমি বেচা-কেনার সরকারি হিসাবে দেখা যায় যে, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ জমি বনেদী পুরানো জমিদারদের কাছ থেকে হাত বদল হয়ে নতুন জমিদারদের কাছে গেছে।

রায়ত-কৃষকের তিন শত্রু

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে আবির্ভূত বাংলাদেশের নয়া জমিদাররা ছিলেন 'হঠাৎ রাজা'। বংশ-পরম্পরায় তাঁরা জমিদারি লাভ করেননি; তাঁরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ী-মূলধনী। লগ্নিকৃত মূলধন থেকে মুনাফা লাভই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং ক্রীত জমিজমায় ফসল না হলেও যাতে তাঁদের মুনাফা আদায় হতে পারে সেজন্যই তাঁরা নির্দিষ্ট বাৎসরিক খাজনার শর্তে স্থানীয় সম্পদশালী ব্যক্তিদের কাছে পত্তনি দিয়ে কলকাতা ও অন্যান্য বড় বড় শহরে বসবাস করেন এবং ভূসম্পত্তি থেকে লব্ধ উদ্বৃত্ত মুনাফা দ্বারা শহরে বিলাসে-ব্যসনে গা ভাসিয়ে দেন।

'পত্তনি' প্রথার প্রবর্তক হলেন বর্ধমানের মহারাজা। তাঁর সুবৃহৎ জমিদারিকে তিনি সহস্রাধিক তালুকে বিভক্ত করে বার্ষিক জমা গড়পড়তা প্রায় দু'হাজার টাকার ভিত্তিতে ইজারা দিলেন। এই জমির মালিকদের বলা হত পত্তনিদার। পত্তনিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন বাংলাদেশের মধ্যস্বত্বভোগী বা মধ্যশ্রেণী। 'অনুপস্থিত জমিদার' (Absentee Landlord) -এর প্রতিনিধি-রূপে তাঁরা কৃষকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেন। কিন্তু জমিদারের পন্থা অনুসরণ করে প্রথম স্তরের পত্তনিদাররা আবার তাঁদের অধীনে দ্বিতীয় স্তরের পত্তনিদার সৃষ্টি করেন; তাঁরা আবার তৃতীয় স্তরের পত্তনিদার সৃষ্টি করেন। এভাবে রায়ত-কৃষকের কাঁধে চেপে বসা ভূমিস্বত্বভোগীদের সাধারণভাবে আটটি স্তরে ভাগ করা যায়: (১) জমিদার (২) তালুকদার (৩) জোতদার, গাঁতিদার, হাওলাদার প্রভৃতি (৪) মৌরসী মোকররার (৫) ইজারাদার (৬) লাখেরাজদার (৭) ওয়াকফ্ বা ট্রাস্ট সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী (৮) চাকরাণ বা পাইকান। ভূমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্তর বিন্যাস করলে দেখা যাবে যে,

উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সমগ্র স্তরটিকে একটি সামাজিক পিরামিড-রূপে অভিহিত করা যায়। সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিলেন বড় বড় জমিদার —যাঁরা রাজা অথবা মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হতেন। নিম্নলিখিত সারণী[১] তে লক্ষ্য করা যায় যে, দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে বাংলাদেশের সমগ্র রাজস্বের অর্ধেকের বেশি আদায় করা হত মাত্র ১২টি বৃহৎ ভূস্বামী-পরিবারের কাছ থেকে।

১৭৯০ সনে বাংলাদেশের ভূমি-রাজস্ব :
১,৯০,৪০,০০০ সিক্কা টাকা।

ক্রমিক সংখ্যা	জমিদারির নাম	দশসালা চুক্তির জমা (হাজারের ভিত্তিতে)	বাংলার ভূমি-রাজস্বের শতকরা হার
১.	বর্ধমান রাজ	৩২,৬৬	১৭·১৫
২.	রাজশাহী রাজ	২২,৫০	১১·৮১
৩.	দিনাজপুর রাজ	১৪,৮৪	০৭·৭৯
৪.	নদীয়া রাজ	৮,৫৪	০৪·৪৮
৫.	বীরভূম রাজ	৬,৩০	০৩·৩১
৬.	বিষ্ণুপুর রাজ	৪,০০	০২·১০
৭.	ইউসুফপুর (যশোহর)	৩,০৩	০১·৫৯
৮.	রাজনগর (ঢাকা)	৩,০০	০১·৫৭
৯.	লসকরপুর (রাজশাহী)	১,৮৯	·৯৯
১০.	ইদ্রিকপুর (রংপুর)	১,৬০	·৮৪
১১.	রৌশনাবাদ (কুমিল্লা)	১,৫৪	·৮৪
১২.	জাহাঙ্গীরপুর (দিনাজপুর)	১,২৩	·৬৪
	সিক্কা টাকায় মোট=	১,০১,১৩,০০০	৫৩·১১%

'জমিদারদের পরবর্তী স্তরে পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, গাঁতিদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীরা ক্ষুদে জমিদারশ্রেণীতে পরিণত হলেন। হেস্টিংসের আমলে ১৭৭২ সালে বড় বড় জমিদার ও জমিদারির সংখ্যা একশতের খুব বেশি ছিল না। কিন্তু তারপর চিরস্থায়িত্ব ও মধ্যস্বত্বের ফলে ১৮৭২ সালের মধ্যে জমিদারির সংখ্যা বেড়ে দেড়লক্ষের বেশি হল। এর মধ্যে ৫৩৩টি হল বড় জমিদারি ২০,০০০ একরের উপরে, ১৫,৭৪৭ টি জমিদারি হল ৫০০ — ২০,০০০ একরের মধ্যে এবং ৫০০ একর ও তার কম জমিদারির সংখ্যা হল ১,৩৭,৯২০ টি। এই ক্ষুদে জমিদারির

সংখ্যাবৃদ্ধি থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদের উৎপাতের আধিক্য অনুমান করা যায়। 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' নীতি মধ্যস্বত্বভোগীরা গ্রাম্যসমাজে নির্বিচারে প্রয়োগ করেছেন এবং তারফলে গ্রামের কৃষক-প্রজারা ধনেপ্রাণে উচ্ছন্নে গেছে, গ্রাম্যসমাজের গোষ্ঠীবদ্ধতাও ধ্বংস হয়েছে।'[২]

জমিদারদের মতো মধ্যস্বত্বভোগী বা মধ্যশ্রেণীরও একমাত্র লক্ষ্য ছিল কৃষক-শোষণ; কৃষি-উন্নয়নের দিকে তাঁদের কোনো নজর ছিল না। প্রথম দিকে কৃষিকাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকলেও কালক্রমে তাঁরা প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হয়ে 'হঠাৎ রাজা'-দের মতো শহরবাসী হলেন এবং কৃষিক্ষেত্র থেকে বহু দূরে বসবাস করে কৃষক শোষণে নয়া জমিদারদের সহযোগী হলেন। তাঁদের উপরেও কোম্পানির অনুগ্রহ অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়েছিল; কারণ জমিদারদের মতো শ্রেণীগতভাবে তাঁরাও ছিলেন ভারতে ইংরেজ-শাসনের প্রধান রক্ষাস্তম্ভ এবং বিদ্রোহী কৃষকদের দমন করার কাজে প্রধান সাহায্যকারী। মধ্যশ্রেণীর ব্যক্তিগণ ভূস্বামীদের মতো কলকাতা শহরে থেকে কোম্পানির সেরেস্তাদারি, বিলিতি হুণ্ডি ও কোম্পানির কাগজ কেনা-বেচা, অভাবগ্রস্ত গ্রামীণ ব্যক্তিদের অথবা কোম্পানির সিভিলিয়ানদের অত্যধিক সুদে ঋণদান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কিছুদিনের মধ্যে সমাজে ধনী ব্যক্তি-রূপে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন। 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় এক ধনী ব্যক্তির চিঠি (৮.১২.১৮৪৯ খ্রী:) প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে মধ্যশ্রেণীর জীবিকার সন্ধান পাওয়া যায়: "...সম্পাদক মহাশয়, আমি বিলাতীয় হুণ্ডী, কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বিক্রয় করিতাম, এবং প্রজালোককে ধান্তের বাড়ি নিয়মে ধান্য দিতাম, আর অগ্রায়ণ ও পৌষ মাসের ধান্য কাটা হইলে জমীদারেরা রাজস্বের জন্য ধান্য ক্ষেত্রে আটক করিতে আমি অধিক সুদি খত লেখাইয়া লইয়া প্রজাদিগকে রাজস্বের টাকা দিতাম এবং সোনারূপা হীরকাদি বন্ধক রাখিয়া ভদ্র-লোকদিগকে গত পাঁচ বৎসরে অনেক টাকা দিয়েছি... ।'[৩]

মধ্যশ্রেণী বা মধ্যস্বত্বাধিকারী ব্যক্তিগণ ছিলেন ভারতে ব্রিটিশ-শোষণের প্রধান সামাজিক ভিত্তি। ভূস্বামীদের মতো এই মধ্যশ্রেণীও যাতে বিত্তশালী হয়ে সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করতে পারে, সেদিকে ইংরেজ-সরকার লক্ষ্য রেখেছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন। ভূস্বামীশ্রেণীর মতো মধ্যশ্রেণীকেও যে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ পরিকল্পনা-অনুযায়ী লালন-পালন করেছিলেন, তা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ভারতসচিবের নির্দেশনামায় জানা যায়: "বর্তমান ভূস্বামী ও জমিদারগণকে সম্পত্তিচ্যুত না করে ভূসম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মধ্যশ্রেণীর ক্রমবিকাশের সকল সুযোগ দান করা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ...এই মধ্যশ্রেণীর লোকেরা যখন ভূসম্পত্তির অধিকার লাভ করে সম্পদশালী হয়ে উঠে, তখন তারাও তাদের সুযোগদানকারী শাসনব্যবস্থার প্রতি অনুরক্ত না হয়ে পারে না। কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর (অর্থাৎ জমিদারশ্রেণীর) অধিকাংশ এবং প্রধানত এদের (মধ্যশ্রেণীর) সন্তুষ্টি বিধানের উপরেই সরকারের

নিরাপত্তা নির্ভর করে। এই মধ্যশ্রেণীটি যদি সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠে, তবে অন্য কোন শ্রেণীর আকস্মিক বিদ্রোহ আরম্ভ হলে সেই বিদ্রোহ বিপজ্জনক হয়ে উঠার সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং সেই অবস্থায় প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যয়ভারও সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়।"[৪]

শাসক-গোষ্ঠীর সযত্ন প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি। প্রত্যেকটি গণবিদ্রোহে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাসংগ্রামে ও বিভিন্ন সময়ের জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই মধ্যশ্রেণী ও জমিদারগোষ্ঠী 'সুযোগদানকারী শাসনব্যবস্থার প্রতি অনুরক্ত' থেকে 'সরকারের নিরাপত্তা' রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন। বঙ্গীয় জমিদার সঙ্ঘের (Bengal Landholders' Association) সভাপতি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাটকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "মহামান্য বড়লাট বাহাদুর জমিদারবর্গের সমর্থন ও অকপট সহযোগিতার উপর নিশ্চিন্ত ভরসা স্থাপন করিতে পারেন।"[৫] ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জমিদার সঙ্ঘের সভাপতি ময়মনসিংহের মহারাজা ঘোষণা করেছিলেন, "জমিদারশ্রেণী-রূপে আমাদের টিঁকিয়া থাকিতে হইলে গভর্নমেণ্টের শক্তি বৃদ্ধি করাই হইবে আমাদের কর্তব্য।"[৬] তাই স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁরা শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার তাগাদায় ইংরেজ-শিবিরে থেকে ব্রিটিশ-সেবা করেছেন, স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের পাশে দাঁড়াননি। তৎকালীন খ্যাতনামা বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী নেতা হেমচন্দ্র কানুনগো তা লক্ষ্য করে বলেছেন, "একাজে (অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টায় —লেখক) সরকারি ছোটবড় কর্মচারীদের মধ্যে এমনকি পুলিশের কাছেও বরং সাড়া পাওয়া গেছিল, কিন্তু জমিদারশ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে কম সাড়া পেয়েছি।"[৭]

ব্রিটিশ-শক্তির প্রতি ভূস্বামীশ্রেণীর আনুগত্য কেবলমাত্র বিশ শতকে নয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় থেকেই তাঁদের এই আনুগত্যের প্রকাশ ঘটেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তা লক্ষ্য করেছিলেন। 'পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির নিকট সাক্ষ্য প্রদানকালে ইণ্ডিয়া হাউসের পদস্থ অফিসার টমাস পীকক বলেছিলেন, ভারতীয় জনমতের শুধু একটি অংশই আমাদের সামরিক শক্তির অনুকূল ; সেটা হল জমিদারদের অভিমত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থাপনায় তাঁদের স্বার্থ আমাদের স্বার্থের সঙ্গে একাত্ম বলে স্বীকৃত। এছাড়া অন্য কোন জনমত আমাদের অনুকূলে সক্রিয় নয়।'[৮]

কৃষক-শোষণের মহোৎসবে ইংরেজ-শাসক ও জমিদার-মধ্যশ্রেণীর সঙ্গে যোগ দেন মহাজনরা। প্রাক্‌-ব্রিটিশ যুগে মহাজনদের রক্ত-তৃষ্ণা যৌথসমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ-আইনে মহাজন কর্তৃক ঋণগ্রস্ত কৃষকের সম্পত্তি ক্রোক এবং জমি হস্তান্তরের ব্যবস্থা থাকায় মহাজনরা মহাসুযোগ লাভ করলেন। কৃষকরা খাজনার টাকা সংগ্রহের জন্য মহাজনদের কাছে জমি-বাড়ি বন্ধক রেখে তাঁদের কাছ থেকে অত্যধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কয়েক বছর পরে সুদসহ ঋণ শোধ করার ক্ষমতা কৃষকের আর থাকে না। তখন সেই ঋণের দায়ে মহাজন কৃষকের জমি ও ঘর-বাড়ি দখল করেন। কৃষকদের জমি-গ্রাসের জন্য

মহাজনদের উদগ্র লোভ-লালসাকে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্রিটিশ-সরকার প্রতিহত করেননি। যেহেতু মহাজনের কাছ থেকে ঋণ না পেলে কৃষক খাজনা দিতে পারেন না, সেহেতু মহাজন ইংরেজ-শাসনের ভূমি-রাজস্ব আদায়ের প্রধান ও অপরিহার্য সাহায্যকারী-রূপে দেখা দিল। তাই শাসক-গোষ্ঠীর প্রশ্রয়ে বহু মহাজন কালক্রমে জমিদার হয়ে কৃষক-শোষণের যোগ্য অংশীদারে পরিণত হন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্টি করেছে কৃষক-সমাজের তিনটি ভয়ঙ্কর শত্রু— ইংরেজ-শাসকগণ আদায় করেন তাঁদের ভূমি-রাজস্ব; এই ভূমি-রাজস্বের উপরে জমিদার-মধ্যশ্রেণী আদায় করেন তাঁদের ক্রমবর্ধমান খাজনা ও নানাবিধ বেআইনী আব্ওয়াব, মাথট, মাগন ইত্যাদি, আর মহাজনরা ঋণের সুদ হিসাবে কৃষকের অবশিষ্ট ফসলের প্রায় সমস্তটুকুই কেড়ে নেন। এ-সম্পর্কে রেভারেণ্ড আলেব জাণ্ডার ডাফ ও কুড়ি জন মিশনারি বলেছেন (এপ্রিল, ১৮৭৫ খ্রী:), "জমীদাররা চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করেন ঠিক প্রজাদের মতো নয়, কতকটা ক্রীতদাসের মতো। তাঁরা নিজেদের রাজা-মহারাজাদের মতো মনে করেন। প্রজাদের কাছে খাজনাদি যা তাঁদের ন্যায্য পাওনা, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁরা নানা কৌশলে আদায় করেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে নিজের নানারকমের কাজে প্রজাদের খাটিয়ে নেন। তাছাড়া অত্যাচার যে কত রকমের করেন তা বলে শেষ করা যায় না।"[৯] মধ্যশ্রেণীর নৃশংস শোষণ-পীড়ন সম্পর্কে 'সম্বাদ প্রভাকর' লিখেছেন (১৮.১১.১৮৯২ খ্রী:), "গবর্ণমেণ্টের নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করিয়া কেবল জমীদারেরাই ভূমির উৎপন্নের লাভাংশ ভোগ করিয়া থাকেন এমত নহে, জমীদারদিগের অধীন যে সমস্ত তালুকদার ও পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, ইজারাদার প্রভৃতি আছেন, তাঁহারা কৃষকের শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতি আপনাপন সুখসেবা ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করণের সম্যক নির্ভর করিয়া থাকেন অর্থাৎ কৃষকদিগকে আপনাপন শ্রমার্জিত ধন দিয়া এই সকল লোকেরও পুষ্টিবর্দ্ধন করিতে হয়।"[১০] ভূম্যধিকারী-ব্যক্তিগণ বলপূর্বক কৃষকদের কাছ থেকে তাঁদের 'শ্রমার্জিত ধন' কেড়ে নেন। তাঁরা কৃষক-প্রজাদের উপরে যে-কতপ্রকারের দৈহিক পীড়ন করে থাকেন, তার একটি দীর্ঘ আঠারো দফা তালিকা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেছে (আগস্ট, ১৮৫০ খ্রী:, ৮৪ সংখ্যা): (১) দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত (২) চর্মপাদুকা প্রহার (৩) বংশকাষ্ঠাদি দ্বারা বক্ষ:স্থল দলন (৪) খাপরা দিয়া কর্ণ ও নাসিকা মর্দন (৫) ভূমিতে নাসিকা ঘর্ষণ (৬) পিঠে হাত বেঁকিয়ে বেঁধে বংশদণ্ড দিয়ে মোড়া দেওয়া (৭) গায়ে বিছুটি দেওয়া (৮) হাত-পা নিগড়বদ্ধ করা (৯) কান ধরে দৌড় করানো (১০) কাটা দু'খানা বাঁধা বাখারি দিয়ে হাত দলন করা (১১) গ্রীষ্মকালে ঝাঁ ঝাঁ রোদে পা ফাঁক করে দাঁড় করিয়ে, পিঠ বেঁকিয়ে, পিঠের উপর ও হাতের উপর ইঁট চাপিয়ে রাখা (১২) প্রচণ্ড শীতে জলমগ্ন করা ও গায়ে জল নিক্ষেপ করা (১৩) গোণীবদ্ধ করে জলমগ্ন করা (১৪) বৃক্ষে বা অন্যত্র বেঁধে লম্বা করা (১৫) ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ধানের গোলায় পুরে রাখা (১৬)

চুনের ঘরে বন্ধ করে রাখা (১৭) কারারুদ্ধ করে উপোস রাখা (১৮) গৃহবন্দী করে লঙ্কা-মরীচের ধোঁয়া দেওয়া।[১১]

কিন্তু বাংলার কৃষক নীরবে সহ্য করেননি জমিদার-মহাজন ও কোম্পানির শোষণ-অত্যাচারকে। তাঁরা শোষণের জালকে ছিন্নভিন্ন করে মুক্তিলাভের জন্য বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করেছেন। কৃষক ও কারিগরদের সর্বপ্রথম দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহ আরম্ভ হয় ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। সারা বাংলাদেশে এই বিদ্রোহের বিস্তার ঘটে। ১৮০০ সন পর্যন্ত তাঁরা ইংরেজ-শাসক ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তাঁদের এই বিদ্রোহ ইতিহাসে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে তাঁদের এই সুদীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম সার্থক না হলেও তাঁরা থেমে থাকেননি, হতাশায় আত্মসমর্পণ করেননি। তাই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বারেবারে দেখা দিয়েছে কৃষকদের সশস্ত্র বিদ্রোহ। মেদিনীপুর, ত্রিপুরা, সন্দ্বীপ, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রংপুর, যশোহর, খুলনা, বীরভূম, বাঁকুড়া, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকরা শোষণ-শৃঙ্খলকে ভেঙে ফেলার জন্য কখনো সংগঠিতভাবে, কখনো অসংগঠিতভাবে আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী সুসংগঠিত শত্রুর সম্মুখীন হয়েছেন; তাঁদের মৃত্যুপণ সংগ্রামে অদম্য উৎসাহ-প্রেরণা দিয়েছে ওয়াহাবী বিদ্রোহ, ফরাজী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ ও ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ। অত্যাচার-উৎপীড়নের অবসানের জন্য তাঁত-শিল্পী, রেশম-শিল্পী, লবণ-কারিগর, আফিম-চাষী প্রভৃতি সকলেই সংগ্রাম করেছেন। এই সব বিদ্রোহ-সংগ্রামকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেবার জন্য বিদেশী শাসক ও দেশীয় জমিদাররা চরম অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন মধ্যস্বত্বাধিকারীরা বা মধ্যশ্রেণী। কিন্তু বাংলার কৃষক ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন না। শোষক-গোষ্ঠীর পশুশক্তির কাছে তাঁরা পরাজিত হলেও আন্দোলন, সংগ্রাম ও বিদ্রোহের পথ পরিত্যাগ করলেন না। তাই অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনিশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত মুক্তিকামী কৃষকের বন্ধন-মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে, তাঁদের পদভারে কম্পিত হয়েছে বাংলার মাটি।

কোম্পানি, জমিদার ও মহাজনদের ভয়াবহ শোষণ-পীড়নে যখন কৃষকের জীবন রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত, তখন বাংলার সমাজ-জীবনে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পূর্বে তিনি বৈষয়িক কাজে মফঃস্বলের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছেন এবং জন ডিগবির দেওয়ান-রূপে অর্থোপার্জন করেছেন, সিভিলিয়ানদের চড়া সুদে ঋণ দিয়েছেন, কোম্পানির কাগজের কেনা-বেচা করেছেন। বাংলার কৃষকরা যখন শ্বেতাঙ্গ বণিক ও দেশীয় জমিদার-মধ্যশ্রেণীর অত্যাচারে আর্তনাদ করছেন, প্রতিকারের দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন, বিদ্রোহ করছেন, তখন রাজা রামমোহন ক্রমাগত

ভূসম্পত্তি কিনেছেন। ইংরেজ-কর্মচারী ও জমিদারদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরের চোয়াড় ও পাইকরা যখন সশস্ত্র বিদ্রোহ করে কোম্পানির শাসকদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন, তখন রামমোহন আশ্চর্যজনক-ভাবে নীরব থেকেছেন, অথচ তখন তিনি ২৬ বছরের পূর্ণ বয়স্ক যুবক। বিদ্রোহীদের আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শাসক-গোষ্ঠীর অনুচররা যখন চন্দ্রকোনা থেকে পলায়ন করেছেন, তখন তিনি চন্দ্রকোনায় বড় তালুক কিনেছেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অত্যন্ত লাভজনক যে-দুটি বড় তালুক কিনেছেন, তার একটি হল চন্দ্রকোনা পরগণায় রামেশ্বরপুর এবং অন্যটি জাহানাবাদ পরগণায় গোবিন্দপুর। এই দু'টি তালুক থেকে আদায়-খরচ ও সদর-জমা (বাৎসরিক ২১,৮৬৮৭১৯) দিয়ে পাঁচ ছয় হাজার টাকা তাঁর আয় হত। এছাড়া তিনি ১৮০৩ সনে লাঙ্গুলপাড়ায় নতুন তালুক কেনেন (এটি তাঁর লাঙ্গুলপাড়াস্থিত পৈত্রিক তালুক ভিন্ন অন্য একটি তালুক)। ১৮০৮-১৮০৯ সালে তিনি জাহানাবাদ পরগণার বীরলুক নামে একটি তালুক ও ১৮০৯-১৮১০ সনে কৃষ্ণনগর ও শ্রীরামপুর (ভূরসুট পরগণা) নামে দু'টি তালুক কেনেন। সব ক'টি তালুকই বর্ধমান জেলায় অবস্থিত ছিল। কলকাতায় তিনি চৌরঙ্গী অঞ্চলে অবস্থিত একটি বড় দোতলা বাড়ি ২০,৩১৭ সিক্কা টাকায় এবং মাণিকতলার কাছে আরো একটি বাগান-সহ বাড়ি ১৩,০০০ সিক্কা টাকায় কেনেন। তাছাড়া তিনি ক্রমান্বয়ে কাবিলপুর, কেদারপুর, ধাণ্ডলা, দীঘচক, চকজয়রাম, গৌরাঙ্গপুর, চিঙ্গড়াদীং, লাউসর, খড়িগেড়, জগীকুণ্ডু, সোলা, রঞ্জিতবাটী, আস্তা, বাসুচক, মড়াখালি, রায়বাড়, আটঘরা, সুদামচক, অযোধ্যা, কল্লাহার প্রভৃতি বহু ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছেন। এভাবে জমিতে অর্থ লগ্নি করে তিনি বৃহৎ জমিদার হয়েছেন। তারফলে 'ঔপনিবেশিক শাসন ও আর্থনীতিক কাঠামোয় তাঁর অবস্থান বিশেষ সম্পর্ক ও দায়দায়িত্ব দ্বারা চিহ্নিত হয়ে যায়। এই সম্পর্ক শাসকদের পক্ষ থেকে নানান আইনগত প্রতিশ্রুতি ও জমিদারদের তরফে আনুগত্যের শর্ত দ্বারা স্বীকৃত।'[১২]

বৈষয়িক কর্মোপলক্ষে রামমোহন সর্বপ্রথম ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় এসে কোম্পানির সাহেবদের সঙ্গে এবং ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং কোম্পানির সিভিলিয়ান অ্যাণ্ডরু রামজেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা ঋণ দিয়েছেন; ১৮০২ সনে তিনি আবার কলকাতায় এসে টমাস উডফোর্ড নামে কোম্পানির আর একজন সিভিলিয়ানকে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ দিয়েছেন। রামমোহন কলকাতায় এসে এইসব সাহেবদের টাকা ধার দিয়ে তেজারতি কারবার শুরু করলেন, যেমন আরো দশজন ধনী 'বাবু' কলকাতায় বসে লগ্নি কারবার করতেন।[১৩] কলকাতায় তখন বহু ইংরেজ বাস করেন; তাঁদের মধ্যে অনেকেরই আয় থেকে ব্যয় বেশি। লগ্নি-কারবারের সূত্রে অনেক ইংরেজের সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় হয়। এই প্রসঙ্গে একালের রামমোহনের জীবনীকার লিখেছেন, "কলকাতায় এসে রামমোহন তেজারতি কারবার শুরু করেছিলেন।

ঐ সময়ে তাঁর কারবারে গোলকনারায়ণ সরকার নামে এক ব্যক্তিকে কেরানী নিযুক্ত করেছিলেন। কয়েক বছর বাদে (বাংলা ১২০৮ সাল — ইং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি গোপীমোহন চ্যাটার্জী নামে এক ব্যক্তিকে তাঁর তবিলদার বা কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। এ-থেকে বোঝা যায়, তেজারতি কারবারে তাঁর দ্রুত উন্নতি হচ্ছিল।"[১৪]

রাজা রামমোহন বুদ্ধিমান হুঁশিয়ার যুবক। ধনী ও সম্পদশালী-রূপে কলকাতায় তিনি সুপরিচিত হয়েছেন। অথচ রামমোহনের বড় ভাই জগমোহন সরকারি খাজনা বাকি রাখার অপরাধে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জেলে দীর্ঘকাল আটক হয়ে আছেন; ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ রামমোহন যখন মুর্শিদাবাদে, তখন সরকারকে কিছু টাকা দিয়ে জেল থেকে মুক্তিলাভের জন্য জগমোহন ছোটভাই রামমোহনের কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লেখেন। অনেক চিঠিপত্র লেখালেখির পরে সুদ সমেত দেনা শোধ করবেন এই মর্মে ১৮০৫ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে জগমোহন তমসুক লিখে দেবার পরে রামমোহন বড় ভাইকে এক হাজার টাকা ঋণ দেন। সেই টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে জগমোহন ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ মার্চ জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। বাকি খাজনার দায়ে রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ও কারারুদ্ধ হয়েছিলেন (১৮০০ খ্রী:)। 'বাবাকে ঋণমুক্ত করে কারামুক্ত করবার মতো সঙ্গতি রামমোহনের নিশ্চয় তখন ছিল। কিন্তু রামমোহন এবিষয়ে নিষ্ক্রিয় ছিলেন।'[১৫]

স্বোপার্জিত ভূসম্পত্তি ছাড়াও রামমোহন পৈত্রিক ভূসম্পত্তি পেয়েছেন। ১৭৯৬ সালে পিতা রামকান্ত তাঁর বিষয়-সম্পত্তি দানপত্র দ্বারা পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেন। তাঁর দানপত্রে রামমোহনের অংশ সম্পর্কে নিম্নের বিবরণটি[১৬] লিখিত আছে:

"শ্রী রামমোহন রায়ের অংশ

মৌজা লাঙ্গুলপাড়া: —

বসতবাটি ও বেড়, চৌহদ্দীযুক্ত, গাছ প্রভৃতি সহ এবং
খিড়কীর দরজার দিকে পুষ্করিণী ও নূতন পুষ্করিণী।

এই সকলের অর্দ্ধেক	—১ দফা
গোহালবাড়ী ও বেড়, গাছ সহ ও চৌহদ্দীযুক্ত বাড়ী	— ৮ বিঘা

মৌজা কৃষ্ণনগর:—

সূর্যদাস রায়ের বেড় ধানের জমি	— ৯ বিঘা
কোঠালিয়ারকুণ্ডের ধানের জমি	— ৩ বিঘা
পরগণা চন্দ্রকোনায় পুরণচক	— ৭০ বিঘা
মৌজা কাট্যাদলে পৈতৃক বেড়ে আমার অংশ	— ১ দফা
মৌজা কলিকাতার জোড়াসাঁকোতে রামকৃষ্ণ শেঠ ও অন্যান্য লোক হইতে ক্রীত বাড়ী ও পুষ্করিণী। চৌহদ্দীযুক্ত	— ১ দফা

গোপীনাথপুরে পৈত্রিক পুষ্করিণীতে নিজ অংশ — ১ দফা।"

রামমোহনের অংশে কয়েকটি মূল্যবান ভূসম্পত্তি পড়েছিল। রাজস্ব-আদায়ের খরচ বাদে তাঁর হাতে প্রায় বাইশ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকত।

শিক্ষাগ্রহণের সময়ে, বৈষয়িক ব্যাপারে ও কোম্পানির কাজে রামমোহন বাংলা-বিহারের বিভিন্ন মফঃস্বল-অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন। এ-সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের নৃশংস অত্যাচার, ভূস্বামী-মহাজনদের নিষ্ঠুর শোষণ-উৎপীড়ন আর জমিহারা কৃষকদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের প্রয়াস —এ-সব চিত্র মফঃস্বল-বাসের সময়ে স্বাভাবিকভাবেই রাজা রামমোহনের চোখে পড়েছে, কানে এসেছে; কিন্তু এ-সম্পর্কে তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায় না। এ-বিষয়ে সেকালের ও একালের রামমোহনের জীবনীকাররা নীরব; যদিও তাঁরা ভাগলপুরের কালেক্টর ফ্রেডারিক হ্যামিল্টনের সঙ্গে রামমোহনের ব্যক্তিগত সংঘর্ষের কাহিনীর (১৮০৯ খ্রী:) বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তবে 'আত্মকথা বলতে গিয়ে একটি পত্রে তিনি বলেন, প্রথম যৌবনে বিদেশী শাসন সম্পর্কে তিনি বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন, পরে ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার সময় থেকে, অন্য কথায় তাদের সঙ্গে বানিজ্যিক লেনদেনে লিপ্ত হওয়ার পর থেকে, তিনি ভিন্নতর মত পোষণ করতে আরম্ভ করেন।'[১৭] অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থে রাজা রামমোহন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে মৈত্রীভাবাপন্ন মনোভাব পোষণ করতেন; অথচ কোম্পানি-শাসন ছিল কৃষক-স্বার্থ-বিরোধী।

৪

উনিশ শতকের কলকাতা

নয়া শোষণের কেন্দ্র-রূপে গড়ে উঠেছে কলকাতা। ১৭৭৪ সনে বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম গভর্নর-জেনারেল হলেন, আর কলকাতা হল সারা ভারতের রাজধানী। নয়া সভ্যতা ও বণিক-শক্তির প্রতীক কলকাতা; কিন্তু তার সর্বাঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক চিহ্ন। যানবাহনে, জীবনযাত্রায়, চরিত্রে, ধর্মে, সংস্কৃতিতে —সর্বত্র তার সামন্ত-পরিচয় বর্তমান। 'এক নবাবী আমল শেষ হল, আর এক নবাবী আমল আরম্ভ হল। গোটা অষ্টাদশ শতাব্দীকেই প্রায় তাই বলা চলে। ইংরেজ-নবাব এবং তাঁদের প্রসাদপুষ্ট বাঙ্গালী দেওয়ান ও বেনিয়ানদের স্বর্ণযুগ।'[১] এঁদের নবাবীয়ানা চলেছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। এঁরা নবাবের কায়দায় হাতি পুষতেন। হাতি ছিল সামন্ত গৌরবের প্রতীক। তখন কলকাতায় হাতি নিলামে বিক্রি হত। হাতির পিঠে হাওদায় বসে সাহেবরা ও দেশীয় বিত্তবানরা নতুন কলকাতা শহরে ঘুরে বেড়াতেন, পাল্কি চড়ে কর্মস্থলে যাতায়াত করতেন, ঘোড়ায় চড়ে সান্ধ্যভ্রমণে বেরুতেন; তাছাড়া ছিল বহুমূল্যের এক ঘোড়া কিংবা দু' ঘোড়ার গাড়ী।

বাণিজ্যের স্বার্থে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি ও ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে হঠাৎ-শহর কলকাতা, আর ধনোপার্জনের আশায় কোম্পানির সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য সেই কলকাতায় ভীড় করেছেন 'হঠাৎ রাজার' দল। 'কলকাতা শহরে তখন বিপুলকায় মেদবহুল রাজা-মহারাজা, বেনিয়ান-ইজারাদারদের জীবনযাত্রা ছিল সর্বক্ষেত্রে ইংরেজ-মহাপ্রভুদের অনুগামী। গৃহের আসবাবপত্তরে, দাসদাসীর সমাবেশে, ভোজ-সভার নৃত্যগীত সমারোহে, উৎসব-পার্বণের

কৃত্রিম বিলাসে, এদেশীয় সমাজের নব্য প্রধানেরা বিদেশী শাসকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লোকচক্ষে সামাজিক মর্যাদা-লাভের জন্য তখন অত্যধিক লালায়িত হয়েছিলেন।'[২]

বণিক-নগরী কলকাতার চতুর্দিকে অবক্ষয়ের চিহ্ন। নবাবী-আমল শেষ হলেও নবাবী-সংস্কৃতির অবলুপ্তি তখনো ঘটেনি। অষ্টাদশ শতকের নবাবী-সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে উনিশ শতকের বাবু-সংস্কৃতিতে। 'দেওয়ানি ও বেনিয়ানির অপরিমিত অর্থে বিলাসিতার স্রোত বয়ে গিয়েছে তখন কলকাতার পথে। সাহেবদের বাড়িতে যেমন, তাঁদের কৃপাশ্রিত বাঙ্গালী রাজা-মহারাজাদের বাড়ীতেও তেমনি ভোজ চলেছে, বাইজী-নাচ চ'লছে।'[৩] কুলীনের নয় লক্ষণের ন্যায় এই বাবুদেরও নয় লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছিল। এই নয় লক্ষণ হচ্ছে—'ঘুড়ী তুড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মুনিয়া গান। অষ্টাহে বনভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ।'[৪]

এই হঠাৎ রাজার দল সকালে 'অখণ্ড দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত অনবরত পণ্ডিত পরিসেবিত' এবং 'অপূর্ব্ব পোষাক জামাজোড়া ইত্যাদি পরিধানপূর্ব্বক পাল্কী বা অপূর্ব্ব শকটারোহণে কর্ম্মস্থানে গমন করেন'।[৫] এবং সন্ধ্যাকালে কুরুচিপূর্ণ বিলাসে-ব্যসনে, কুৎসিত আমোদে-প্রমোদে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেন। 'এক একজন ছেলেমেয়ের বিবাহে বা বাপমায়ের শ্রাদ্ধে দুই লক্ষ থেকে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করতেন। অনেকে আবার সখ করে বিড়ালের বিয়েতেও এরূপ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেন। এ সব উৎসবে তাঁরা সাহেব মেমদের নিমন্ত্রণ করতেন এবং তাঁদের আপ্যায়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সুরাপান ও নিষিদ্ধ খানাপিনার ব্যবস্থা করতেন।'[৬] যেমন, ১৮২০ সালে রামরতন মল্লিক জাঁকজমক-সহকারে তাঁর পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন। সংবাদপত্রে খবর ছাপা হয়, 'এমন বিবাহ শহর কলিকাতায় কেহ কখনও দেন নাই। এই বিবাহে যেরূপ সমারোহ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে সাত আট লক্ষ টাকার ব্যয় ব্যতিরেকে এমত মহাঘটা হইতে পারে না।' এবং 'সকল লোকেই এ বিবাহের প্রশংসা করিতেছে ও কহিতেছে যে এমন বিবাহ আমরা দেখি নাই।'[৭] গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ একই কারণে ব্যয় করেছিলেন ৯ লক্ষ টাকা। রাজা গোপীমোহন দেবের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ এমন জাঁকজমক-সহকারে করা হয়েছিল যে, দশ হাজারের বেশি দরিদ্র মানুষ ও ব্রাহ্মণ রাজার কাছ থেকে নগদ অর্থ পেয়েছিলেন এবং যখন অর্থ বিতরণ করা হচ্ছিল, তখন এমন ভীড় হয়েছিল যে, সেই ভীড়ের চাপে চৌদ্দ জন মারা গিয়েছিলেন এবং আহতের সংখ্যা ছিল অসংখ্য; যদিও সেই ভীড় সামলানোর জন্য রাজার কর্মচারীরা বিশেষ সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। গোপীমোহন দেবের মাতৃশ্রাদ্ধে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। গোপীমোহন ঠাকুরের শ্রাদ্ধে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে দু' লক্ষের বেশি জনসমাগম ঘটেছিল এবং ১০৬টি

বাড়িতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমোদ-স্ফূর্তির জন্য নদীয়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৩০ সালে বানরের বিয়েতে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। কেবলমাত্র আনন্দ-উৎসবে নয়, নব বাবুরা নবাবী চালে তীর্থযাত্রা করেছেন। কান্দির জমিদার ১৮২২ সনের জুলাই মাসে যখন কাশী ও গয়ায় তীর্থযাত্রা করেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিল পরিবারের সকলে ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক, পণ্ডিত, পুরোহিত, বন্ধু-বান্ধব, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী প্রভৃতি সাত-আট শ' জন। এঁদের জন্য ২৮টি বিলাসবহুল বড় বড় বজরার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এ-ভাবে তাঁরা অকাতরে অনুপার্জিত ধন ব্যয় করেছেন। 'তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না। বরং কোনও সুহৃদগোষ্ঠীতে পাচজন লোক একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্তিদিগের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হইত। ··· ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসিনীদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। তখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্য-ভারতবর্ষ হইতে এক শ্রেণীর গায়িকা ও নর্ত্তকী শহরে আসিত, তাহারা বাঈজী এই সম্ভ্রান্ত নামে উক্ত হইত। নিজ ভবনে বাঈজীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা ও তাহাদের নাচ দেওয়া ধনীদের একটা প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল। কোন্ ধনী কোন্ প্রসিদ্ধ বাঈজীর জন্য কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ শহরের ভদ্রলোকদিগের বৈঠকে বৈঠকে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তত দোষাবহ জ্ঞান করিত না। এমন কি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংসৃষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে প্রাধান্য লাভের একটা প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। ··· এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার এসরাজ বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনা-দিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত এবং খড়দহের মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনা-দিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।'[৮] আবার 'কোন কোন স্থানে সন্দেশের মজলিশ অর্থাৎ গোল্লা বিচাইয়া তাহার উপর বসিয়া বৈঠকী সঙ্গীত হইত। কোন কোন স্থানে মানুষ পক্ষীর সভা অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ খাঁচার ভিতর মানুষ পক্ষীস্বরূপ থাকিতেন—সভায় আনীত হইলে কেহ কাক, কেহ কাদা খোঁচা, কেহ সারস, কেহ বক এইরূপ নানা পক্ষীর প্রকৃতি দেখাইতেন ও মধ্যে মধ্যে গান করিতেন যথা "কুরুড় কিং ল্যাক জ্যাকসন, গুলবর জ্যাকসন, আলিপুরি জ্যাকসন, কু—ড়—।"[৯] এই জাতীয় আমোদ-অনুষ্ঠানে ডেভিড হেয়ার, লর্ড অকল্যাণ্ডের বোন মিস ইডেন, ফ্যান্সী পার্কস প্রমুখ সেকালের বিশিষ্ট ইংরেজ পুরুষ ও মহিলারা যোগ দিয়েছেন।

সন্ধ্যা হলেই নগর কলকাতাকে নাগর-কলকাতা বলে মনে হত। 'তত্ত্ব-

বোধিনী পত্রিকা'য় বলা হয়েছে [১ শ্রাবণ, ১৭৬৮ শকাব্দ (১৮৪৬ খ্রী:), ৩৬ সংখ্যা], "সন্ধ্যার পর নগর মধ্যে পাপের মহোৎসব উপস্থিত; কোন স্থানে বহু ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া গনিকার গৃহে প্রবেশ করিতেছে, কুত্রাপি কোন বাবুর কদাচারের সাক্ষী স্বরূপ অশ্ব যান তাঁহার রক্ষিতা বেশ্যা দ্বারে স্থাপিত রহিয়াছে; কোন কোন বেশ্যার আলয় হইতে মাদকোন্মত্ত সমূহ লম্পটের উল্লাস কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে, কুত্রাপি গনিকার অধিকার জন্য বিমোহিত পুরুষেরা বিবাদ কলহ সংগ্রামে প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইতেছে।"[১০]

বুলবুল পাখির লড়াই, খেউর গান, বাই-নাচ ও বেশ্যা-গমন — এই ছিল নগর কলকাতার নাগরিক জীবনের একমাত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়। 'আত্মীয়-সভা' ও 'ধর্মসভা'র গোষ্ঠীভুক্ত রাজা রামমোহনের বাড়িতে, প্রিন্স দ্বারকানাথের বাগান বাড়িতে, রাজা রাধাকান্ত দেবের গৃহে, মহারাজা সুখময় রায়ের বাড়িতে, রাজা গোপীমোহন দেবের বাড়িতে, বেনিয়ান বারাণসী ঘোষের বাড়িতে নাচ-গান, মদ-বাইজী ও আতসবাজী পোড়ানোর বল্গাহীন কুৎসিত আমোদ-প্রমোদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা চলত। ১৮২৯ সালে গোপীমোহন দেবের বাড়িতে পূজা উপলক্ষে লর্ড ক্যাম্বারমিয়ার-সহ লর্ড ও লেডি বেন্টিঙ্ক বাই-নাচ দেখার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। নিকী, আশরুম, নিন্নাত, ফৈজ বক্স, বেগমজান, হিঙ্গুল, নান্নিজান, সুপনজান, বাইজীভাই প্রমুখ সেকালের বিখ্যাত বাঈজীদের নিয়ে এসে নাচগানের ব্যবস্থা করা হত। নর্তকীদের আনার জন্য পাল্কী পাঠিয়ে দেওয়া হত। সঙ্গে যেত পাইক ও বরকন্দাজ। পাল্কীটাকে বেহারারা নাটমন্দিরের সামনে এনে নামাত। 'রাজা সাহেব এগিয়ে আসতেন খুশী উজ্জ্বল দুটো কামাতুর চোখ নিয়ে। মোসাহেবের দল অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে পাল্কীর রুদ্ধ দুয়ারের দিকে তাকাতেন। তারপর দরজা দুটো খুলে যেত। নর্তকী নামত, পরনে মসলিনের পেটিকোট ও ওড়না ও সমস্ত দেহ অলঙ্কারে মোড়া, ঠোঁটে উজ্জ্বল হাসি ঠিকরে পড়ত। রাজা সাহেব এগিয়ে আসতেন, বলতেন, 'এস বিবিজান'।'[১১] নিকী নামক বিখ্যাত বাইজীকে তৎকালে (১৮১৯ খ্রী:) কলকাতার এক ধনী ব্যক্তি মাসিক এক হাজার টাকা দক্ষিণা দিয়ে রক্ষিতা-রূপে গ্রহণ করে সমাজে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।[১২]

রাজেন্দ্র মল্লিকের কান-ফোঁটা উপলক্ষে যে জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবানুষ্ঠান হয়েছিল, তার বিবরণ ১৮২৩ সনের ১৫ মার্চ তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, "বাটির বাহিরে যেরূপ আলো দেওয়া হইয়াছিল ভিতরের আড়ম্বর উহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। লাল ভেলভেট পাতা পথের উপর দিয়া ভিতরে যাইবার ব্যবস্থা, চারিদিকে সুবর্ণ খচিত ফুলের মালা ও ফুলে সুসজ্জিত, সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্যে যেন স্বর্গের নন্দন কানন বলিয়া ভ্রম হয়। নর্ত্তকী গায়িকার সংখ্যা অধিক না হইলেও যে

দুইজন নাচিতেছিল তাহারা অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী। নিকীর গান ও রূপের বর্ণনা তাহার সঙ্গিনীর সঙ্গে মানাইয়াছিল। গোলাপের সহিত পদ্মের বর্ণ যেন মিশ্রিত হইয়া অনুপম কপোলে উজ্জ্বলাভা বিকীর্ণ করিতেছে, চক্ষু হইতে আনন্দ উৎস বিস্ফুরিত হইতেছে, অন্যটিকে ইউরোপের রুবিন পক্ষীর মত সুন্দর মনে হয়, তাহারা যেন কন্দর্পের শর লইয়া ক্রীড়া কন্দুক করিতেছিল। যাহা যেরূপ হওয়া উচিৎ উহা সেইরূপই হইয়াছিল। সুনির্বাচিত সম্মিলনীতে সুমিষ্ট সুরা লেহ্য পেয় শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের সহিত নৃত্যাদিতে যথারীতি আদর আপ্যায়নে আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ পরিতুষ্ট, কিছুরই ত্রুটি ছিল না।"[১৩]

এমনকি স্বয়ং রাজা রামমোহনও নিকী বাইজীর নৃত্যগীতাদি উপভোগ করতেন ; তাঁর বাড়িতে এই আধুনিক 'বসন্ত সেনা' বহুবার নৃত্যগীতাদি করেছিল। এঁদের উৎসবানন্দের জলসায় দেশীয় ধনিক ও কোম্পানির শ্বেতাঙ্গ সাহেব-কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করতেন। এঁদের বল্গাহীন আমোদ-প্রমোদের একটি সংযত ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন শ্রীমতী ফ্যানি পার্কস। তিনি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় এসেছিলেন এবং 'একজন ধনিক বাঙ্গালী বাবুর বাড়ী'র উৎসবে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর বিবরণে জানা যায়, "...পাশের একটি বড় ঘরে নানারকমের উপাদেয় সব খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সাজানো ছিল। সবই বাবুর ইউরোপীয় অতিথিদের জন্য বিদেশী পরিবেষক 'মেসার্স গাণ্টার এ্যাণ্ড হুপার' সরবরাহ করেছিলেন। খাদ্যের সঙ্গে বরফ ও মদ্যও ছিল প্রচুর। মণ্ডপের অন্যদিকে বড় একটি হলঘরে সুন্দরী সব পশ্চিমা বাইজীদের নাচগান হচ্ছিল এবং ইউরোপীয় ও এদেশী ভদ্রলোকরা সোফায় হেলান দিয়ে চেয়ারে বসে সুরা-সহযোগে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন।"[১৪]

সেকালের উৎসব-পার্বণের বর্ণনা দিতে গিয়ে তৎকালের পত্রিকায় লেখা হয়েছে, "দুর্গোৎসবের সময় কলকাতার ধনিক হিন্দুরা পরস্পর অমিতব্যয়ের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন এবং তাঁদের কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয় টাকার জেল্লা দেখিয়ে যেন তাঁরা সমাজে মান-মর্যাদা অর্জন করতে চান এবং গণ্যমান্য হতে চান সাধারণ মানুষের মধ্যে। রাজা সুখময় রায়ের পুত্র রাজা কিষণচাঁদ রায় ও তাঁর ভায়েদের গৃহে পুজোর কয়েকদিন নিকী নামে বিখ্যাত বাইজীর নৃত্যগীত পরিবেষিত হবে। পূর্বাঞ্চলের একজন শ্রেষ্ঠ বাইজী বলে নিকীর নামডাক আছে। অতএব শহরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় উৎসব হবে রাজা সুখময় রায়ের গৃহে। নীলমনি মল্লিকের গৃহে নৃত্যগীত হবে বাইজী ঊষারাণীর। সারা হিন্দুস্থানে ঊষারাণীর মতন সুকণ্ঠ গায়িকা আর দ্বিতীয় নেই।"[১৫]

বহুমূল্য ইউরোপীয় আসবাবপত্রে মানিকতলার বাড়িটি সুসজ্জিত করে রাজা রামমোহন কলকাতার জীবনযাত্রা শুরু করেছেন। কিন্তু হঠাৎ রাজাদের মতো তাঁর বিলাস-বৈভবপূর্ণ রাজসিক জীবনযাত্রা। উৎসবে-ভোজে, বাইজী-নাচে ও রক্ষিতা-পোষণে অজস্র অর্থ ব্যয় করার তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য তিনিও

বহন করে চলেছিলেন। 'এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সমসাময়িককালে রাজা রামমোহন রায়ের এক যবনী রক্ষিতা ছিল। উমানন্দন ঠাকুরের এক প্রশ্নের উত্তরে রাজা রামমোহন রায় বলেছিলেন যে, ওরূপ যবনী রক্ষিতা শৈবমতে বিবাহিতা স্ত্রীর সামিল।'[১৬]

শ্রীমতী ফ্যানি পার্কস রামমোহনের বাড়িতে আয়োজিত ভোজসভায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। এই ভোজসভার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, "বেশ বড় চৌহদ্দীর মধ্যে তাঁর বাড়ী, ভোজের দিন নানা বর্ণের আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল। চমৎকার আতসবাজীর খেলাও হয়েছিল সেদিন। আলোয় আলোকিত হয়েছিল তাঁর বাড়ী। বাড়ীতে বড় বড় ঘর ছিল এবং একাধিক ঘরে বাইজী ও নর্তকীদের নাচগান হচ্ছিল। বাইজীদের পরনে ছিল ঘাঘরা, শাদা ও রঙ্গীন মসলিনের ফ্রিল দেওয়া, তার উপর সোনারূপোর জরির কাজ করা। সাটিনের ঢিলে পায়-জামা দিয়ে পা পর্যন্ত ঢাকা। দেখতে অপূর্ব সুন্দরী, পোষাকে ও আলোয় আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। গায়েতে অলঙ্কারও ছিল নানারকমের। তারা নাচছিল দলবেঁধে বৃত্তাকারে, পায়ের নূপুরের ঝুমঝুম শব্দের তালে তালে।...নর্তকীদের সঙ্গে একদল বাজিয়ে ছিল, সারেঙ্গী মৃদঙ্গ, তবলা ইত্যাদি নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিল তারা।...বাইজীদের মধ্যে একজনের নাম নিকী, শুনেছি সারা প্রাচ্যের বাইজীদের মহারাণী সে, এবং তার নাচগান শুনতে পাওয়া রীতিমত ভাগ্যের কথা। বাইজীদেয় নাচগান শোনার পর রাতের খাওয়া-দাওয়াও শেষ হল। তারপর এদেশের ভেলকিবাজ জাগলারদের অদ্ভুত সব ক্রীড়াকৌশল আরম্ভ হল। কেউ তলোয়ার লুফ্‌তে লুফ্‌তে হাঁ করে সেই ধারালো অস্ত্রটা গিলে ফেললে, কেউ-বা অনর্গল ধারায় আগুন ও ধোঁয়া বার করতে লাগল নাকমুখ দিয়ে। একজন শুধু ডান পায়ের উপর দাঁড়িয়ে পিছন দিক দিয়ে বাঁ পা তুলে ধরল কাঁধের উপর। এই ধরনের কৌশল দেখে নকল করার চেষ্টা করাও বিপজ্জনক। বাড়ীর ভিতর সুন্দর ও মূল্যবান আসবাবপত্র সাজানো এবং সবই ইউরোপীয় স্টাইলে, কেবল বাড়ীর মালিক হলেন বাঙ্গালীবাবু (রামমোহন রায়)।"[১৭]

রাজা রামমোহনের অন্তরঙ্গ সুহৃদ প্রিন্স দ্বারকানাথও নিকৃষ্ট আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করতেন। ১৮২৩ সালে তাঁর নতুন বাড়িতে গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে অনেক কৌতুকাবহ ভাঁড়ামির অভিনয় হয়েছিল। 'সমাচার দর্পণ'-এর সংবাদে (২০.১২.১৮২৩খ্রী:) প্রকাশ: "মোং কলিকাতা ১১ দিসেম্বর ২৭ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতি-বার সন্ধ্যার পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীন বাটীতে অনেক২ ভাগ্যবান সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংগ্লণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে একজন গো বেশ ধারণ-পূর্ব্বক ঘাস চর্ব্বণাদি করিল।"[১৮]

দেশীয় জমিদার-দেওয়ান-বেনিয়ান ও ইউরোপীয় বণিক-কর্মচারীদের আনন্দ-দানের জন্য প্রিন্স দ্বারকানাথের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ির অনুষ্ঠানে আতসবাজী ও আলোর বিচিত্র খেলায়, আমোদ-প্রমোদের বিলাসে লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। গভর্নর-জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগ্নী মিস ইডেনের সম্মানে যে-বিরাট উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন এই বাগানবাড়িতে করা হয়েছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, "যখন এখানে গবর্নর জেনারেল লর্ড অকলণ্ড ছিলেন, তখন আমাদের বেলগাছিয়ার বাগানে অসামান্য সমারোহে গবর্নর জেনারেলের ভগিনী মিস ইডেন প্রভৃতি অতি প্রধান প্রধান বিবি ও সাহেবদিগের এক ভোজ হয়। রূপে, গুণে, পদে, সৌন্দর্য্যে, নৃত্যে, মদ্যে, আলোকে বাগান একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল।"[১৯]

দ্বারকানাথের জীবনীকার কিশোরীচাঁদ মিত্র বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "এখানেই তাঁর আতিথেয়তা রাজকীয় আড়ম্বরে প্রকাশিত হয়েছিল। এবাড়ির প্রশস্ত উদ্যানের মধ্যে এঁকে বেঁকে প্রসারিত মতিঝিল ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়। মতিঝিলটি ঝলমল করত হিন্দু কবির অতি প্রিয় নীলপদ্ম ও অন্যান্য হরেকরকম সুন্দর সুন্দর ফুলের ঐশ্বর্য্যে। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে চতুর্দিক প্রসারিত প্রাঙ্গনে যেন পিটুনিয়া, পিঙ্ক, ফ্লক্স্, সার্ক্স্পার্স, গোলাপ, জিনিয়া প্রভৃতি ফুলের আগুন লাগত। এ বাড়ির সুপ্রশস্ত বৈঠকখানা এমন রীতিতে সজ্জিত হয়েছিল যা সে-যুগে দুর্লভ। ভিলার শিল্পশালার দেওয়ালগুলো ছিল আধুনিক শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনে অলঙ্কৃত; এর কারণস্বরূপ বলা যায় এর মালিক ছিলেন চিত্র এবং ভাস্কর্য্যের উৎকর্ষ বিচারে যথার্থ অভিজ্ঞ। বৈঠকখানার পিছনে ঝকমক করত মার্বেল পাথরে বাঁধানো ফোয়ারা, তার উপরে ছিল কিউপিডের একটি মূর্তি। মতিঝিলের মাঝখানে ছিল একটি দ্বীপ, দ্বীপের উপর একটি গ্রীষ্মাবাস। একটি ঝোলানো লোহার সেতু ও একটি হালকা কাঠের সেতুর সাহায্যে গ্রীষ্মাবাসটি মূল বাগানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এ গ্রীষ্মাবাস ছিল আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র। পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত হলেও বেলগাছিয়া ভিলাকে বলা চলত কলকাতার ওয়েস্ট এণ্ড বা কেনসিংটন। এখানে দ্বারকানাথ অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন। বলতে-কী, বেলগাছিয়া ভিলার উৎসবগুলোর মত বিলাসবহুল ও জমকালো উৎসব সে যুগে খুব কমই হত। অভ্যাগতদের জন্য যে-রান্না হত তার প্রণালী ছিল অতুলনীয়। আভিজাত্যে ও শ্রেণীমর্যাদায় অতিথিরাও হতেন অনন্য। খাদ্য-তালিকায় থাকত ফরাসী ও প্রাচ্য দেশীয় খাদ্যের অফুরন্ত বৈচিত্র্য। তাদের মধ্যে অবশ্য সবচাইতে কদর ছিল কাবাব, পোলাও এবং হোসেনীর। মদ আমদানি করা হত সোজা য়ুরোপ থেকে। আর দ্রাক্ষা মদিরার মধ্যে সেগুলো ছিল সেরা জাতের।...

"কাউন্সিলের সদস্যরা এবং সুপ্রিম কোর্টের জজরাও দ্বারকানাথের আতিথ্য

গ্রহণ করতেন। আর আসতেন বিভাগীয় জেনারেলগণ আর পরগণার জমিদাররা। এধরনের ভোজসভায় পুরনো সিভিলিয়ানরা এবং ভোগক্লান্ত সামরিক কর্মচারীরা তরুণ সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করতেন। ··· বেলগাছিয়া ভিলাই ছিল সেযুগের একমাত্র ব্যক্তিগত বাগান-বাড়ি বা একমাত্র স্থান যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর য়ুরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকেরা মিলিত হতেন, মেলামেশা করতেন স্বচ্ছন্দ অন্তরঙ্গতায়।···

"সে যুগে সমাজের নেতৃস্থানীয়া মহামাননীয়া মিস্ ইডেনের উদ্দেশ্যে দ্বারকানাথ এখানে একটি নৈশ ভোজ এবং নৃত্যোৎসবের আয়োজন করেন। এ উৎসবটি ছিল উৎসবকর্তা এবং অভ্যাগত উভয়ের পক্ষেই পরিতৃপ্তিদায়ক। এ উৎসব উপলক্ষে কক্ষগুলো করা হয়েছিল আলোকোদ্ভাসিত, দর্পণের প্রতিবিম্বে উজ্জ্বল। মির্জাপুর কার্পেট ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল কক্ষে কক্ষে, বুটিদার রক্তিমাভ কাপড় এবং সবুজ সিল্কের সমারোহে কক্ষগুলোর উৎসব-সজ্জিত রূপ ছিল অনিন্দ্য। টেবিলগুলোর ওপরের আচ্ছাদন ছিল শ্বেত পাথরের। তাতে শোভা পাচ্ছিল বর্ণবৈচিত্র্যময় পুষ্পস্তবক। দুষ্প্রাপ্য বহু অর্কিড, বিচিত্রভাবে শোভিত ছোট ছোট ঝোপ ও লতাপাতা দিয়ে সাজানো হয়েছিল সিঁড়ি, বারান্দা, বৈঠকখানা এবং কেন্দ্রস্থিত প্রশস্ত হলঘর। গ্রীষ্মাবাস এবং ঝুলন্ত সেতুটিকে সজ্জিত করা হয়েছিল লতাপাতা, পুষ্প, দেওদার পাতা ও বহু বর্ণ-বিচিত্র পতাকা দিয়ে। প্রাঙ্গন এবং জলসরবরাহের কেন্দ্রটিকে আলোকোজ্জ্বল করা হয়েছিল হাজার হাজার অলঙ্কৃত বাতি দিয়ে। সেকালের জনৈক লেখক উৎসব-স্থানটির বর্ণনা করেছেন ইন্দ্রপুরীর দৃশ্য বলে। হলঘরটি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল মধুর সঙ্গীতে, বহু রাত্রি পর্যন্ত উৎসবের নৃত্য চলেছিল সমানভাবে। সেদিনের রাত্রির মত এত চমৎকার বাজি পোড়ানো ভিলায় আর দেখা যায় নি। কলকাতার সমস্ত অভিজাত সম্প্রদায় উপস্থিত ছিলেন সে-রাত্রির উৎসবে। অভূতপূর্ব আড়ম্বরের মধ্যে সে-রজনীর উৎসব সমাপ্ত হয়েছিল।"[২০]

তৎকালে প্রচলিত একটি ব্যঙ্গাত্মক ছড়ার মধ্যেও বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে আয়োজিত আমোদ-অনুষ্ঠানের খ্যাতির পরিচয় পাওয়া যায়:

"বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুঁরি কাঁটার ঝন্‌ঝনি,
খানা খাওয়ার কত মজা, আমরা তার কি জানি?
জানেন ঠাকুর কোম্পানী।"[২১]

১৮৫৬ সনে এই বাগানবাড়ি বিক্রি হয়ে যাওয়ায় 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকা দুঃখপ্রকাশ করে লিখেছে (২৩. ৯. ১৮৫৬ খ্রী:; ৭১ সংখ্যা), "হা যে উপবন প্রস্তুত করণে দ্বারকানাথ বাবু দুই লক্ষ টাকার অধিক ধন বিসর্জ্জন করিয়া ছিলেন এবং যে কাননে এক২ রজনীতে ইংরাজাদি ভোজনে দশ বিশ সহস্র উড়িয়া গিয়াছিল, গত শনিবারে সেই বাগান বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।"[২২]

উৎসবে-বিলাসিতায় নয়া ভূস্বামীশ্রেণীর অপরিমিত অর্থ-ব্যয় লক্ষ্য করে

একথা বলা যায়, 'এই নতুন জমিদার বা অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় এসবই ছিলো একটা প্রক্রিয়া বিশেষ। প্রথমত, পুরাতন আভিজাত্যের ধ্বংসের উপর স্থাপিত হয়েছে এক নতুন আভিজাত্য। যে সব নতুন জমিদার হয়েছে তারা সহজে সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি। কয়েকযুগ ধরে তারা সমাজে পরিগণিত ছিল লাটদার, নিলামদার হিসেবে, জমিদার হিসেবে নয়। সামাজিক স্বীকৃতি-লাভের জন্য নব্য জমিদারের কয়েক যুগ ধরে প্রচুর দান-খয়রাত ও ব্রাহ্মণ-ভোজন করাতে হয়েছে, ঘাট, মন্দির-মসজিদ নির্মাণ করতে হয়েছে, বিয়ে-শাদী, শ্রাদ্ধ, পূজা-পার্বণে ঢের খরচ করতে হয়েছে।"[২৩]

আমোদ-উৎসবে টাকা ওড়ানোর প্রতিযোগিতায় ইংরেজ-নবাবরা দেশীয় বাবু-নবাবদের তুলনায় পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁরাও উৎসব উপলক্ষে নাচগানের আসর বসাতেন এবং লক্ষ টাকার আতশবাজীর খেলা দেখানো হত। ১৮০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আতশবাজীর খেলার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায়—"আতশবাজীতে হাতির লড়াই দেখানো হল আকাশে। উপরে বাজি ফাটল, তার ভিতর থেকে আগুনের মালায় দুটি হাতি বেরিয়ে এল এবং লড়াই করল। আগুনের একটি আগ্নেয়গিরি থেকে কিছুক্ষণ ধরে আকাশে রংবেরংয়ের রকেট উদ্গীরিত হতে থাকল। আবার একটি বাজি ফাটল আকাশে এবং তার ভিতর থেকে আগুনের রেখায় আঁকা দুটি মন্দির ভেসে উঠল চোখের সামনে, ভারতের দেবদেউল। মন্দিরের পাশে একটি বাজির ঝর্ণা থেকে অজস্র ধারায় আগুনের বিন্দু ঝরতে থাকল এবং বিন্দুগুলি নীল রঙের। অবশেষে সূর্য-চন্দ্র-তারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বাজির আকাশে এবং তার ভিতর থেকে একটি বৃত্তাকার আগুনের ভূমণ্ডল ঘুরতে ঘুরতে ছিটকে বেরিয়ে এল এবং তার ভিতর থেকে আবার অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত হতে থাকল। আশ্চর্য হল, আগুনের মধ্যে ফার্সি হরফে লেখা : কল্যাণ হোক সকলের।"[২৪]

জীবিকা-নির্বাহের জন্য রাজা রামমোহনের অর্থোপার্জনও সর্বাংশে সুস্থ ও নিষ্কলঙ্ক ছিল না বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিশোরীচাঁদ মিত্রের মতো সেকালের বিশ্বাসযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রচলিত জনরবের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেতে বলেছেন যে, সেকালের অন্যান্য বাঙ্গালী দেওয়ানের মতো রাজা রামমোহনও সরকারি কর্মে লিপ্ত থাকাকালীন উৎকোচ গ্রহণ করে আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন, "দেওয়ান হিসাবে কাজ করে তিনি এত টাকা উপার্জন করেছিলেন, যাতে 'বছরে দশ হাজার টাকা' আয়ের জমিদার হতে পেরেছিলেন। একথা সত্য হলে এই অসাধারণ মানুষটির নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ জাগে।"[২৫]

এ-সম্পর্কে কে. এস. ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, "দেওয়ান হিসাবে দশবছরের চাকরি-জীবনে তিনি এত টাকা সঞ্চয় করেছিলেন, যা দিয়ে তিনি বার্ষিক ১০০০ পাউণ্ড অথবা মাসিক ১০০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি কিনেছিলেন।

এই ঘটনা তাঁর খ্যাতি-বৃদ্ধির সহায়ক হয়নি। তাছাড়া সলোমনের মতো না হয়ে ধন-উপার্জন ও সম্পদ-রক্ষা করাকে জীবনের লক্ষ্য বলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন, এমনকি সেটাকে জ্ঞানের কাছে দ্বিতীয় স্থান পর্যন্ত দেননি।"[২৬]

একালে ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন, "এসব পদে অধিষ্ঠিত থাকার কালে সে সময়কার বল্গাহীন স্বর্ণ-মৃগয়ার দিনে, বেশ কিছু উপরি পাওনার ব্যবস্থাও সমগ্র আর্থনীতিক কাঠামোতে জড়িয়ে ছিল। অন্যান্যদের মত তিনিও যদি এর সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন তো বিস্ময়ের কারণ নেই। ...এ সব সাক্ষ্য থেকে সামগ্রিক যে চিত্রটি স্পষ্ট হয় তা হলো, কলকাতায় বুদ্ধিমার্গীয় আলোড়নে জড়িয়ে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত, এবং সম্ভবত তারপরেও, তিনি ছিলেন বিত্তের সন্ধানে ধাবমান এক ব্যক্তি, যিনি অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে নৈতিক প্রশ্নটিকে বিশেষ গুরুত্ব দান করার প্রয়োজন বোধ করেননি।"[২৭] কারণ নয়া ভূস্বামীশ্রেণীর কাছে অর্থ ছিল পরমার্থ-স্বরূপ। তাই তাঁরা ন্যায়-নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে বিত্তশালী হয়েছেন। শ্বেতকায় প্রভুদের 'সাহচর্যে, সান্নিধ্যে ও দৃষ্টান্তে জন্মের সেই পরম লগ্নেই কলকাতার অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির মানুষ এক অসুস্থ খেলায় মেতেছিল। তাতে স্বার্থবুদ্ধিই একমাত্র বুদ্ধি, দুর্নীতিই একমাত্র নীতি, ষড়যন্ত্রের চাপা ফিসফিসানিই একমাত্র আলাপের ভাষা।'[২৮]

উপরের বিষয়গুলি মনে রেখে রাজা রামমোহনের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে আলোচনা করলে তাঁর মূল্যায়ন যথার্থ ও ইতিহাস-সম্মত হবে। কারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা ও চরিত্র তাঁর মতামত ও কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে।

পোষাক-পরিচ্ছদ, জীবনযাত্রা ও জীবিকা-নির্বাহ বিষয়ে শহরের অন্যান্য ধনিক বাবুদের সঙ্গে রাজা রামমোহনের কোনো প্রভেদ ছিল না। তিনি এঁদের মতো পোষাক-পরিচ্ছদ, এঁদের মতো জীবনযাত্রা এবং এঁদের মতো কোম্পানির কাগজ, ভূসম্পত্তি ও নানারকম আয়ের (জ্ঞাত ও অজ্ঞাত) উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তবে রামমোহন শিক্ষাদীক্ষায় এঁদের চেয়ে অনেক উন্নত ছিলেন। দেওয়ানি-লাভের পূর্বে তিনি আরবি-ফারসি ও সংস্কৃত শাস্ত্র গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। জন ডিগবির দেওয়ান-রূপে রংপুরে থাকাকালে রামমোহন ইউরোপীয় ইতিহাস-বিজ্ঞান-দর্শনের বহু গ্রন্থ পাঠ করেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। বেন্থাম, হিউম, রিকার্ডো, জেমস মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ সেকালের শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় বুর্জোয়া চিন্তাশীলদের রচনাবলী-পাঠে তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। কলকাতায় ও ইংলণ্ডে বসবাসকালে রাজা রামমোহনের বিভিন্ন কর্মপ্রয়াসের মধ্যে তাঁদের প্রভাব অনুভূত হলেও তা সামন্ত-স্বার্থের জন্য খণ্ডিত ও পরস্পর-বিরোধী ছিল।

৫

উনিশ শতকের 'রেনেসাঁস'

কলকাতা শহরে বসবাসের সুযোগে নয়া জমিদার-মধ্যশ্রেণী একদিকে যেমন ইংরেজ বণিক-শাসকদের স্নেহাশীর্বাদে সমাজের উপর অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের দ্বারা হিন্দু-সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হন, অন্যদিকে তেমনি তাঁরা সামাজিক-নেতৃত্ব লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তাঁরা নয়া জমিদার-রূপে আবির্ভূত হলেও এবং অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করলেও সমাজনেতা-রূপে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেননি। 'ধর্মাশ্রিত সমাজ-জীবনের কেন্দ্র ছিল নবাব আমলে জমিদাররা, এঁরা প্রাচীন সংস্কারকে মূল্যবান বলে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। ফলে ধর্ম, সমাজ ও জীবন প্রাচীন জীবনের প্রভাবেই চলত। নতুন যাঁরা তাঁদের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হলেন তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জোরদার হলেও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় কমদর। বহুদিন পর্যন্ত সমাজে এই কমদর বিত্তবান জমিদারকুলের প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ দেখা যায়।'[১] প্রখ্যাত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী মোহিত মৈত্র বলেছেন, "নবোদ্ভূত অভিজাত-শ্রেণী রামমোহনের নেতৃত্বে সমস্ত জমিদারি এবং অন্যান্য ভূসম্পত্তি ক্রয় করলেন ও কোম্পানির ছত্রছায়ায় তাঁদের সমস্ত অর্থ বিনিয়োগ করলেন। এভাবে তাঁরা নতুন জমিদার হয়ে উঠলেন, কিন্তু তাঁদের অধি-কাংশই সমাজ-নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন না।"[২]

তাই 'জনগণের নেতা' হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে তাঁরা বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে কিছু রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করতে চান। রাজা রামমোহন বলেছেন, "অন্ততপক্ষে রাজনৈতিক সুযোগ ও সামাজিক সুবিধা পাওয়ার জন্য তাঁদের ধর্মের কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।"[৩]

অর্থাৎ, ডিরোজিও-বিদ্যাসাগরের মতো মানবতাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়, কিংবা জাতীয় স্বার্থে অথবা কোনো উচ্চতর মতাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নয়, কেবলমাত্র নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য রাজা রামমোহন উনিশ শতকে হিন্দুদের সমাজনেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সংস্কার-আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সামাজিক নেতৃত্ব-লাভের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সর্বব্যাপী প্রভুত্ব। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সৃষ্ট অসংখ্য শাস্ত্রীয় বন্ধন ও বিধি-নিষেধের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নেতৃত্ব-প্রতিষ্ঠাকামী নতুন শিক্ষিত ভূস্বামী-গোষ্ঠী সংস্কার-আন্দোলন আরম্ভ করেন।[৪]

'লক্ষ লক্ষ কৃষকের লুণ্ঠিত সম্পদে ধনবান এই ভূস্বামীশ্রেণীই শহরে নিয়ে এল সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। তাঁদের মুখপাত্র ছিলেন 'রাজা' রামমোহন রায়।'[৫] তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয়সভা'র (১৮১৫ খ্রী:) সভ্যদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নয়া জমিদারশ্রেণীভুক্ত। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র গোপীমোহন ঠাকুর, তাঁর পুত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদা-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকীর জমিদার কালীনাথ রায়, রাজা পীতাম্বর মিত্রের পুত্র বৃন্দাবন মিত্র, খিদিরপুরের ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাজা বদনচন্দ্র রায়, আন্দুলের জমিদার রাজা কাশীনাথ মল্লিক, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, নন্দকিশোর বসু, গোপীনাথ মুন্সী প্রমুখ। ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সমাজের বিভিন্ন কুপ্রথা-কুআচারের অবসানের জন্য এবং ইংরেজিভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন-কল্পে রাজার নেতৃত্বে তাঁরা ধর্ম ও সমাজ সংস্কার-আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়ায় কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নগর-জীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

এইভাবে শহরবাসী ভূস্বামীশ্রেণীর একটি অংশ নিজেদের সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে বাংলাদেশের তথাকথিত 'রেনেসাঁস' বা 'নবজাগৃতি' আন্দোলন আরম্ভ করেন। কিন্তু 'যে-শ্রেণীর লোক এ-থেকে লাভবান হয়েছিল, তারাই আদর করে এর নাম দিয়েছিল 'রেনেসাঁস'। যে-শ্রেণীর মধ্যে এই জাগরণ দেখা দিয়েছিল, তারই অনপনেয় ছাপ ছিল এই তথাকথিত 'রেনেসাঁসে'। এই জাগরণ এসেছিল প্রধানত শহরে এবং বেণ্টিঙ্ক যাদের 'পরজীবী' (Parasite) বলে অভিহিত করেছেন, সেই ভূস্বামীশ্রেণীর মধ্যেই তা ছিল সীমাবদ্ধ। এই মুৎসুদ্দী-জমিদারগোষ্ঠীর অন্তরের কামনা ছিল গ্রাম থেকে দূরবর্তী শহরে বসে শাসকগোষ্ঠীর গৌণ অংশীদার হওয়া। এটাই ছিল 'রেনেসাঁসের' উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যটি পরিণতি লাভ করেছিল শাসক-গোষ্ঠীর সঙ্গে উক্ত পরজীবী জমিদারশ্রেণী ও ইংরেজ-বণিকগণের মুৎসুদ্দীদের মৈত্রীর ভিতর দিয়ে। এই 'রেনেসাঁস' আন্দোলন দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে আদৌ স্পর্শ বা প্রভাবান্বিত করতে পারেনি।'[৬]

কিন্তু ইউরোপের অনুকরণে বাংলাদেশের এই সংস্কার-আন্দোলনের নাম

'রেনেসাঁস' রাখা হলেও ইউরোপের 'রেনেসাঁস' ছিল সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে শিল্প-বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বৈপ্লবিক আন্দোলন —সামন্ত-কাঠামোর পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক-কাঠামো প্রবর্তন। এই বৈপ্লবিক সংগ্রাম শহরে সীমাবদ্ধ থাকেনি —গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে সে-দেশে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার অবসান ঘটেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের 'রেনেসাঁস' আন্দোলন সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়নি এবং তার নেতৃত্বে বণিক ও শিল্প-বুর্জোয়া ছিলেন না। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সমাজ-নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইংরেজ-শাসকদের কাছ থেকে নয়া ভূস্বামীগোষ্ঠীর জন্য কিছু রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করে 'শাসকগোষ্ঠীর গৌণ অংশীদার হওয়া'। তাই বাংলার 'রেনেসাঁস' ছিল জমিদার-মধ্যশ্রেণীর আত্মসংহতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

তাসত্ত্বেও আবেগে আপ্লুত হয়ে গঙ্গাবক্ষে সত্যকে বিসর্জন দিতে দ্বিধান্বিত হননি বাংলাদেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে একদল দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী বুদ্ধিজীবী তথ্যানুগত্য বিস্মৃত হয়ে কল্পনার রঙে অতীতকে রাঙিয়ে উনিশ শতকের শহরকেন্দ্রিক সংস্কার-আন্দোলনের মধ্যে ইউরোপের 'রেনেসাঁস'-এর সাদৃশ্য দেখেছেন। তাই উভয় শিবিরের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ এই আন্দোলনকে 'নবজাগরণ' অভিধায় ভূষিত করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, "১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতিবর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকলদিগেই নবযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল।"[৭] কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন, "উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে ব্যাপক জাগরণ ঘটে তার কথা ভাবতে গিয়ে স্বতঃই মনে পড়ে ইউরোপের সুবিখ্যাত রেনেসাঁসের কথা।...উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে জাগরণ ঘটে, তাও এমনি একটা রেনেসাঁস; তার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।"[৮] যোগেশচন্দ্র বাগল মন্তব্য করেছেন, "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতবাসী প্রথম ঘনিষ্ঠভাবে ইংরেজের সংস্পর্শে আসে। এই সময়েই ভারতবর্ষে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা হয়।"[৯] সুশীলকুমার গুপ্ত বলেছেন, "ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়াই বাঙ্গালী পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিবিড় সংস্পর্শে আসিলে তাহার জীবনে প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হয়। ক্রমে সেই আলোড়ন ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নূতন জাগরণ আনে।... ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ভাব ও চিন্তাধারার ইতিহাস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাঙ্গালার নবজাগরণের প্রাণস্পন্দন এই সময় বিশেষ করিয়া অনুভূত হইয়াছিল।"[১০] অথচ জার্মান সমাজবিজ্ঞানী আলফ্রেদ ভন্ মার্টিনের মতে "মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের সংস্কৃতি ও সমাজের বিচ্ছেদ হল রেনেসাঁসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এটা হল আধুনিক যুগের প্রাথমিক স্তর।"[১১] কিন্তু বাংলা-দেশে তা ঘটেনি। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে ফেলে ধনতান্ত্রিক

কাঠামো গড়ে তোলার কোনো প্রচেষ্টা না হওয়ায় সমাজ-সংস্কার আন্দোলন হলেও বাংলার গ্রামগুলি রইল ঘুমিয়ে—মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনায়, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে রইল, চণ্ডীমণ্ডপাশ্রিত দেবকেন্দ্রিক সাহিত্য তার ইহলোকের পাথেয়। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ রইল, আধুনিক যুগে অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক যুগে তার উত্তরণ ঘটল না।

প্রবীণ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ এই সময়কার কর্মপ্রচেষ্টাকে 'নবজাগরণ' বলে চিহ্নিত করে আলোচনা করেছেন।[১২] দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী নরহরি কবিরাজের মতে "এশিয়ার দেশগুলিতে সর্বপ্রথম ভারতেই (তারপরে চীনে) বুর্জোয়া জাগরণের সূচনা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকে (১৮১৭) এই দিক থেকে এশিয়ার ইতিহাসে একটি দিকচিহ্ন বলা চলে।...উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার জাগরণকে বুর্জোয়া জাগরণের প্রারম্ভিক পর্ব বলা চলে।"[১৩] তাই শ্রী কবিরাজের সিদ্ধান্ত—"১৮১৭ থেকে ১৮৫৭—এই কালপর্বে বাঙলার জাগরণে প্রধান পুরুষ ছিলেন রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গল দলের নেতৃবৃন্দ।"[১৪]

নরহরি কবিরাজ নবজাগরণ-তত্ত্বকে অত্যুৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করতে গিয়ে এই তত্ত্ববিরোধী বামপন্থী সমালোচকদের নানাবিধ রাজনৈতিক বিশেষণে ভূষিত করেছেন—"মার্কসবাদের নামে শপথ গ্রহণ করে একদল 'বামপন্থী' গবেষকও এঁদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। ট্রট্স্কীপন্থী, নয়া ট্রট্স্কীপন্থী, মাওপন্থী, নয়া বাম (New Left) পন্থায় বিশ্বাসী প্রভৃতি নানা রঙের 'মার্কসবাদী'রা নানা অতি-বিপ্লবী যুক্তির অবতারণা করে শেষ পর্যন্ত বাঙলার জাগরণের ভূমিকাটি নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছেন।"[১৫] কিন্তু কবিরাজ মহাশয় ভুলে গেছেন যে, বিরোধী সমালোচকদের গালমন্দ করলেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না, বরং তাতে যুক্তির দুর্বলতা ও অতি সরলীকরণের ঝোঁকই প্রকটিত হয়। এই সত্য বিস্মৃত হয়ে তিনি মার্কস-এঙ্গেলসের নামাবলী ধারণ করেছেন এবং তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি মার্কস-এঙ্গেলসের বহু রচনাংশ উদ্ধৃত করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। কারণ এই উদ্ধৃতিগুলি বিরোধী সমালোচকদের বক্তব্যকেই সমর্থন করে।

রেনেসাঁস বা নবজাগরণের জন্মভূমি হল ইউরোপ ভূখণ্ডের উত্তর ইতালিতে, বিশেষত ভেনিস ও ফ্লোরেন্স শহরে। 'যন্ত্রযুগের শৈশবকালের মূল যান্ত্রিক আবিষ্কারগুলির সমাবেশ ও প্রভাব চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালিতে, বিশেষ করে ফ্লোরেন্সে, যেরকম দেখা যায়, ইউরোপের আর কোথাও সেরকম দেখা যায় না। আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগ তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এইখানেই ভূমিষ্ঠ হয় বলা চলে। তাই ইউরোপের রেনেসাঁস বা নবজাগৃতির সূচনা হয় ইতালিতে। কিন্তু ইতালির যান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি যখন বন্ধ হয়ে গেল, তার আর্থিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্যও তখন আর বজায় রইল না। ইতালি থেকে জার্মানি, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে অর্থনৈতিক কেন্দ্র স্থানান্তরিত হল। ইতালির অর্থনৈতিক পশ্চাদ্গতি

শুরু হয়েছিল, তাই সাংস্কৃতিক অবনতির পিচ্ছিল পথে প্রতিক্রিয়াশীলতার অন্ধকারে ইতালি আবার ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু ইউরোপের নবজাগৃতিকেন্দ্র ইতালি অবনতিকেন্দ্রে পরিণত হলেও ইউরোপের জাগৃতিজোয়ারে ভাঁটা পড়েনি। কারণ ধনতন্ত্রের বিকাশ ইতালিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি এবং সেখানেই শেষ হয়ে যায়নি। যন্ত্র ও বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি হয়েছে, ধনতন্ত্রের বিকাশের পথও প্রশস্ততর হয়েছে। উদ্‌যোগ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বাধীনচিন্তা সংস্কারমুক্তি স্বাধিকার ও গণতন্ত্রের আদর্শ, ধনতন্ত্র ও যন্ত্রযুগের শৈশবকালের নবজাগৃতির মূলমন্ত্র আরও প্রচণ্ডবেগে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে, ইউরোপ এবং সারা পৃথিবীর বুক আলোড়িত করেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অচল অটল ভিত্তিকে চূর্ণ করে, সনাতন শাশ্বত ধর্ম, নীতি ও আদর্শের গম্বুজ ধূলিসাৎ করে নবযুগের অভ্যুদয় বৈপ্লবিক।'[১৬]

এই রেনেসাঁস আন্দোলন নানা নামে ইউরোপের বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। সামন্ততন্ত্রের গর্ভেই তার জন্ম এবং সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করেই ইউরোপে নবযুগ এসেছিল। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে রিফর্মেশন, এন্‌লাইটেন্‌মেণ্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জয়যুক্ত হয় —সামন্তশক্তির বিরুদ্ধে বণিক-শক্তির সংগ্রাম সফল হয়, যন্ত্রশিল্পের বিকাশ ঘটে। বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারাই ছিলেন এই সংগ্রামের চালিকাশক্তি। বাণিজ্য থেকেই তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটেছিল এবং রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটানোর শক্তি তাঁরা অর্জন করেছিলেন। বাণিজ্যের মাধ্যমে লব্ধ অর্থ তাঁরা শিল্পে বিনিয়োগ করে শিল্পপতি হয়েছেন। যন্ত্রশিল্প বিকাশে ভূমি-স্বার্থ প্রধান প্রতিবন্ধক বলে সামন্তশক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তাই মানবজাতির বিকাশের ইতিহাসে ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব ছিল এক মহৎ বিপ্লব এবং তাতে নবোদ্ভূত শিল্পপতিদের ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল। 'কিন্তু সে তো অবজেকটিভ বিশ্লেষণে। ব্যক্তি নিরপেক্ষ, উদ্দেশ-নিরপেক্ষ বিচারে। বুর্জোয়া-বিপ্লবে বুর্জোয়ার নিজের উদ্দেশ্য কি ছিল? সে কি সচেতনভাবে ইতিহাসকে এগিয়ে নেয়ার জন্য একদিন প্রাভাতিক সূর্য-কিরণে লড়াই শুরু করে দিয়েছিল? সে কি শ্রমিক-কৃষক-জনতার দুঃখদুর্দশা মোচন করার সক্রিয় সদিচ্ছা নিয়ে ক্ষমতার লড়াই আরম্ভ করল?'[১৭] না, সে-ধরনের কোনো সদিচ্ছা তাঁদের ছিল না। তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপে এক নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী ধন-ক্ষুধার প্রকাশ ঘটেছিল। তাঁদের লেলিহান মুনাফার লোভ কৃষককে সর্বস্বান্ত করেছিল। বিপ্লবী নয়া বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল লুণ্ঠক, উৎপীড়ক। তাঁরা লক্ষ লক্ষ কৃষককে পথের ভিখিরিতে পরিণত করেছিলেন। তাঁদের কেবলমাত্র লক্ষ্য ছিল অর্থ আহরণ, অর্থ সঞ্চয় ও শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ।

নবোদ্ভূত বুর্জোয়াশ্রেণীর লুণ্ঠনের ভয়াবহ ইতিহাস, প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের ভয়ঙ্কর চিত্র লিপিবদ্ধ রয়েছে কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডে। মার্কস বুর্জোয়াশ্রেণীর শোষণ-লুণ্ঠনের পরোক্ষ ইতিবাচক ফল হিসাবে তাঁদের প্রগতিশীল ভূমিকা উল্লেখ করলেও অষ্টম খণ্ডের প্রতিটি পৃষ্ঠায় তাঁদের প্রত্যক্ষ

ধ্বংসকার্য বর্ণনা করেছেন। মার্কস বারবার বলেছেন—এ হচ্ছে সম্পূর্ণ পরোক্ষ ফল। বুর্জোয়াশ্রেণীর বিপ্লব-সাধনের কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না; তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল লুঠতরাজ করে মুনাফা কামানো। মার্কস লিখেছেন, "প্রাথমিক পুঁজি-সঞ্চয়ের ইতিহাসে পুঁজিপতি শ্রেণীগঠনের যন্ত্র হিসেবে কাজ করছে এমন প্রত্যেকটি বিপ্লবই হচ্ছে যুগান্তকারী। কিন্তু সবচেয়ে যুগান্তকারী হল সেইসব মুহূর্ত যখন বিশাল মানবগোষ্ঠীকে তাঁদের জীবনধারণের উপায় থেকে অকস্মাৎ সবলে বঞ্চিত করে, বন্ধনমুক্ত ও 'সংযোগহীন' সর্বহারায় পরিণত করে শ্রমের বাজারে নিক্ষেপ করা হয়। কৃষি-উৎপাদককে, কৃষককে তাঁর জমি থেকে বেদখল করাই হচ্ছে এই পুরো প্রক্রিয়ার ভিত্তি। এই লুণ্ঠনের ইতিহাস নানা দেশে নানা চেহারা নেয়; নানা স্তর অতিক্রান্ত হয় ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ক্রমে এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগে।"[১৮]

প্রাথমিক পুঁজি-সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে মার্কস আরো বলেছেন, "সেই ঐতিহাসিক অগ্রগতি যার ফলে উৎপাদক হঠাৎ মজুরি-শ্রমিকে পরিণত হয়, তার একটা দিক এই যে, সেটা ভূমিদাসত্ব ও গিল্ডের শৃঙ্খল থেকে জনতার মুক্তির উপায় হিসাবে প্রতিভাত হয়। এবং বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের চোখে শুধু এই দিকটাই থাকে। কিন্তু অন্যপক্ষে এই নবমুক্ত মানুষগুলির হাত থেকে উৎপাদনের সমস্ত যন্ত্রপাতি লুঠ করে নেয়া হল, পুরানো জমিদারি প্রথায় তাঁদের অস্তিত্বের যে নিরাপত্তা ছিল তা কেড়ে নেয়া হল এবং তারপর মুক্ত মানুষ নিজেকে বিক্রি করতে বাধ্য হল। আর এই লুণ্ঠনের ইতিহাস লেখা আছে মানবজাতির ঘটনাপঞ্জীতে রক্ত আর আগুনের অক্ষরে।"[১৯]

ন্যায়-নীতিবোধের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে দরিদ্রদের উদ্দেশ্যে, ধনিকশ্রেণীর জন্য নয়। নিঃস্ব-রিক্ত কৃষিজীবী মানুষের মরণান্তিক আর্তনাদ-হাহাকার তাঁদেরকে মুনাফা-আহরণে অধিকতর উৎসাহিত করেছে। মুনাফাই ছিল তাঁদের কাছে একমাত্র মন্ত্র। মুনাফা-মন্ত্র তাঁদের শরীরে টনিকের কাজ করত। তাই মার্কস বলেছেন, "অজিয়ে-র মতে টাকা পৃথিবীতে এসেছিল এক গালে রক্তের জরুল বহন করে। আমি বলব, তাহলে পুঁজি আসে মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রত্যেক রোমকূপ থেকে রক্ত ও নোংড়ামি ছড়াতে ছড়াতে।"[২০] তিনি আরো বলেছেন, "নির্দয় বর্বরতার দ্বারা প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের লুণ্ঠন করা হয়েছিল। সেই লুণ্ঠনের পশ্চাতে ছিল এমন সমস্ত রিপুর উত্তেজনা, যেগুলি সবচেয়ে ঘৃণ্য, সবচেয়ে নীচ, সবচেয়ে নিকৃষ্ট, সবচেয়ে জঘন্য, নুক্কারজনক।"[২১] অর্থাৎ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদ সামন্তবাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। সমাজ-বিকাশে পরোক্ষ ফল হিসাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর যত প্রগতিশীল ভূমিকাই থাকুক না কেন, মুনাফার জন্য তাঁরা সমস্ত রকমের নিষ্ঠুর পন্থা গ্রহণ করেছিলেন।

সুতরাং রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, এনলাইটেনমেণ্ট প্রভৃতি আন্দোলনের ইতিহাস স্মরণের সময়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর লুণ্ঠন-পীড়ন, শোষণ-দমনের ভয়াবহ কাহিনী ভুলে

গেলে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্তাবকতা করা হয় মাত্র —বুর্জোয়াশ্রেণীর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ আড়াল করে সমাজের অগ্রগতির ইতিহাসে তাঁদেরকে মহান যোদ্ধা-রূপে চিত্রিত করা হয় মাত্র। কার্ল মার্কস এই সত্য বিস্মৃত হননি বলেই তিনি যেমন বুর্জোয়াশ্রেণীর অত্যাচার-উৎপীড়নের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, অন্যদিকে তার পরোক্ষ ফল হিসাবে পুরানো সমাজব্যবস্থা থেকে নতুন সমাজব্যবস্থায় উত্তরণে তাঁদের প্রগতিশীল ভূমিকার কথাও বলেছেন। ব্রিটিশ-পদানত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তিনি একই রীতি অবলম্বন করেছেন। তিনি ভারতের ইংরেজ-শাসন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "ব্রিটিশেরা হিন্দুস্তানের ওপরে যে দুর্দশা চাপিয়েছে তা হিন্দুস্তানের আগের সমস্ত দুর্দশার চাইতে মূলগতভাবে পৃথক এবং অনেক বেশি তীব্র। ...ইংলণ্ড হিন্দুস্তানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে, এবং সে স্বার্থসাধনে তার আচরণ ছিল নির্বোধের মতো। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল: এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে ইংলণ্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংলণ্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।"[২২]

এই সত্য বিস্মৃত হয়েছেন দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা। তাঁরা উনিশ শতকের 'নবজাগরণের' জয়গান গেয়ে এবং রাজা রামমোহনের গুণকীর্তন করে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতে কোথাও ইংরেজ বণিকদের ধ্বংসকার্যের উল্লেখ নেই। অবশ্য উল্লেখ করলে তাঁরা অসুবিধায় পড়তেন। কারণ ব্রিটিশ-বণিকদের শোষণ-লুণ্ঠনের প্রতি রাজা রামমোহনের নিঃশর্ত সমর্থন এবং তাঁদের প্রশংসা-কীর্তন বিষয়টিও উল্লেখ করতে হত। তাই সে-পথে না গিয়ে তাঁরা বিচ্ছিন্ন-ভাবে মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাংশ উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত করে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে একালের পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে নরহরি কবিরাজ উক্ত গ্রন্থে এঙ্গেলসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, "এনলাইটেনমেণ্ট আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে এঙ্গেলস মন্তব্য করেছেন —"যে মহান ব্যক্তিরা আসন্ন বিপ্লবের জন্য ফ্রান্সে মানুষের মনকে প্রস্তুত করেছিলেন, তাঁরা নিজেরা ছিলেন চরম বিপ্লববাদী। তাঁরা কোনো প্রকারের বাহ্যিক কর্তৃত্বকেই স্বীকার করেননি। ধর্ম, প্রকৃতি, বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সব কিছুকেই ক্ষমাহীন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সব কিছুকেই হয় যুক্তির কাঠগড়ায় নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে হবে, আর নয়তো অস্তিত্বকেই বিসর্জন দিতে হবে। যুক্তিই সব কিছুর একমাত্র মানদণ্ড হয়ে উঠেছিল। ...সেই সময়ে বিদ্যমান প্রতিটি সমাজ ও সরকারকে, প্রতিটি পুরাতন ঐতিহ্যগত ধারণাকে অযৌক্তিক বলে আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত বিশ্ব নিজেকে একমাত্র কুসংস্কারের দ্বারা চালিত হতে দিয়েছিল; অতীতের সব কিছুই ছিল করুণা ও ঘৃণা পাবার যোগ্য। এখন এই প্রথম দিনের আলো (যুক্তির রাজত্ব) প্রকাশিত হল; এখন থেকে

চিরন্তন সত্য, চিরন্তন ন্যায়, প্রকৃতিদত্ত সাম্য ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার —যা কিছু কুসংস্কার, অন্যায়, বিশেষ সুবিধা ও অত্যাচারের স্থান দখল করেছিল।"[২৩]

এঙ্গেলসের এই উক্তির পটভূমিতে উনিশ শতকের 'নবজাগরণের' স্বরূপ নির্ধারণ ও তার নায়ক রাজা রামমোহনের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গেলে কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, যেগুলির সঠিক উত্তর না পাওয়া গেলে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্তাবকতা করা যায়, কিন্তু সংগ্রামী অতীতের অভিজ্ঞতার আলোয় শ্রমিকশ্রেণীর সামনে চলার পথ আলোকিত হয় না। প্রশ্নগুলি হল: উনিশ শতকের 'নবজাগরণে' কি 'যুক্তিই সব কিছুর একমাত্র মানদণ্ড হয়ে উঠেছিল'? সে-সময়ে কি 'প্রতিটি পুরাতন ঐতিহ্যগত ধারণাকে অযৌক্তিক বলে আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল'? 'ধর্ম, প্রকৃতি, বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সব কিছুকেই' কি 'যুক্তির কাঠগড়ায়' 'ক্ষমাহীন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল'? রাজা রামমোহন-প্রিন্স দ্বারকানাথ প্রমুখ উনিশ শতকের নায়করা কি 'চরম বিপ্লববাদী' ছিলেন? তাঁরা কি 'কোনো প্রকারের বাহ্যিক কর্তৃত্বকেই স্বীকার করেননি'? তাঁরা কি ফরাসী বিপ্লবের মতো কোনো 'আসন্ন বিপ্লবের জন্য' 'মানুষের মনকে প্রস্তুত করেছিলেন'? এঙ্গেলসের পূর্বোক্ত উক্তি এক্ষেত্রে ব্যবহার করা কি প্রাসঙ্গিক? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে ইতিহাস নীরব নয়, সরব। সুতরাং ইতিহাসকেই সাক্ষীর কাঠগড়ায় উপস্থিত করা যাক।

অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশে ইংরেজ বণিক-শাসকদের শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে কৃষকদের যে মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়েছিল, উনিশ শতকেও (যখন তথাকথিত 'রেনেসাঁস' আন্দোলন চলছিল) তা অব্যাহত ছিল। কিন্তু 'লক্ষ লক্ষ কৃষকের লুণ্ঠিত সম্পদে ধনবান এই ভূস্বামীশ্রেণী' শহরে বিভিন্ন ধরনের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন করলেও গ্রামে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিদেশী শাসকদের সহযোগিতায় নির্মমভাবে কৃষক-উৎপীড়ন করেছেন এবং কৃষক-সংগ্রামের ঘোরতর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন; ব্রিটিশ শাসক-বিরোধী সংগ্রামকে তাঁরা সমর্থন করতে পারেননি। এসম্পর্কে মোহিত মৈত্র বলেছেন, "নিজেদের স্বার্থ ও প্রয়োজন সাধনের জন্য বিদেশী কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষে যে নতুন বুর্জোয়া-মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁরা ব্রিটিশ শাসনকে 'আশীর্বাদ'-স্বরূপ মনে করতেন এবং সেইজন্যই দেশকে বিদেশী-শাসনমুক্ত করার জন্য কৃষক, তন্তুবায় ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের সংগ্রামে তাঁরা সামিল হতে পারেননি।"[২৪] কারণ নগরকেন্দ্রিক সংস্কার-আন্দোলনটি পরিচালিত হয়েছিল জমিদার ওমধ্যশ্রেণী অর্থাৎ ভূসম্পত্তির একচেটিয়া অধিকারীগণের আত্মসংহতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ এবং বিদেশী বণিক-শাসকগোষ্ঠীর যোগ্য সহকারী ও সহায়ক-রূপে কৃষক-শোষণের অবাধ অধিকার অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে; আর গ্রামাঞ্চলের কৃষক-সংগ্রাম পরিচালিত

হয়েছিল ইংরেজ-শাসন ও জমিদার-মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদ করে কৃষকদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া ভূমিস্বত্বের পুনরুদ্ধার এবং পীড়ন-শোষণের মূলোচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং উনিশ শতকের এই দুই আন্দোলন ছিল পরস্পর-বিরোধী।[২৫] তাই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামে ইংরেজ-বণিকদের সৃষ্ট নয়া জমিদারশ্রেণী ছিল কৃষক-জনসাধারণের শ্রেণীশত্রু, সহযোগী নয়। রায়ত-কৃষককে দমন করাই হল নতুন ভূস্বামীশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার পথ। এবং তা ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মৌল চরিত্রের বিরোধী।

তাসত্ত্বেও নগরকেন্দ্রিক সংস্কার-আন্দোলন হিন্দু সমাজের পক্ষে শুভকর হয়েছিল। সতীদাহ ও বহুবিবাহ নিবারণ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, সামাজিক আদর্শ ও রীতি-নীতির নব মূল্যায়ন, বাংলা সাহিত্য ও হিন্দু ধর্মের নবরূপ-ধারণ প্রভৃতি বিষয়গুলি ধর্মীয় শোষণ থেকে মানুষকে আংশিক মুক্তিলাভে সাহায্য করেছিল। তাই হিন্দু ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে সেদিন যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে তৎকালে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা যদিও ভূস্বামীশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং শ্রেণীস্বার্থে সংস্কার-আন্দোলন পরিচালনা করেছেন, তবুও শহরবাসী ভূস্বামীশ্রেণীর অন্য অংশের তুলনায় তাঁরা সমাজ-প্রগতির পক্ষে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন; আর অন্য অংশটি রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'ধর্মসভা'য় (১৮৩০ খ্রীঃ) সংগঠিত হয়ে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ-বিষয়ে রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তবে অর্থোপার্জনের স্বার্থে ইংরেজিভাষায় ইউরোপীয় শিক্ষা ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয়ে এবং ব্রিটিশ বণিক-শাসন ও দেশীয় জমিদার-মধ্যশ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কৃষকসাধারণকে দমন করার বিষয়ে নতুন ভূস্বামীশ্রেণীর এই উভয় অংশই —মূর্তি-উপাসনা-বিরোধী রামমোহনের 'আত্মীয়সভা' ও মূর্তি-উপাসক রাধাকান্ত দেববাহাদুরের 'ধর্মসভা' — শ্রেণীস্বার্থে ঐক্যবদ্ধ ও সমান সক্রিয় ছিল; এই দুই গোষ্ঠী তাঁদের ধর্মগত মতবিরোধ ভুলে গিয়ে সম্মিলিতভাবে গঠন করেছিলেন 'ভূম্যধিকারী সভা' (Zamindary Association — প্রতিষ্ঠাকাল ২১ মার্চ, ১৮৩৮ খ্রীঃ)।

সামন্ত-বিরোধী কৃষক-সংগ্রামকে সমর্থন না করায় এবং সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি পরিবর্তনের কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় এদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটল না। ফলে 'উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কারকদের যথেষ্ট প্রচেষ্টা সত্ত্বেও (গাছের গোড়ায় জল দিয়ে ডাল কাটার মতো) এবং সংস্কার-আন্দোলন মধ্যে মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করলেও, শেষ পর্যন্ত পূর্বোক্ত কোনো সামাজিক ইনস্টিটিউশনের পরিবর্তন হয়নি, এমনকি উনিশ শতকের শেষ পর্বে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের সদলবলে ও সশব্দে বাংলার নবজাগরণের রঙ্গমঞ্চ দখল করা থেকে বোঝা যায় যে, এগুলির দৃঢ়ভিত্তিতে কোনো আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি; লাগবার কথা নয়, কারণ মূল অর্থনৈতিক গড়নের পরিবর্তন ছাড়া সমাজের institutional power structure-এর কোনো পরিবর্তন হতে পারে না, বাংলাদেশেও সেই কারণে হয়নি।'[২৬]

রামমোহন-দ্বারকানাথ প্রমুখ 'আত্মীয়সভা'র ভূস্বামী-নায়কগণ ইংরেজি পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যের মাধ্যমে ইউরোপের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে মিলটন-শেলী-বায়রনের সংগ্রামী রচনাসম্ভার তাঁদেরকে উদারনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল; ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রী:) সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ তাঁদের প্রেরণা দিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা একদিকে যেমন ইউরোপের বৈপ্লবিক ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে অবতীর্ণ হয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁরা শ্রেণীস্বার্থে শ্বেতাঙ্গ বণিক-শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শোষিত মানুষের শৃঙ্খল-মুক্তির সংগ্রাম সম্পর্কে নীরব থেকেছেন, কখনো সমর্থন করেননি। একদিকে তাঁরা দেশের একটি অংশের অর্থাৎ হিন্দুদের জন্য সমাজ-সংস্কারে প্রয়াসী হয়ে প্রগতিশীল উদারনৈতিক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে তাঁরা শ্রেণীস্বার্থে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে কথা বলেছেন, ভূস্বামী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করেছেন এবং কৃষক-সংগ্রামের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ-শাসকদের সাহায্য করেছেন। তাই তাঁরা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েও ভূসম্পত্তির নিরাপত্তা ও বৃদ্ধির স্বার্থে এবং নিজেরা ভূস্বামীশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে তাঁদের সংস্কার-আন্দোলনকে ইউরোপের 'রেনেসাঁস' আন্দোলনের মতো সামন্ত-প্রভুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেননি। 'তাঁরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বেদ, উপনিষদ, গীতা ইত্যাদির ব্যাখ্যা শুরু করলেন, কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়কারী কোনো সমমূল্য-সম্পন্ন গ্রন্থ তাঁরা উপস্থিত করতে পারলেন না। তাঁরা সংস্কার-কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা জীবনের কোন ক্ষেত্রে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেননি। বাণীগুলি (উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলির —লেখক) শ্রেণীস্বার্থ-বিরোধী হওয়ায় শুরু থেকেই তাঁদের চিন্তাধারায় স্ববিরোধিতা বহাল ছিল।'[২৭] সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায়, বাংলাদেশের সংস্কার-আন্দোলনের প্রায় সকল প্রধান নায়কের চিন্তাধারায় ও ক্রিয়াকলাপে এই পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। 'নবজাগৃতি'-আন্দোলনের প্রথম পুরোহিত রাজা রামমোহনও তার ব্যতিক্রম নন; রাজার কথায় ও কাজে এই স্ববিরোধিতা বর্তমান।

রামমোহন স্বয়ং ভূস্বামী ছিলেন এবং জমিদারি থেকে ও কোম্পানির দেওয়ানি ও তেজারতি কারবার করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন, সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় বিলাসে-ব্যসনে জীবনযাপন করেছেন; অন্যদিকে কোম্পানির শিক্ষিত সাহেব ও অন্যান্য ইংরেজদের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে ইউরোপের বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ সাহিত্যসমূহ অধ্যয়ন করে গণতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর জীবনযাত্রায় সামন্ততান্ত্রিকতা ও চিন্তাধারায় বুর্জোয়া ভাবধারা —এই উভয় উপাদান সমান-ভাবে সক্রিয় থাকার ফলে একদিকে তিনি জীবন-বিরোধী ধর্মীয় চিন্তাধারা ও বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথা-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ধর্মীয় শোষণকে বন্ধ করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান শক্তি সংগ্রামী কৃষক-শ্রেণীর পাশে না দাঁড়িয়ে তিনি সামন্তশ্রেণীর স্বার্থ-রক্ষার চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কার আন্দোলনকে সমাজ-বিপ্লবে পরিণত করার জন্য প্রধান সামাজিক শক্তি কৃষকশ্রেণীর কাছে কোনো আহ্বান তিনি জানাননি। কিন্তু ইউরোপের শিল্প-বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্ত-শৃঙ্খলকে ভেঙে ফেলার জন্য কৃষক-সাধারণের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের এই ইতিহাস জানা সত্ত্বেও রাজা রামমোহন শ্রেণীস্বার্থে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষক-সংগ্রামকে সমর্থন করেননি।

রাজা রামমোহন ফিউডাল-বুর্জোয়া ছিলেন বলেই তাঁর কর্মজীবন এই স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ। 'তাঁর ধীশক্তি, তাঁর অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করেও একথা এখন বলার দরকার হয়েছে যে, তিনিই প্রথম দুই-জীবন দুই-কথার প্রবর্তক বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী।'[২৮] সামন্ত-শোষণের অন্যতম শিকার ছিলেন বাংলাদেশের মেয়েরা। পুরুষ-শাসিত সামন্ত-সমাজে গড়ে উঠেছিল বহুবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা। তাই সমাজ-পীড়কদের বিরুদ্ধে আঘাত হেনে রামমোহন বহু বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে পুস্তিকা রচনা করেছেন। আবার তিনি 'বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন না।'[২৯] রামমোহন 'পথ্যপ্রদান' পুস্তিকায় লিখেছেন, "বিধবার বিবাহ তাবৎ সম্প্রদায়ে অব্যবহার্য হইয়াছে সুতরাং সদ্ব্যবহার করাইতে পারে না কিন্তু বিহিত মদ্যপান ও বৈধ হিংসা সল্লোকেদের মধ্যে অনেকের ব্যবহার্য অতএব তত্তৎপক্ষে যে সর্ব্বথা সদাচার ও সদ্ব্যবহারে গণিত হইয়াছে।"[৩০] অর্থাৎ রামমোহনের মতে বিধবাবিবাহ লোকাচারসম্মত নয়, সুতরাং তা সদাচার নয়; এবং সেই কারণেই তা সমাজে প্রচলিত হতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্রানুযায়ী মদ-মাংস খাওয়াকে সদাচার বলা যেতে পারে।

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সামন্ত-পীড়নের বিরলতম উদাহরণ হল সতীদাহ প্রথা। এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের পূর্ব থেকেই এদেশে যে-আন্দোলন চলছিল, তাতে অংশগ্রহণ করে এবং প্রধান ভূমিকা নিয়ে রামমোহন অসম-সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সতীদাহ-অবসানের জন্য তিনি সংবাদপত্রে লিখেছেন, দুই খণ্ডে 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, গভর্নর-জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তির দাবি জানিয়ে গণ-দরখাস্ত পেশ করেছেন। কিন্তু আইনের দ্বারা সতীদাহ-নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে লর্ড বেন্টিঙ্ক যখন রামমোহনের অভিমত জানতে চেয়েছেন, তখন 'রামমোহন আইনের দ্বারা এই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন।'[৩১] কারণ 'রামমোহন অবিলম্বে (এই প্রথা) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না।'[৩২] তাছাড়া তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সরব হলেও কলকাতার গোলাম-ব্যবসা সম্পর্কে নীরব থেকেছেন; অথচ এই গোলামরা ছিলেন বাংলাদেশের কৃষক-সন্তান।

একেশ্বরবাদী রামমোহনের ধর্মচিন্তায় স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি

বেদান্ত-বর্ণিত মায়াবাদকে অবলম্বন করেই ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা প্রতিপাদনে উদ্যোগী হয়েছেন। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ-ব্যাখ্যাকালে বেদান্তের শাঙ্কর-ভাষ্যকে গ্রহণ করে ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "স্বপ্নেতে যে সকল বস্তুকে দেখ এবং তৎকালে তাহাতে যে নিশ্চয় কর আর জাগরণেতে যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ দেখ ও তাহাতে যে নিশ্চয় করিতেছ এ দুই নিশ্চয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই কিন্তু স্বপ্নের জগৎকে স্বপ্নভঙ্গ হইলে মিথ্যা করিয়া জান এবং বিশ্বাস হয় যে বাস্তবিক মিথ্যা বস্তু কোনো সত্যের আশ্রয়েতে সত্যের ন্যায় দেখা দিয়াছিল সেইরূপ যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে এই জাগরণের জগৎ যাঁহাকে এখন সত্য করিয়া জানিতেছ ইহাকেও মিথ্যা করিয়া জানিবে এবং বিশ্বাস হইবেক যে সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার আশ্রয়েতে মিথ্যা জগৎ সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল।"[৩৩] আবার এদেশে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাদানের দাবি জানাতে গিয়ে বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বকে ব্যঙ্গ করে তিনি লিখেছেন, "আধ্যাত্মিক জ্ঞান শিক্ষাগ্রহণকারী বা সমাজ কারো কোনও ব্যবহারিক কাজে আসবে না।"[৩৪] বৈদান্তিক তত্ত্বকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করে তিনি আরো বলেছেন, "বৈদান্তিক তত্ত্ব তাদেরকে সমাজের উপযুক্ত সদস্য করে গড়ে তুলতেও সাহায্য করবে না। কারণ বেদান্ত শিক্ষা দেয় যে, দৃশ্যমান বস্তুর কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই; পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। সুতরাং তাঁদের প্রতি স্নেহমমতারও কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁদের কাছ থেকে ও সংসার থেকে আমরা যত তাড়াতাড়ি পালাতে পারি ততই মঙ্গল।"[৩৫] রামমোহনের ধর্মভাবনায় এই সামঞ্জস্যহীনতা লক্ষ্য করে একজন লেখক মন্তব্য করেছেন, "আমি এখানে রামমোহনের মধ্যে যে স্ববিরোধ যে-অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে সমন্বয় করিবার কোন পথ পাইতেছি না।"[৩৬]

জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে রামমোহনের কথায় ও কাজের পার্থক্যকে উপেক্ষা করা যায় না। জাতীয় অগ্রগতির পক্ষে জাতিভেদ প্রথা বাধাস্বরূপ বলে তিনি মনে করতেন। রামমোহন লিখেছেন, "জাতিভেদ প্রথা তাঁদের মধ্যে যে অসংখ্য বিভাগ-উপবিভাগ সৃষ্টি করেছে তারফলে তাঁরা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা থেকে বঞ্চিত এবং অগণিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিশুদ্ধতার নিয়মকানুন যে-কোনো কঠিন কাজের পক্ষে তাঁদেরকে অক্ষম করে রেখেছে।"[৩৭] কিন্তু রামমোহন জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন করেননি; যদিও তিনি কতকগুলি বিষাক্ত সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে 'সহজ সত্যটি হল যে, হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক প্রথাগুলির কোনো পরিবর্তনের প্রতি তিনি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন।'[৩৮] তাই দেখা যায়, রাজা সারাজীবন জাতিভেদ প্রথার নিয়মাবলী নিষ্ঠাভরে পালন করেছেন, ব্রাহ্মণ পাচককে সঙ্গে নিয়ে ইংলণ্ডে গিয়েছেন, মৃত্যু পর্যন্ত উপবীত ধারণ করেছেন। এ-সম্পর্কে রামমোহনের অন্তরঙ্গ সুহৃদ মিঃ অ্যাডাম লিখেছেন, "আহার ও পান

সম্পর্কিত যে-সমস্ত নিয়মকানুন বর্তমানে হিন্দু সমাজে প্রচলিত, সেগুলি পালন করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। তিনি সেই সমস্ত খাদ্য আহার করতেন না যেগুলি ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ; তিনি অহিন্দুদের সঙ্গে কিংবা অন্য জাতের অথবা অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে একত্রে আহার করতেন না।"[৩৯] রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ-বিষয়ক চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একালের একজন সমাজ-বিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন, "শ্রেষ্ঠ জীব বলে দেবতাদের অস্তিত্ব রামমোহন স্বীকার করেছেন, ব্রহ্মের অবতার স্বীকার না করলেও রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে অবতার বলে মেনেছেন। পুরাণতন্ত্রাদি জাতিভেদ দেশাচার ইত্যাদি তিনি একেবারে বর্জন করতে পারেননি। বেকনের চারশ্রেণীর 'idols'-এর বিরুদ্ধে রামমোহন অভিযান করেছিলেন সত্য, কিন্তু কুসংস্কারের সমস্ত মানস-প্রতিমা ও প্রেতাত্মা-গুলিকে তিনি ধ্বংস করতে পারেননি।"[৪০]

কেবলমাত্র ধর্ম ও সমাজ-বিষয়ে নয়, রায়ত-জমিদার প্রশ্নেও রাজা রামমোহনের বক্তব্যে উদারনৈতিক চেতনার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। গণতান্ত্রিক ভাবধারা পোষণের জন্য একদিকে তিনি যেমন উৎপীড়িত কৃষকদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে নিজে ভূস্বামী হওয়ার জন্য জমিদারদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত ৫৪টি প্রশ্নের যে-উত্তর এবং যে-স্মারকলিপি রামমোহন দিয়েছেন, তার মধ্যে এই স্ববিরোধিতা পরিস্ফুট। শ্রেণীগত পরিচয়ের দিক থেকে রাজা রামমোহন ছিলেন ফিউডাল-বুর্জোয়া। তাঁর জমিদারি-স্বার্থ ভূস্বামীশ্রেণীর সঙ্গে জড়িত ছিল বলেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধিতা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই বন্দোবস্তকে অক্ষুণ্ণ রেখেই তিনি রায়ত-প্রজাদের স্বার্থরক্ষার বিষয়ে চিন্তা করেছেন।

রামমোহন সামন্ততন্ত্র-ধ্বংসকারী ফরাসী বিপ্লবকে অভ্যর্থনা জানিয়ে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার পরিচয় দিলেও ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হননি এবং স্বদেশের কৃষকদের ভূস্বামী-বিরোধী সংগ্রামকে কোনো সাহায্য করেননি। পক্ষান্তরে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে সামন্ত-নরপতি দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর শাহের বার্ষিক বৃত্তি বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছিলেন এবং গণতান্ত্রিক চেতনার অধিকারী হওয়া হত্বেও তিনি বাদশাহ-প্রদত্ত 'রাজা' খেতাব গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত হননি। 'বাদশাহের দূত' হিসাবে ইংলণ্ডে যাওয়াকে অগৌরবের বিষয় বলে তিনি মনে করেননি; বিলাতে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "His Majesty the Emperor of Delhi had likewise commissioned me."

রামমোহন স্পেনদেশে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের সংবাদে উল্লসিত হয়ে টাউন হলে ভোজসভা দিয়েছেন, ইতালির গণবিপ্লবের পরাজয়ের সংবাদে হতাশায় ভেঙে পড়ে শয্যাগ্রহণ করেছেন, ভাঙা পা নিয়ে অন্য জাহাজে গিয়ে ফরাসী বিপ্লবের পতাকাকে অভিবাদন জানিয়েছেন।

কিন্তু রাজা কখনো ভারতে ব্রিটিশ-শাসন ও শোষণের বিরোধিতা করেননি; কিংবা ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেননি। বাস্তবিকপক্ষে দেশের স্বাধীনতার প্রতি রামমোহনের অনুরাগ ভারতস্থিত ব্রিটিশ-শাসনের কাছে আত্মসমর্পণের নামান্তর মাত্র। রাজার এই মনোভাব ভিকটর জ্যাকমণ্টের কাছে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছিল। তিনি জ্যাকমণ্টকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—দেশের স্বাধীনতার প্রতি জলন্ত অনুরাগ কি অসার কল্পনা নয়? ভারতবর্ষ-প্রসঙ্গে তারপরে তিনি বলেছিলেন—বিজয়ী যদি বিজিতের চেয়ে অধিকতর সভ্য হয় সেক্ষেত্রে বিজয়ী-শাসনকে খারাপ বলা চলে না; কারণ বিজয়ীরা বিজিতদের অধিকতর সভ্য করে তোলায় সাহায্য করেন।[৪১] রামমোহন মনে করতেন, ভারতবর্ষের আরো কিছুকাল ব্রিটিশ-শাসনাধীনে থাকা দরকার যাতে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-সরকারের কাছ থেকে আরো কিছু লাভ করতে পারে। ইংরেজ-সরকারের প্রতি 'অবিচল আনুগত্য ও অসীম আস্থা' প্রকাশ করে রাজা ও তাঁর অনুরাগীরা মনে করেছেন যে, তাঁদের স্বার্থ এদেশে ব্রিটিশ-শাসনের ন্যায় চিরস্থায়ী হবে।[৪২] কিন্তু এদেশে যদি ব্রিটিশ-শাসন চিরস্থায়ী না হয়, যদি ভারতের জনসাধারণ দাসত্ব-শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে, তাহলে ইংরেজ-প্রভুদের স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষিত হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা বলেছেন, ঘটনাক্রমে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-অধীনতা থেকে মুক্ত হলেও তা হবে দু'টি খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী দেশের (অর্থাৎ ব্রিটেন ও ভারত) মধ্যে এবং তাতে বিশেষ সুবিধাজনক বাণিজ্যিক লেনদেনের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকবে।[৪৩]

তাই তিনি নীলকর দানবদের প্রশংসাপত্র দিয়ে[৪৪] নীলচাষীদের সংগ্রামকে 'সংস্কারবদ্ধ মনের অদূরদর্শী আস্ফালন'[৪৫] বলে নিন্দা করেছেন; রাজা পার্লামেণ্টারি কমিটির কাছে বলেছেন যে, ইংরেজ-জাতির অভিজাতশ্রেণী ভারতে উপনিবেশ বিস্তার করলে তার ফল ভারতীয়দের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলদায়ক হবে।[৪৬] তাই তিনি ব্রিটিশ-শিল্পপতিদের অবাধ-বাণিজ্যের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন; যার ফলে দেশী-বিদেশী বণিকেরা লাভবান হলেও দেশীয় গ্রামীণ শিল্পগুলির অবলুপ্তি ঘটেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ইংলণ্ড থেকে এদেশে লবণ আমদানি করার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন, তার ফলশ্রুতিতে একমাত্র বাংলাদেশেই প্রায় ছয়লক্ষ লবণের কারিগর বেকার হয়ে শেষ পর্যন্ত কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয়েছিলেন।

রাজা ছিলেন ভারতে ইংরেজ-শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থক।[৪৭] একটি স্মারক-লিপিতে রাজা ও তাঁর সহযোগীরা বলেছেন, "তাঁদের (অর্থাৎ ভারতবাসীদের—লেখক) পরম সৌভাগ্য যে তাঁরা ভগবৎ করুণায় সমগ্র ইংরেজ-জাতির রক্ষণা-বেক্ষণে রয়েছে এবং ইংলণ্ডের রাজা এবং তাঁর লর্ডগণ ও পার্লামেণ্ট তাঁদের জন্য আইন-প্রণয়নের কর্তা।"[৪৮] কলকাতাস্থিত রামমোহনের বাড়ি থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরবর্তী বারাসত ও পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তিতুমীরের নেতৃত্বে কৃষকেরা ও কৃষিশ্রমিকেরা যে-বৎসরে সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা ইংরেজ-শাসনকে উচ্ছেদ করে

স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, সেই বৎসরেই অর্থাৎ ১৮৩১ সালে রাজা রামমোহন ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসনকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করার উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে লিখেছেন, ''কৃষক ও গ্রামবাসীরা নিতান্ত অজ্ঞ, সুতরাং তাঁরা পূর্বকালের বা বর্তমান কালের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিস্পৃহ। ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মচারীদের আচরণের উপরেই তাঁদের নিরাপত্তা বা দুঃখকষ্ট নির্ভর করে। ...যাঁরা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থেকে ঐশ্বর্যশালী হয়েছেন এবং যাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে শান্তিতে জমিদারী ভোগ করছেন, তাঁরা তাঁদের বিচক্ষণতা দ্বারা ইংরেজ-শাসনাধীনে ভবিষ্যৎ উন্নতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে সক্ষম। আমি তাঁদের সাধারণ মনোভাব সম্বন্ধে বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে, তাঁদের ক্ষমতা ও গুণানুসারে তাঁদেরকে ক্রমশ উচ্চতর সরকারি মর্যাদা দান করলে ইংরেজ-সরকারের প্রতি তাঁদের আনুরক্তি আরো বৃদ্ধি পাবে।''[৪৯] কারণ ব্রিটিশ-শাসকেরা তাঁদের কাছে 'কেবলমাত্র শাসক হিসাবে নয়, পিতা ও অভিভাবক'[৫০]-রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁরা তাঁদের 'জীবন, সম্পত্তি ও ধর্মের রক্ষক'[৫১] ছিলেন।

কেবলমাত্র রাজা রামমোহন নন, 'আত্মীয়সভা'র অন্যান্য ভূস্বামীদের উত্থানের পশ্চাতে রয়েছে একই ইতিহাস। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রাজা রামমোহনের অন্তরঙ্গ সুহৃদ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। এদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমনের 'সময় থেকেই ঠাকুর-পরিবারের সৌভাগ্যের সূত্রপাত। শুরু থেকেই তা যুক্ত হয়েছিল ভারতে ব্রিটিশ-শক্তির আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা-লাভের সঙ্গে।'[৫২] রামমোহনের মতো দ্বারকানাথও তেজারতী কারবার করেছেন, জমিদারি কিনেছেন। 'জমিজমার আয় থেকেই তাঁর তেজারতী ব্যবসায় পত্তন।'[৫৩] আবার তেজারতী কারবার থেকে লব্ধ 'টাকা কেবল যে তেজারতী কারবারে নিয়োগ করতেন এমন নয়, খাজনার কিস্তি খেলাপের জন্য যখনই কোনো জমিদারি সুবিধামত দরে নিলামে উঠত, তিনি অমনি তা কিনে নিতেন।'[৫৪]

'নীতি ও বুদ্ধিবিচারের দিক থেকে রামমোহন ছিলেন তাঁর গুরু।'[৫৫] সুতরাং '১৮২২ অব্দে চব্বিশ পরগণার জেলা কালেক্টর ও নিমকি-এজেন্ট ট্রেভর প্লাউডেন-এর অধীনে সেরেস্তাদার-রূপে দ্বারকানাথ কোম্পানির চাকুরি গ্রহণ করেন।... সম্ভবত রামমোহনের দৃষ্টান্ত এবং কোম্পানির চাকুরির সুখ-সুবিধা, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি তাঁকে এই চাকুরির সন্ধান করতে অথবা গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত করে থাকবে। ...মাহিনা ছিল অকিঞ্চিৎকর — মাসান্তে শ-দেড়েক টাকা। বিষয়সম্পত্তি ও অন্যান্য কাজ-কারবার থেকে দ্বারকানাথের যা আয় হত তার তুলনায় এ-মাইনে ছিল যৎসামান্য। মাইনে যাই হোক না কেন, পদাধিকার-বলে অন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা থাকায় এই চাকুরি সেকালে বেশ লোভনীয় ছিল। ...দেখা যায়, চাকুরি করার সময়েই তাঁর বিষয়-আশয় বৃদ্ধি পেয়েছিল।'[৫৬] অর্থাৎ লেখক ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন, এই চাকরির 'অনেক সুযোগ-সুবিধা' নিয়ে দ্বারকানাথ 'তাঁর বিষয়-আশয় বৃদ্ধি' করেছেন। সেকারণেই তিনি এ-সময়ে কালীগ্রামের

জমিদারি (১৮৩০ খ্রী:) ও সাহাজাদপুরের জমিদারি (১৮৩৪ খ্রী:) কিনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কেবলমাত্র ধনোপার্জন নয়, দ্বারকানাথ 'ব্ল্যাকমেলিংয়েও যে পশ্চাৎপদ ছিলেন না, তার দৃষ্টান্ত'[৫৭] তুলে ধরেছেন কৃষ্ণ কৃপালনী। বিরাহিমপুরের প্রজাদের দমন করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে পূর্বকৃত নানাবিধ দুষ্কৃতি ফাঁস করার ভয় দেখিয়ে তাঁর কার্যসিদ্ধি করার প্রচেষ্টা দেখে কৃষ্ণ কৃপালনী মন্তব্য করেছেন. "যদি বলা হয় এটা অন্যায়ভাবে কার্যসিদ্ধি, তা হলে মানতেই হবে দ্বারকানাথ এ-সবের উর্ধ্বে ছিলেন না।"[৫৮]

রাজা রামমোহন জমিদার হিসাবে কেমন ছিলেন? তাঁর প্রজারা কি অন্যান্য জমিদারদের প্রজাদের তুলনায় সুখী ছিলেন? জমিদারি পরিচালনায় কি তিনি উদার মানবিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন? কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য তিনি কি ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর রামমোহনের জীবনীকাররা (সেকালে ও একালে) দেননি। নীরব থাকাটাই তাঁরা শ্রেয় বলে মনে করেছেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ উত্তর যেখানে নেই, সেখানে পরোক্ষ প্রমাণ খুঁজতে হয়।

'রামমোহনের ভক্তরূপে যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ হন, সেই মিত্র-গোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন দ্বারকানাথ। এঁরা প্রতি সপ্তাহে রামমোহনের বাড়িতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয়সভা'য় মিলিত হতেন। সেখানে হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদি থেকে পাঠ ও ধর্মসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন ধর্মীয় উদারতা, সমাজ-সংস্কারের নীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করতেন।'[৫৯] অর্থাৎ 'আত্মীয়সভা'য় ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা হলেও ভূস্বামীশ্রেণীর শোষণ-অত্যাচার ও প্রজাদের দুরবস্থা সম্পর্কে কোনোরকমের আলাপ-আলোচনা হত না। কারণ কি? দ্বারকানাথের জমিদারি-পরিচালনার ক্ষেত্রে আলোকপাত করলে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

'দ্বারকানাথ ছিলেন প্রজাদের কাছে জবরদস্ত জমিদার।'[৬০] 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকা ১৮৪৩ সনের ৬ জানুয়ারি তারিখের সম্পাদকীয় নিবন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "জমিদার রূপে তিনি এদেশের অন্য জমিদারদের তুলনায় স্বতন্ত্র বলে আমরা জানি না। জমিদারশ্রেণীর অন্য জমিদার এবং জমিদার দ্বারকানাথের মধ্যে বিশেষ কিছু তফাত আছে বলে শুনিনি আমরা। তাঁর জমিদারির রায়তেরা কি- পাশের জমিদারির রায়তদের চেয়ে সুখী? খেটে-খাওয়া মানুষের কষ্ট লাঘব করার জন্য তিনি অনেক কিছু কি করেছেন? অন্যায়, অত্যাচার, বেগার ও জবরদস্তি আদায়ের হাত থেকে (অধিকাংশ দেশীয় জমিদারিতে যা ঘটে থাকে) এদের রক্ষা করার জন্য খুব কিছু কি করেছেন তিনি? সর্বোপরি রচনা কি করেছেন এমন একটা মধুর পরিবেশ যেখানে সকল প্রজা সুখে ও আনন্দে বসবাস করতে পারে?"[৬১]

জমিদারি-পরিচালনা সম্পর্কে দ্বারকানাথের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে একালের

দ্বারকানাথের জীবনী-লেখক ক্লেয়র কিং মন্তব্য করেছেন, "জমিদারি তাঁর কাছে ছিল ব্যবসা —ব্যবসাদারসুলভ শৃঙ্খলায় তিনি জমিদারি পরিচালনা করতেন। তাঁর সেই পটুতার মধ্যে দয়ামায়া বদান্যতার কোনো স্থান ছিল না।"[৬২] এই অভিমত সমর্থন করে কৃষ্ণ কৃপালনী বলেছেন, "তিনি মনে করতেন জমিজমায় অর্থ বিনিয়োগ অন্যান্য ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগের তুল্য। তেজারতী কারবারে যেমন টাকা খাটালে টাকা আসে, তেমনি জমিজমা থেকেও যথোচিত আদায় আসবে বলে তিনি মনে করতেন।"[৬৩]

সুতরাং পারিপার্শ্বিক ঘটনা দৃষ্টে একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, প্রিন্স দ্বারকানাথের মতো জমিদারি-পরিচালনায় বণিকবৃত্তি অবলম্বন করাই ছিল রাজা রামমোহন ও তাঁর সমর্থক ভূস্বামীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এবং সেকারণেই তাঁরা 'আত্মীয়সভা'য় ধর্ম ও সমাজ-বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা করলেও শ্রেণীস্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কায় রায়তদের উপরে অত্যাচার-উৎপীড়ন সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেননি। রাজা ও প্রজার স্বার্থ সংঘর্ষমূলক বলেই রাজা রামমোহন ভূসম্পত্তি রক্ষার্থে অন্যবিধ বিষয়ে সোচ্চার হলেও এদেশে বসবাসকালে রায়ত-প্রজাদের জন্য কোনো আন্দোলন-আলোচনা করেননি। রামমোহনের বিরুদ্ধ গোষ্ঠী 'ধর্মসভা'র জমিদাররাও একই পথ অনুসরণ করেছেন।

হিন্দু ধর্ম ও সমাজ-বিষয়ে 'আলোকপ্রাপ্ত' ভূস্বামীগোষ্ঠীর সঙ্গে রক্ষণশীল ভূস্বামীগোষ্ঠীর বিরোধ-সংঘাতের সৃষ্টি হলেও আর্থনীতিক-রাজনীতিক বিষয়ে তাঁদের ঐকমত্য ছিল। তাই তাঁরা একত্রে রাজার নেতৃত্বে কোম্পানি-সরকার কর্তৃক লাখেরাজ জমি পুনর্গ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন এবং 'ভবিষ্যৎ উন্নতি' ও 'উচ্চতর সরকারি মর্যাদা'-লাভের আশায় তাঁরা শ্বেতাঙ্গ-বণিকদের সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। ইংরেজ-শাসকদের সহৃদয়তা ও সাহায্যের উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন বলে ব্রিটিশ-শাসন উচ্ছেদে সাহায্য করা তো দূরের কথা, তাঁরা সামান্যতম বিরুদ্ধতাও প্রদর্শন করেননি ; বরং তাঁরা প্রায় সকলে ইংরেজ-শাসন বিরোধী কৃষক-সংগ্রামকে দমন করার জন্য কোম্পানির সরকারকে সমর্থন করেছেন। তাঁরা কেবলমাত্র নিজেদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য এবং যোগ্য সহকারী-রূপে সরকারি প্রশাসন-যন্ত্রে অংশগ্রহণকল্পে বণিক-সরকারের কাছে কতকগুলি রাজনৈতিক সুবিধা চেয়েছিলেন। রাজা রামমোহন ছিলেন এই ভূস্বামীশ্রেণীরই (উভয় গোষ্ঠীর) নেতা। সংকীর্ণ অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়া তাঁদের কোনো উচ্চতর রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল না। ভারত-বিশেষজ্ঞ সোভিয়েত-পণ্ডিত উলিয়ানভস্কি বলেছেন, "উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় নাগাদ ভারতে কোন শ্রেণী কিংবা বড় সামাজিক বর্গের এমন কোন মতাদর্শ ছিল না, যাতে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী কিংবা সামাজিক বর্গের জীবনের চাহিদাগুলোর সমন্বয় ঘটে।"[৬৪]

এসময়ে এমন কোনো বিপ্লবী শক্তি ছিল না, যাঁরা এঙ্গেলস কথিত 'কোনো প্রকারের বাহ্যিক কর্তৃত্বকেই স্বীকার করেননি', যাঁরা 'যুক্তির কাঠগড়ায় নিজের

অস্তিত্বের প্রমাণ' দেননি এবং 'প্রতিটি পুরাতন ঐতিহ্যগত ধারণাকে অযৌক্তিক বলে আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ' করেননি। এদেশের তথাকথিত 'নবজাগরণের' নায়করা ফরাসী দেশের 'এনলাইটেনমেণ্ট' আন্দোলনের নেতাদের মতো 'চরম বিপ্লবাদী' ছিলেন না। সামন্ত-স্বার্থের সঙ্গে তাঁদের জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত ছিল বলে তাঁরা এদেশে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে ফেলার সংগ্রামে অবতীর্ণ হননি। অথচ সামন্ত-কাঠামোর পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম না করলে সমাজের সার্বিক জাগরণ ঘটে না। অর্থনৈতিক ভিত্তির বদল না ঘটে কেবলমাত্র সমাজের উপরি কাঠামো শিক্ষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটলেই তাকে নবজাগরণ বলা যায় না। সেই রূপান্তর ঘটে কেবলমাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে যাঁরা তার দ্বারা লাভবান হতে পারেন। উনিশ শতকের বাংলাদেশে সেই ঘটনাই ঘটেছিল। রামমোহন-দ্বারকানাথের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন সমাজ-কাঠামো পরিবর্তনের আন্দোলনে পরিণত হয়নি, তাঁদের আন্দোলনের মধ্যে রায়ত-প্রজাদের মুক্তির কোনো প্রচেষ্টা ছিল না; পক্ষান্তরে তাঁদের আন্দোলনে শহরের বাবুসমাজ উপকৃত হয়েছিলেন বলে তাঁদের মধ্যে আলোড়ন ঘটেছিল এবং তাঁরাও শ্রেণীস্বার্থে রামমোহন-দ্বারকানাথকে নেতা-রূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

সুতরাং এই পটভূমিতে উনিশ শতকের নায়কদের মূল্যায়ন প্রয়োজন। ইংরেজি-ভাষায় আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা, অবাধ বাণিজ্যান্দোলন, নীলকর-সাহেবদের এদেশে জমিদার-রূপে প্রতিষ্ঠাকরণ, লবণ-শিল্পের বিলোপ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে রাজা রামমোহনের ভূমিকার মূল্যায়নে তাঁর শ্রেণীচরিত্রের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতা ও সীমাবদ্ধতা স্মরণে রাখতে হবে।

৬

আধুনিক শিক্ষা ও বাংলার কৃষক

বিনা প্রতিরোধে নিরবচ্ছিন্ন ভারত-লুণ্ঠনই ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একমাত্র উদ্দেশ্য। দেশের সর্বত্র শোষণ, লুণ্ঠন আর ধ্বংস —কোথাও উজ্জীবনের কোনো প্রয়াস নেই। পুরানো সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠামো ভেঙে ফেলা হয়েছে, কিন্তু নতুন কাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। 'স্থানীয় গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে দিয়ে স্থানীয় শিল্পকে উন্মুলিত করে এবং স্থানীয় সমাজে যা কিছু মহৎ ও উন্নত ছিল তাকে সমতল করে দিয়ে ব্রিটিশেরা সে সভ্যতাকে চূর্ণ করে। তাদের ভারত-শাসনের ঐতিহাসিক পাতাগুলো থেকে এই ধ্বংসের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় না বললেই হয়। স্তূপাকৃতি ধ্বংসের মধ্য থেকে উজ্জীবনের ক্রিয়া লক্ষ্যেই প্রায় পড়ে না।'[১] তাই উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানি-সরকার দেশীয় জনসাধারণকে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি। কারণ যে অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষানীতি রচিত হয়, পুরানো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলায় এবং তার পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে না তোলায় সর্বজনীন আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি।

সমাজ-কাঠামোর ভিত্তির উপরে স্থাপিত উপরিসৌধ হল শিক্ষা, আর 'ভিত্তি হল সমাজের বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরে তার অর্থনৈতিক কাঠামো।'[২] অর্থাৎ অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমাজ-কাঠামো নির্মিত হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই উপরিসৌধ-রূপে গড়ে তোলা হয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ইত্যাদি। 'প্রত্যেক ভিত্তিরই থাকে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নিজস্ব উপরিকাঠামো। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তির আছে উপরিসৌধ, তার রাজনৈতিক, আইনগত ও অন্যান্য মত এবং এসবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ। পুঁজিবাদী ভিত্তিরও

আছে নিজস্ব উপরিকাঠামো। তেমনই রয়েছে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির। যদি ভিত্তি বদলে যায় বা বাতিল করা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার উপরিসৌধও বদলে যায় বা বাতিল করা হয়। আর যদি কোনো নতুন ভিত্তির উদ্ভব হয় তাহলে তাকে অনুসরণ করে তার উপযুক্ত উপরিকাঠামো সৃষ্টি হয়।'[৩] তাই লক্ষ্য করা যায়, উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে ব্রিটিশ-সরকার যে-শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেছেন, তা ছিল তৎকালীন অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা ও সামগ্রিক শাসননীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উনিশ শতকের তথাকথিত 'নবজাগরণ' আন্দোলনের স্রষ্টারা শ্রেণীস্বার্থে ব্রিটিশ-সরকারের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। তাই তাঁদের কণ্ঠে নির্জলা ইংরেজ স্তুতি শোনা যায়। রাজা রামমোহন ছিলেন ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থক।[৪] ইংরেজ-সরকারের প্রতি তিনি "অবিচলিত আনুগত্য ও অসীম আস্থা"[৫] প্রকাশ করে বলেছেন, এদেশে "ব্রিটিশ-শাসনের ন্যায় তাঁদের আনুগত্য চিরস্থায়ী হবে।"[৬] তিনি আরো বলেছেন, "তাঁদের (অর্থাৎ ভারতবাসীদের —লেখক) পরম সৌভাগ্য যে, তাঁরা পরমেশ্বরের করুণায় সমগ্র ইংরেজ-জাতির রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছেন এবং ইংলণ্ডের রাজা, তাঁর লর্ডগণ ও কমন্স-সভা তাঁদের জন্য আইন-প্রণয়নের কর্তা।"[৭]

ডিরোজিওর শিষ্যরা যখন ইংরেজ-শোষণের তীব্র নিন্দা করছেন,[৮] তখন রাজা 'ব্রিটিশ-শাসনের প্রতি তাঁদের অবিচলিত ও অপরিচ্ছিন্ন আনুগত্য ও অনুরাগ'-এর পরিচয় দিয়ে বলেছেন, "দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকসমূহ কিংবা সংবাদপত্রগুলি কখনো ঘৃণা ও বিদ্বেষের মধ্যে সরকারকে নিক্ষেপ করেনি। সরকার কঠোরতম অনুসন্ধানের দ্বারা সামান্যতম অবমাননাসূচক ঘটনা প্রমাণ করতে পারেননি।" এবং 'যদিও তাঁরা তাদের আনুগত্য ও অনুরাগের সন্দেহাতীত প্রমাণ দিয়েছেন', তাসত্ত্বেও রাজা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "তাঁদের (অর্থাৎ ভারতীয় ভূস্বামীদের —লেখক) আচরণে ও সাময়িকপত্রে কিংবা অন্যত্র প্রকাশিত রচনা-সমূহে তাঁরা কখনো ব্রিটিশ-সরকারের আশীর্বাদের প্রতি পরিপূর্ণ মর্যাদা প্রকাশে বিরত হননি। তাঁদের প্রকাশিত রচনাসমূহ এই বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।"[৯]

প্রিন্স দ্বারকানাথ বিলাত-যাত্রার সময়ে দেশীয় ভূস্বামীশ্রেণীর একদল প্রতি-নিধির মানপত্র দেবার উত্তরে বলেছিলেন, "সমস্ত পৃথিবীর কাছে তা প্রমাণ করেছে যে, অন্তরানুভূতি ও স্বার্থের দিক দিয়ে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের ভূস্বামীরা অতি নিকট-সম্পর্কে সম্পর্কিত।"[১০] বিলেতে গিয়েও প্রিন্স সোচ্চারে ইংরেজ-সরকারের গুণকীর্তন করেছেন। ১৮৪২ সনের ২৯ জুলাই তারিখে লণ্ডনের লর্ড মেয়র দ্বারকানাথের সম্মানে ম্যানসন হাউসে যে-ভোজসভার আয়োজন করেন, তাতে প্রিন্স দ্বারকানাথ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেছেন, "এই ইংলণ্ডই পাঠিয়েছিল ক্লাইভ ও কর্নওয়ালিসকে বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে ভারতের উপকারসাধন করার জন্য। এই ইংলণ্ডই সেই সুদূরবর্তী দেশে এমন একজন মহান লোককে পাঠিয়েছিল যিনি পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপন করতে পেরেছিলেন, যিনি সর্বপ্রথম সেই প্রাচ্যভূমিতে যথাযথ ও চিরস্থায়ী শৃঙ্খলার অবতারণা করতে পেরেছিলেন। এ হল সেই দেশ,

সমবেত সজ্জনেরা যার প্রতিনিধিস্থানীয়, যে-দেশ মানবিক মর্যাদার সম্মানে দুর্বৃত্ত মুসলমানদের যথেচ্ছাচার থেকে তথা রুশীয়দের সন্ত্রাসজনক নিষ্ঠুরতা থেকে তাঁর দেশকে রক্ষা করেছে। (উচ্চ হর্ষধ্বনি)। এবং ইংলণ্ড এই সব কিছুই করেছে কোনো প্রাপ্তির আশা না করেই, বিনিময়ে কিছু লাভ করবে বলে নয় পরন্তু নিছক উপচিকীর্ষার মনোভাব নিয়ে ...। তাঁর দেশবাসীর পক্ষে ইংলণ্ডের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া অসম্ভব ...।"[১১] লণ্ডনের কোর্ট অব ডিরেক্টর্স কর্তৃক লিখিত উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ পত্রের উত্তরে প্যারী থেকে দ্বারকানাথ 'মহামান্য কোর্ট-এর ভারতশাসন-ব্যাপারে ন্যায়পরতা ও সদাশয়তার' গুণকীর্তন করে বলেছেন, "ভারতের সুখসমৃদ্ধি বজায় রাখার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল আপনাদের মহান ও যশোমণ্ডিত দেশের সঙ্গে যুক্ত থাকা ...। বিধাতার বিধানে যে লক্ষ লক্ষ লোকের কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের দায় আপনাদের উপর বর্তেছে, সে-দায়িত্ব পালনে আপনাদের সহৃদয় ব্যাকুলতা সমগ্র পৃথিবীর মুগ্ধ প্রশংসা অর্জনের দাবি রাখে।"[১২]

রামমোহনের হিন্দু সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের আর একজন সহকর্মী প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইংরেজের অধীনস্থ হয়ে থাকতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ভগবান যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি স্বাধীনতা চাও, না ইংরেজের অধীন হয়ে থাকতে চাও, আমি মুক্তকণ্ঠে ইংরেজের অধীনতাই বর বলে গ্রহণ করব।[১৩]

রামমোহন-দ্বারকানাথ-প্রসন্নকুমারের ব্রিটিশ-তোষণের প্রয়াসকে তৎকালীন সংবাদপত্র সমর্থন করতে পারেননি। এমন-কি দ্বারকানাথের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হয়েও 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকা দ্বারকানাথের বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করে লিখেছেন, "সে যেমনই হোক না কেন, ম্যানসন হাউস-এ মুখের কথায় আমাদের বন্ধুবর যেমন হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, এ-চিঠিতে হাতের লেখায় স্বাক্ষর বসিয়ে তার চেয়ে কোনো অংশে কম হঠকারিতার পরিচয় দেননি। ...অসন্তুষ্ট কিছু কিছু ব্যক্তি যখনি দেশীয়দের অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন, স্যার জে. লাশিংটন ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এই হতভাগা-চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সে-সব অভিযোগ খণ্ডন করতে চেয়েছেন। আমাদের সেজন্য দুঃখ হয় দ্বারকানাথ আদৌ কেন এ-চিঠি লিখলেন অথবা এ-চিঠিতে স্বাক্ষর করলেন — এই কথা ভেবে।"[১৪] কিন্তু দ্বারকানাথ কোনো হঠকারিতার পরিচয় দেননি, তাঁর লেখায়-ভাষণের পশ্চাতে ছিল তাঁর স্বার্থবুদ্ধি। কারণ 'তাঁর সামাজিক মর্যাদা ও অর্থবিত্তের সৌভাগ্য — সমস্ত কিছুই তো নির্ভর করছে ব্রিটিশ-প্রভুদের মর্জির উপর।'[১৫] কেবলমাত্র দ্বারকানাথের নয়, প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল নির্বিশেষে সমস্ত জমিদারদের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধি ব্রিটিশ-করুণার উপরে নির্ভরশীল ছিল।

তাই এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের জন্য ভূম্যধিকারীশ্রেণী ইংরেজ বণিক-সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন এবং স্বাধীনতার পরিবর্তে 'মুক্তকণ্ঠে ইংরেজের অধীনতাই' কামনা করেছেন। 'অন্তরানুভূতি ও স্বার্থের দিক দিয়ে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের ভূস্বামীরা অতি নিকট-সম্পর্কে সম্পর্কিত' বলেই তাঁরা

উনিশ শতকে অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির জন্য শ্রেণীস্বার্থে এদেশে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। এই সত্যের স্বীকৃতি রয়েছে রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থে। তিনি গভীর বেদনার সঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "এটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এবং আমরা লজ্জা ও দুঃখের সঙ্গে লিখছি যে, শিক্ষিত দেশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা দেশের কল্যাণ জমিদারদের স্বার্থের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। ভূস্বামীশ্রেণীর অধিকার ও স্বার্থরক্ষার পক্ষে ওকালতি করার অপর নাম হল স্বদেশপ্রেম"[১৬] সুতরাং এই প্রেক্ষাপটে উনিশ শতকের ইংরেজিভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাদানের আন্দোলনে রাজা রামমোহনের ভূমিকার মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পশ্চাতে ব্রিটিশ-বেনিয়াদের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তাঁরা অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন যে, বাৎসরিক বা পাঁচসালা বন্দোবস্তের দ্বারা ভূসম্পত্তিহীন রাজস্ব-আদায়কারী জমিদারদের মাধ্যমে যে-পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়, তা দিয়ে কোম্পানির ক্রমবর্ধমান ব্যয়-নির্বাহ সম্ভব নয়। অথচ কোম্পানির রাজত্ব বজায় রাখতে হলে কৃষক-বিদ্রোহ দমন করতে হবে, রাজত্ব বাড়াতে হলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য অধিকার করতে হবে এবং কোম্পানির অংশীদারদের ক্রমবর্ধমান লভ্যাংশের দাবি পূরণ করতে হবে। তাই তাঁরা 'মাছের তেল দিয়ে মাছ ভাজা'র নীতি গ্রহণ করলেন।

দখলীকৃত দেশে কিছু দেশীয় কর্মচারীর সাহায্যে শোষণ-নিপীড়ন চালালেও কোম্পানির ব্যাপক সামাজিক ভিত্তি ছিল না। অথচ স্থায়ীভাবে শোষণ-কার্য চালাতে গেলে বিপুল সংখ্যক দেশীয় সমর্থক সংগ্রহের প্রয়োজন। তাই এমন কতকগুলি সামাজিক স্তর সৃষ্টি করতে হবে যা কোম্পানির শাসন-শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করবে। বাৎসরিক বন্দোবস্ত ও পাঁচসালা বন্দোবস্তের ফলে ধ্বংসোন্মুখ পুরানো বনেদী জমিদারদের মধ্যে অনেকেই ব্রিটিশ-বিরোধী কৃষক-সংগ্রামে উৎসাহ-মদত-নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এঁদের সম্পর্কে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ গভীর সন্দেহ পোষণ করতেন। সুতরাং তাঁদের সামাজিক প্রভাব নষ্ট করার জন্য নতুন নতুন দেশীয় বন্ধু সৃষ্টি করতে হবে, যাঁরা সমস্ত রকমের বিদ্রোহ-বিক্ষোভের বিরুদ্ধে ইংরেজ-শাসনকে সমর্থন-সাহায্য করবেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পশ্চাতে ছিল শাসকগোষ্ঠীর এই পরিকল্পনা। তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। তাই বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ নভেম্বর ঘোষণা করেছিলেন, "বহু দিকে এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যতই গলদ থাকুক না কেন, একটি বিষয়ে উহার অপরিসীম গুরুত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। কোনো ব্যাপক গণবিক্ষোভ বা বিপ্লবের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এমন এক বিপুল সংখ্যক ধনী জমিদারশ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে, যাঁহাদের স্বার্থ বৃটিশ-শাসন বজায় থাকার প্রশ্নের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং জনসাধারণের উপর যাঁহাদের প্রভূত প্রভাব রহিয়াছে।"[১৭]

ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের গূঢ় অভিসন্ধি ব্যর্থ হয়নি ; নয়া ভূস্বামীশ্রেণী ও মধ্য-শ্রেণী কোম্পানির শোষণ-লুণ্ঠনে সহযোগী হয়েছেন। তাঁরা বিদেশী শাসকদের সহযোগিতায় নির্মমভাবে কৃষক-উৎপীড়ন করেছেন এবং কৃষক-সংগ্রামের ঘোরতর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন ; ব্রিটিশ-শাসক-বিরোধী সংগ্রামকে তাঁরা সমর্থন করতে পারেননি। এ-সম্পর্কে মোহিত মৈত্র বলেছেন, "নিজেদের স্বার্থ ও প্রয়োজন সাধনের জন্য বিদেশী কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষে যে নতুন বুর্জোয়া-মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁরা ব্রিটিশ-শাসনকে 'আশীর্বাদ'-স্বরূপ মনে করতেন এবং সেইজন্যই দেশকে বিদেশী-শাসনমুক্ত করার জন্য কৃষক, তন্তুবায় ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের সংগ্রামে তাঁরা সামিল হতে পারেননি।"[১৮] তাই তাঁরা শ্রমজীবীদের স্বার্থে মাতৃভাষায় জনশিক্ষার দাবি না করে শ্রেণীস্বার্থে বিত্তশালী-শ্রেণীর জন্য ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের দাবি উত্থাপন করেছেন।

বণিক-সরকারের শোষণ-লুণ্ঠনের ফলে বাংলাদেশের প্রাচীন গ্রাম-ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। নিশ্চিহ্ন হল গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প ; ধ্বংস হল প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা। প্রাচীন অর্থনীতির পরিবর্তে এদেশে চালু করা হল উপনিবেশিক অর্থনীতি ; প্রাচীন দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তে ইউরোপীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হল। বিত্তবানদের বিত্ত আর বুদ্ধিজীবীদের মেধা — এই দুটি স্তম্ভের উপরে নির্ভর করে ইংরেজরা এদেশে উপনিবেশিক-ব্যবস্থা গড়ে তুললেন। ব্রিটিশ-বেনিয়া ও দেশীয় জমিদারদের শোষণ-যন্ত্র যাতে অপ্রতিহত গতিতে চলতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই সমস্ত নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। তাই তাঁদের নতুন অর্থনৈতিক-ব্যবস্থার উপরে ভিত্তি করে যে নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা তৈরি করা হল, তাতে বাংলার কৃষক-ঘরের ছেলেমেয়েরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ-লাভে বঞ্চিত হল। কারণ কৃষক লেখাপড়া শিখলে তাঁকে প্রতারিত করা কঠিন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালের প্রথম দিকে পর্যন্ত (অর্থাৎ রামমোহনের আবির্ভাবের পূর্বকালে ও সমকালে) এদেশে প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম অ্যাডামের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, সেকালের প্রাচীন শিক্ষা মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল — (১) প্রাথমিক শ্রেণী, (২) উচ্চ শ্রেণী। প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য দু'রকমের প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল—(ক) পাঠশালা, (খ) মকতব। গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলায় লেখা, অঙ্ক ও শুভঙ্করী শেখানো হত ; পড়বার বই ছিল না, মুখে মুখে চলত শিক্ষা। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, ধনীর দালানে অথবা দোকানের বারান্দায় ধনী ব্যক্তিদের আনুকূল্যে 'গুরুমশায়রা' পড়াতেন। মকতবে কিছু উর্দু-ফারসি, সাধারণ হিসাব ও গণিত শিক্ষা দেওয়া হত এবং আরবি কোরানের খানিকটা অংশ মুখস্থ করানো হত। মৌলভীরা দরগা-তলায় বা মসজিদ-প্রাঙ্গনে অথবা নিজেদের বাড়িতে শিক্ষাদান করতেন। গ্রাম্য পাঠশালায় বা মকতবে যে-সব ছাত্র লেখাপড়া শিখতে

আসত, তারা সাধারণত স্বল্পবিত্ত জমিদার, ব্যবসায়ী এবং অবস্থাপন্ন চাষীঘরের ছেলে ছিল। অবশ্য নিম্নস্তরের নমঃশূদ্র, ধোবা, বাগদি ইত্যাদি শ্রেণীর ছেলেদেরও এসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখার সুযোগ ছিল এবং সেজন্য বিশেষ কোনো বাধা ছিল না। অ্যাডামের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের প্রতি গ্রামে একটি (এমন কি বড় বড় গ্রামে একাধিক) প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল! কিন্তু বণিক-শোষণের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাই লাডলো বলেছেন, "যেখানে পূর্বের গ্রাম-সমাজের কাঠামো এখনো বর্তমান সেখানে শিশুরা পড়তে লিখতে এবং আঁক কষতে জানে। কেবল যেখানে গ্রামসমাজ সম্পূর্ণ উড়ে গেছে যেমন বাংলাদেশে সেখানেই গ্রাম্য পাঠশালাও উড়ে গেছে।"[১৯]

উচ্চশিক্ষার জন্য সেকালে হিন্দুদের টোল-চতুষ্পাঠী এবং মুসলমানদের মাদ্রাসা ছিল। টোল-চতুষ্পাঠীতে শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃতভাষা এবং মাদ্রাসায় শিক্ষার বাহন ছিল ফারসি কিংবা আরবি ভাষা। টোলে এবং মাদ্রাসায় ঐ-সব ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন, স্মৃতি, মীমাংসা, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ ইত্যাদি শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা দান করা হত। তবে টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষা গ্রহণের অধিকারী ছিল একমাত্র ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা। সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চা একান্তভাবেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখানে অব্রাহ্মণদের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। নবদ্বীপ, মিথিলা, বিক্রমপুর, বারাণসী প্রভৃতি অঞ্চলের টোল-চতুষ্পাঠী সংস্কৃত-শাস্ত্র শিক্ষাদানের কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিল। উইলসন বলেছেন, একমাত্র নদীয়াতেই এই ধরনের টোলের সংখ্যা ছিল পঁচিশ। বিদেশীরা টোলগুলিকে 'হিন্দুদের অক্‌স্‌ফোর্ড'-রূপে অভিহিত করেছেন।[২০] পাটনা, মুর্শিদাবাদ, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চলের মাদ্রাসাগুলি আরবি-ফারসি শিক্ষাদানের জন্য বিখ্যাত ছিল।

এই শিক্ষা-কাঠামো কোম্পানি-শাসনের প্রথম যুগে অব্যাহত ছিল। কেবলমাত্র লুণ্ঠন ও শোষণের অভিপ্রায় থাকায় বিদেশী বণিক-শাসনের প্রথম পর্বে এদেশে ইংরেজি-শিক্ষা প্রবর্তনের কোনো পরিকল্পনা তাঁদের ছিল না। কিন্তু দুয়ারে হাতি বেঁধে রাখার জন্য আঠারো-উনিশ শতকের নবোদ্ভূত জমিদার ও মধ্যশ্রেণীভুক্ত বাবুরা ইংরেজিভাষা শিখতে আগ্রহী হয়েছেন। 'বৎসরের পর বৎসর যতই ইংরাজ-রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, যতই ক্রমে শাসনকার্যের জন্য আইন-আদালত প্রভৃতি স্থাপিত হইতে লাগিল, যতই ইংরাজ বণিকগণ দলে দলে আসিয়া কলিকাতা শহরে আপনাদের বাণিজ্যাগার স্থাপন করিতে লাগিলেন, ততই এদেশীয়দিগের, এবং বিশেষভাবে কলিকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের মধ্যে স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে ইংরেজি শিক্ষা দিবার আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত হইতে লাগিল।"[২১]

একই মন্তব্য করেছেন একালে কৃষ্ণ কৃপালনী: "ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা

থেকেই ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতর হচ্ছিল যে, যে-সব পরিবার কোম্পানির অধীনে চাকরী করতে কিংবা কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আগ্রহী, তাদের ছেলেদের ইংরেজীভাষা ভালো করে শিখতে হবে; কারণ ইংরেজী তখন রাজ-ভাষা হতে চলেছে। স্বয়ং রামমোহন, সেই সময়ে তাঁর ত্রিশ বছর বয়সের কাছাকাছি, নিজেই ইংরেজী শিখতে শুরু করেছিলেন।"[২২]

কোম্পানি-শাসনের সংস্রবে এসে আঠারো শতকের কলকাতার বাবুরা ইংরেজ-দের কাছ থেকে কয়েকটা ইংরেজি শব্দ শিখে নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন। দেওয়ান, বেনিয়ান, মুচ্ছুদ্দি, সরকার, খাজাঞ্চী, মুন্শী প্রভৃতি বাবুদের প্রথম দিকে ইংরেজি-জ্ঞানের ভাণ্ডারে ছিল Yes, No, Very well ইত্যাদি কয়েকটা ইংরেজি শব্দ। এঁদের ইংরেজি-বিদ্যা সম্পর্কে মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন রাজনারায়ণ বসু। তিনি লিখেছেন, "ইংরাজদিগের যে সকল সরকার থাকিত, তাহাদের ভাষা ও কথোপকথন আরো চমৎকার ছিল। একজন সাহেব তাঁহার সরকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সরকার বলিল — মাষ্টর ক্যান লিব, মাষ্টর ক্যান ডাই (Master can live, master can die)। অর্থাৎ মনিব আমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন, অথবা মারিয়া ফেলিতে পারেন। সাহেব "What, master can die?" এই কথা বলিয়া সরকারকে মারিবার জন্য লাঠি উচাইলেন। সরকারের তখন মনে পড়িল, "ডাই" শব্দের অন্য অর্থ আছে, তখন "ষ্টাপ্ দেয়ার" (Stop there) অর্থাৎ প্রহার করিতে লাঠি উঠাইও না, এই বলিয়া হাত উঁচু করিল, তৎপরে অঙ্গুলি দ্বারা আপনাকে দেখাইয়া বলিল, "ডাই মি" (Die me) অর্থাৎ আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারেন। "ইফ্ মাষ্টর ডাই, দেন আই ডাই, মাই কো ডাই, মাই ব্লাক স্টোন ডাই, মাই ফোরটিন জেনারেষণ ডাই।" "If master die, then I die, my cow die, my blackstone die, my fourteen generation die।" "যদ্যপি মনিব মরেন, তবে আমি মরিব, আমার কো অর্থাৎ গরু মরিবে, আমার ব্লাকস্টোন অর্থাৎ বাড়ার শালগ্রাম ঠাকুর মরিবেন, আমার ফোরটিন জেনারেষণ অর্থাৎ চোদ্দ পুরুষ মরিবে।"[২৩]

এই অবস্থায় দেশীয় বণিক-জমিদারদের মনে ইংরেজি-শিক্ষার জন্য গভীর আগ্রহ দেখা দেয়, কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন যে, বণিকদের ভাষা কিছুকালের মধ্যে রাজ-ভাষা হবে। সুতরাং রাজানুগ্রহ-লাভের আশায় রাজভাষা-শিক্ষার জন্য তাঁরা সচেষ্ট হন। প্রকৃতপক্ষে দেশীয় পরশ্রমজীবী শ্রেণীর কাছে আকর্ষণীয় আয় ও জাঁক-জমকপূর্ণ পদমর্যাদালাভের প্রশস্ত রাজপথ হল ইংরেজিভাষা-শিক্ষা। এই ভাষায় শিক্ষা-গ্রহণকে তাঁরা সর্বরোগহর দাওয়াই বলে মনে করেছেন।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হওয়ার পরে ইংরেজ-অ্যাটর্নি-অ্যাডভোকেটদের কোনো কোনো উৎসাহী বাঙ্গালী কেরাণী নিজেরা কিছু ইংরেজি শব্দ শিখে নিয়ে অন্যদের শিক্ষা দিতেন। তখনো ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়নি; ধনী বাবুদের বাড়িতে গিয়ে তাঁরা পড়িয়ে আসতেন। ইংরেজি শব্দ নোটবুকে

লিখে নিয়ে যাঁরা অন্যদের ইংরেজি-শিক্ষা দিতেন এবং মাসিক চার টাকা থেকে ষোল টাকা পর্যন্ত বেতন নিতেন, তাঁদের মধ্যে রামরাম মিশ্র রামনারায়ণ মিত্র; আনন্দী-রাম দাস, রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভবানী দত্ত, শিবু দত্ত, নিত্যানন্দ সেন, উদিতচরণ সেন ও আরো দু'চারজনকে কেউ কেউ "celebrated as complete English scholars" বলে উল্লেখ করেছেন। এই 'scholar'-দের মধ্যে ইংরেজি-বিদ্যা একখানা Spelling Book ও Word Book-এর মধ্যে সীমিত ছিল।[২৪] 'তখন লোকে ডিক্‌ষণরি মুখস্থ করিত, তাঁহারা এক এক জনে Walking Dictionary অর্থাৎ সচল অভিধান ছিলেন।'[২৫] এঁরা ছাড়া কয়েকজন ফিরিঙ্গি বাড়িতে ছাত্র নিয়ে ইংরেজি-শিক্ষা দিতেন। তাঁদের মধ্যে শেরবোর্ণ একটি ইংরেজি-শিক্ষার স্কুল খুলেছিলেন জোড়াসাঁকোয়। মার্টিন বৌলের স্কুল ছিল আমড়াতলায়, শীল-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা এখানে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। আরাতুন, পিত্রুশ, ড্রামণ্ড, হুটেমান প্রমুখদের স্কুলে কলকাতা শহরের উচ্চশ্রেণীর বিত্তশালী পরিবারের সন্তানরাই ইংরেজি শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন।

বেনিয়া-শাসনের প্রথম যুগে এদেশে ইংরেজি-শিক্ষা বিস্তারের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা কোম্পানি-শাসকদের ছিল না। ১৭৫৭ সনের পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতের মাটিতে তাঁদের অবস্থানকে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে সুদৃঢ় করতে তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। আদালতের কাজের সুবিধার জন্য পণ্ডিত-মৌলভীকে নিয়োগ করতে হত বলে তাঁরা এদেশে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা-চর্চায় উৎসাহ দিতেন। ওয়ারেন হেস্টিংস রাজনৈতিক স্বার্থে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গোঁড়া ধর্মাবলম্বীদের সন্তোষ-বিধানার্থে প্রাচ্য-শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলমান সমাজের অভিজাত-শ্রেণীর আস্থাভাজন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হেস্টিংসের কাছে মুসলমান ছাত্রদের আরবি ও ফারসি ভাষায় উচ্চশিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপনের আবেদন করেন। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সুযোগ পাওয়া মাত্র তিনি কালবিলম্ব না করে অক্টোবর মাসে অভিজাত মুসলমান ছাত্রদের ইসলামিক শিক্ষাদানের জন্য কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন। ছাত্রদের আকৃষ্ট করার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে প্রাচীন আরবি ও ফারসি রীতি অনুসারে কোরানীয় ধর্মতত্ত্ব, পাটীগণিত, তর্কশাস্ত্র ও ব্যাকরণ পড়ানো হত এবং এই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন একজন মৌলভী।

মুসলমানদের ন্যায় হিন্দু-সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য হেস্টিংসের সমর্থনে জোনাথান ডানকানের উদ্যোগে বেনারসে ১৭৯১ সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মনুর বিধানানুসারে এখানে শিক্ষা দেওয়া হত এবং বৈদ্যশাস্ত্রের অধ্যাপক ব্যতীত অন্যান্য অধ্যাপকেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। কেবলমাত্র বেনারসে নয়, এদেশের বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কৃতজ্ঞ কোলব্রুক সুপারিশ করেছেন।

এভাবে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে হেস্টিংসের আনুকূল্যে 'প্রাচ্য' গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে এবং ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে এদেশের শিক্ষা-কাঠামো নির্মাণে প্রভাব-বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছে।[২৬]

প্রকৃত পক্ষে প্রাচ্য শিক্ষা-চর্চার এই দুটি কলেজ-স্থাপন ছাড়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোনো শিক্ষানীতি এসময়ে ছিল না। সাম্রাজ্য-শোষণের স্বার্থে 'তদানীন্তন রাজপুরুষগণ হিন্দু ও মুসলমানগণের প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি হস্তার্পণ করিতে অতীব কুণ্ঠিত ছিলেন।'[২৭] সেকারণেই বৃটেনে চার্লস গ্রাণ্ট ও উইলিয়ম উইলবার ফোর্সের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। ভারতীয়দের খ্রীষ্টান করার পূর্বে বিজয়ী জাতির ভাষা ইংরেজির মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞানদানের দ্বারা সুশিক্ষিত করার জন্য অবৈতনিক ইংরেজী-স্কুল স্থাপনের পরামর্শ দিয়ে চার্লস গ্রাণ্ট যখন ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে **'Observations'** নামক পুস্তিকা (বইটির পুরো নাম —**'Observations on the state of society among the Asiatic subjects of Great Britain, particularly with respect to their morals and on the means of improving them'**) লিখেছেন এবং গ্রাণ্টের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে উইলবার ফোর্স যখন ভারতীয়দের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং ধর্মচেতনা ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতির জন্য ইংলণ্ড থেকে একদল শিক্ষক ও মিশনারি ভারতে পাঠাবার জন্য ব্রিটিশ-পার্লামেণ্টে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, তখন তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের দ্বারা এদেশীয় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির মনে আঘাত দানে তাঁরা অনিচ্ছুক ছিলেন বলেই ১৭৯৩ সালের কোম্পানির সনদে ভারতের শিক্ষা-বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হল না।

এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার জন্য একদিকে কোম্পানি-সরকারের আনুকূল্যে ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা-চর্চায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে ওয়েলেসলীর উদ্যোগে কোম্পানির তরুণ ইউরোপীয় কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও এই কলেজ বাংলা গদ্য-বিকাশের প্রথম পর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 'প্রাচ্য'-গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক লর্ড মিণ্টো ১৮১১ সালের ৬ মার্চের 'মিনিট'-এ ভারতে প্রাচ্য শিক্ষা-গ্রহণে আগ্রহের অভাব ঘটায় উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছেন যে, ভারতীয়দের মধ্যে প্রাচ্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আলোচনা ক্রমশ কমে যাচ্ছে এবং তারফলে শেষ পর্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থগুলি ক্রমেই বিলুপ্ত হচ্ছে। সরকার যদি এ-বিষয়ে অবিলম্বে সাহায্য না করেন, তবে পাঠ্যগ্রন্থ ও উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে প্রাচ্য বিদ্যা-চর্চার সমাপ্তি ঘটবে।[২৮] সুতরাং তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, নদীয়ায় নবদ্বীপে ও ত্রিহুতের অন্তর্গত ভাউর নামক স্থানে সংস্কৃত কলেজ এবং ভাগলপুর ও জৌনপুরে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। মিণ্টোর প্রস্তাবে অবিলম্বে কোনো ফল না হলেও কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী ভারতের শিক্ষা-সমস্যার প্রতি আর উদাসীন থাকতে পারলেন না

এবং তার ফলে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদে ভারতে শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হল।

১৮১৩ সালের সনদ-আইনের (Charter Act) ৪৩নং ধারায় শিক্ষার জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে বলা হয়, "প্রত্যেক বৎসরে ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা স্বতন্ত্র রাখতে হবে এবং তা ভারতের শিক্ষিত অধিবাসীদের উৎসাহদান, সাহিত্যের উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবন এবং ভারতের ব্রিটিশ-শাসিত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের জন্য ব্যয় করা হবে।"[২৯] সনদ-আইনের শিক্ষা-বিষয়ক এই ধারাটি ছিল দ্ব্যর্থবোধক ও গভীর হতাশাব্যঞ্জক। কারণ তাঁরা কেবলমাত্র সমাজের অভিজাতশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্পর্কেই চিন্তা করেছিলেন। 'শিক্ষিত ব্যক্তিদের উৎসাহদান' ও 'বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন' —এই বাক্যাংশ দুটিকে একত্রে পাঠ করলে এই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে যে, যাঁরা অর্থ ও বর্ণকৌলীন্যের জোরে বৈদিক যুগ থেকে শিক্ষাকে নিজেদের শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছেন, তাঁদের জন্যই কোম্পানী-সরকারের মাথাব্যথা —যাঁরা কোনোদিনই শিক্ষার অধিকার পাননি, তাঁরা বঞ্চিত হয়েই থাকলেন। তাদেরকে শিক্ষিত করার বিষয় নিয়ে দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হল না ; বিতর্ক হল শিক্ষার ধরন ও ভাষা-মাধ্যম নিয়ে। সনদ-আইনে দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহারের ফলে এই টাকা কি ধরনের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে এবং শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম কি হবে তা নিয়ে প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয়।

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন ধনোপার্জনের জন্য কলকাতায় এসে কয়েক বছর ছিলেন। এসময়ে জন ডিগবী ও অন্যান্য ইংরেজ-কর্মচারীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সেই সূত্রে তিনি কোম্পানির চাকরি গ্রহণ করে জালালপুর, রামগড়, যশোহর, ভাগলপুর, রংপুর ইত্যাদি অঞ্চলে গিয়েছিলেন ; কিন্তু মাঝে-মধ্যে তিনি কলকাতায় এসে তাঁর তেজারতি-ব্যবসা দেখা-শুনা করেছেন। জন ডিগবীর দেওয়ান-রূপে রংপুরে থাকাকালে রামমোহন ইউরোপীয় ইতিহাস-বিজ্ঞান-দর্শনের বহু গ্রন্থ পাঠ করেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। বেন্থাম, হিউম, রিকোর্ডো. জেমস মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ সেকালের ইউরোপীয় সমাজের শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া চিন্তাশীলদের রচনাবলী-পাঠে প্রভাবিত হয়ে রামমোহন ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থায়ীভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যে কলকাতায় উপস্থিত হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি হিন্দু ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। এই উদ্দেশ্যে 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫ খ্রী:) স্থাপন করে তিনি সংস্কার-আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। 'আত্মীয়সভা'র বিভিন্ন অধিবেশনে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী, বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী, বৃন্দাবন মিত্র, কাশীনাথ মল্লিক, কালীশঙ্কর ঘোষাল, অন্নদাপ্রসাদ ব্যানার্জী, বৈদ্যনাথ মুখার্জী প্রমুখ বিশিষ্ট রাজা-মহারাজা ও জমিদাররা জাতিভেদ-সমস্যা,

নিষিদ্ধ খাদ্য-সমস্যা, পৌত্তলিকতার সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, সতীদাহ-প্রথা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

কেবলমাত্র আলোচনা নয়, একেশ্বরবাদ প্রচার, সংস্কৃত উপনিষদ-গ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ, সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে পুস্তক-রচনা, সংবাদপত্র প্রকাশ ইত্যাদি কাজের দ্বারা রামমোহন কলকাতার নাগরিক-জীবনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি বাংলায় 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্ত সার' (১৮১৫ খ্রী:), 'কেনোপনিষদ' ও 'ঈশোপনিষদ' (১৮১৬ খ্রী:), 'কঠোপনিষদ' ও 'মাণ্ডুক্যোপনিষদ' (১৮১৭ খ্রী:) 'মুণ্ডকোপনিষদ' (১৮১৯ খ্রী:) ইত্যাদি সংস্কৃত-গ্রন্থগুলির অনুবাদ করেছেন এবং সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়ে রচনা করেছেন দুটি পুস্তক —'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮ খ্রী:) এবং 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯ খ্রী:)। তাছাড়া তিনি এসময়ে তিনটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন —'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন — ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১ খ্রী:), 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১ খ্রী:) ও 'মীরাৎ-উল-আখবার' (১৮২২ খ্রী:)।

এসময়ে মিশনারীদের একাংশের উদ্যোগে মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা-দানের ব্যাপক প্রয়াস শুরু হয়। ইংরেজ-ছাত্রদের জন্য উইলিয়ম কেরির উৎসাহে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকরা যখন বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন, তখন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা (শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠাকাল ১০ জানুয়ারি, ১৮০০ খ্রীঃ) কেরির অধিনায়কত্বে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষা বিস্তারের সর্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা একদিকে আঞ্চলিক ভাষার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, আধুনিক শিক্ষাদানের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে মাতৃভাষায় পুস্তক প্রকাশের জন্য ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা হরফের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আধুনিক জ্ঞানের আলো দেশীয় সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো বিদেশী ভাষায় সম্ভব নয় —এই অভিমত ব্যক্ত করে ডাঃ জোশুয়া মার্শম্যান ইংলণ্ডের মিশনারী কর্তৃপক্ষের কাছে 'মিনিট' পাঠিয়েছিলেন এবং এই 'মিনিট'-এ ব্যক্ত অভিমতের উপরে ভিত্তি করে তিনি ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে **'Hints relative to the Native Schools together with the outlinc of an institution for their expansion and management'** নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে এই 'মিনিট' ও পুস্তিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সনদ-আইন গৃহীত হওয়ার পরে এদেশে আধুনিক শিক্ষা-প্রসারের একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সর্বপ্রথম মার্শম্যান তাঁর 'মিনিট'-এ উপস্থিত করেছিলেন। এখানে জনশিক্ষার জন্য যে-সব সুপারিশ করা হয়েছিল তার অনেকগুলিই পরবর্তীকালে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের 'উডের ডেসপ্যাচ'-এ গ্রহণ করা হয়েছিল। অবশ্য মার্শম্যানের এই পরিকল্পনার পশ্চাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য থাকলেও

এই 'মিনিট'-এর ঐতিহাসিক মূল্য কোনোরকমেই অস্বীকার করা যায় না। কারণ কৃষিজীবী মানুষের স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা এইবারেই সর্বপ্রথম তাঁর 'মিনিট'-এ উপস্থিত করা হয়েছে।

'Hints' নামক পুস্তিকায় মার্শম্যান ইংরেজিভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য কিছু ব্যক্তির প্রয়াসের তীব্র বিরোধিতা করে লিখেছেন, "প্রথমেই একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে হলে তাঁদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমেই করতে হবে। ভারতবর্ষের অথবা যে-কোনো দেশের অধিবাসী-দের মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষার অথবা ইংরেজিভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার প্রয়াস করলে তা প্রতারণামূলক হবে।" সুতরাং তাঁর মতে "এমনভাবে শিক্ষার মাধ্যম নির্বাচন করা উচিত যাতে দেশের মানুষ পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে সুখী হতে পারে।"[৩০] তাই তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন যে, এদেশের মানুষের প্রয়োজন জাতীয় শিক্ষা এবং তা মাতৃভাষার মাধ্যমেই সার্থক হতে পারে ; বিদেশী ভাষার মাধ্যমে নয়। প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের জন্য তিনি সরল অঙ্ক, মাতৃভাষার ব্যাকরণ ও বিশুদ্ধ বানান শেখার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং উচ্চশিক্ষার জন্য ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান শেখার পরামর্শ দিয়েছেন।

কিন্তু তাঁর পরামর্শ অরণ্য রোদনে পর্যবসিত হয়েছে। উনিশ শতকের 'নবজাগরণের' নায়করা শ্রেণীস্বার্থে মার্শম্যানের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেননি। তাঁরা কলকাতায় ও নিকটবর্তী বিভিন্ন নগরে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা-প্রসারের জন্য ইংরেজি-স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং কলেজ-স্থাপনে অগ্রণী হয়েছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল ১৮১৪ সালে কুড়ি হাজার টাকা দান করেছেন। ১৮১৭ সনের ২০ জানুয়ারি রামমোহন-গোষ্ঠীর 'আত্মীয়সভা' ও রাধাকান্ত-গোষ্ঠীর 'ধর্মসভা'র অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের সম্মিলিত প্রয়াসে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের মধ্যেকার ধর্মগত বিভেদ কিংবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ধর্মীয় গোঁড়ামী শ্রেণীস্বার্থ পূরণের জন্য কলেজ-স্থাপনের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮১৬ সালের ১৪ মে যে-সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সভার বিবরণ দিতে গিয়ে সভার আহবায়ক সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডোয়ার্ড হাইড ইস্ট ১৮ মে তারিখে বিচারপতি হ্যারিংটনকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, "এই সভার একটি বিশেষ লক্ষণীয় এই যে নানা জাতির লোক—যাঁহারা একত্রে বসিয়া ভোজন করিবেন না—তাঁহারাও তাঁহাদের শিশুদের একত্রে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার জন্য এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন।"[৩১]

দশ জন ইউরোপীয় ও উনিশ জন দেশীয় ধনী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলীতে 'আত্মীয়সভা' ও 'ধর্মসভা'-র গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা ছিলেন। দেশীয় ব্যক্তিরা হলেন চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, মৃত্যুঞ্জয়

বিদ্যালঙ্কার, রঘুমণি বিদ্যাভূষণ, গোপীমোহন ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রামতনু মল্লিক, অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল দে, রাজা রামচাঁদ রায়, রামগোপাল মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক, চৈতন্যচরণ শেঠ, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, রামরতন মল্লিক ও কালীশঙ্কর ঘোষাল। এই কলেজ-স্থাপনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করে বলা হয়েছে —"বিশিষ্ট হিন্দু-পরিবারের সন্তানদের ইউরোপ ও এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়সমূহ ইংরেজিভাষায় ও ভারতীয় ভাষাসমূহের মাধ্যমে শিক্ষাদান হল এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।"[৩২] তাই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রায় সকলে ধনিক-পরিবারের সন্তান ছিলেন। ইংরেজিভাষার মাধ্যমে তাঁরা অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা লাভ করেছেন। হিন্দু কলেজের এক ছাত্র লিখেছেন, "সমস্ত দিক থেকেই আমরা নিরাপদ। সাহিত্য ও বিজ্ঞানে আমরা ক্রমেই উন্নতি করছি এবং করতে থাকব যতদিন ব্রিটিশ-পৃষ্ঠপোষকতা আমরা লাভ করব।"[৩৩]

রাজা রামমোহন ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য স্বীয় ব্যয়ে কলকাতায় হেদুয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অ্যাংলো হিন্দু স্কুল স্থাপন করেন। এখানেও বিত্তশালী ও সম্ভ্রান্তবংশীয় সন্তানেরাই কেবলমাত্র অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছেন। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এই স্কুলে পড়েছেন। রেঃ. অ্যাডাম এই বিদ্যালয় সম্পর্কে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন, "এই বিদ্যালয়ে দু'জন শিক্ষক আছেন; তাঁদের একজনকে মাসিক ১৫০ টাকা ও অন্যজনকে মাসিক ৭০ টাকা মাইনে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে ৬০ থেকে ৮০জন হিন্দু বালক ইংরেজিভাষায় শিক্ষালাভ করে।"[৩৪] তাছাড়া রামমোহন রেঃ. আলেকজাণ্ডার ডাফকে কলকাতায় ইংরেজি-স্কুল 'জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউসন' স্থাপনে সাহায্য করেছেন। রাজা ইংরেজিভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের প্রভাবশালী সমর্থক ছিলেন।[৩৫] সুতরাং উনিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় শিক্ষা প্রবর্তনের যে-আন্দোলন আরম্ভ হয়, তার সুযোগ গ্রহণ করা বিত্তবান জমিদার ও মধ্যশ্রেণী ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে রায়ত-কৃষকের সন্তানেরা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হলেন; তাঁরা রয়ে গেলেন চির-অন্ধকারে।

বিত্তশালী শ্রেণীর আগ্রহে যখন ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটছে, তখনো ব্রিটিশ-সরকার শিক্ষা-বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেননি। ১৮১৬ সালের পূর্বে উচ্চপদস্থ ইংরেজ-কর্মচারীদের মধ্যে শিক্ষাবিষয়ে কোনো ঐকমত্য ছিল না। তাঁরা দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন —একদল আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ইত্যাদি প্রাচ্যভাষার মাধ্যমে উচ্চতর প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন; অন্যদল ইংরেজিভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিক্ষার সপক্ষে ছিলেন। তাঁদের অন্তর্বিরোধকে সনদ-আইন তীব্রতর করে তুলেছিল। এই আইনে 'শিক্ষিত অধিবাসীদের উৎসাহদান',

'সাহিত্যের উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবন', 'বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন ও বিস্তার' ইত্যাদি দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় উভয় পক্ষই নিজ নিজ মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন। তবে প্রাচ্যপন্থীরা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জুলাই এক সরকারি নির্দেশের দ্বারা দশজন ইউরোপীয় সদস্য নিয়ে General Committee of Public Instruction নামে একটি কমিটি গঠন করে তাঁদের হাতে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কমিটির বিভিন্ন পদে ও সদস্য-রূপে নিযুক্ত হয়েছেন : জে. এইচ. হ্যারিংটন —সভাপতি; জে. পি. লারকিন্স; ডবলিউ. বি. মার্টিন; ডবলিউ. বি. বেলি; এইচ. সেক্সপীয়ার; এইচ. ম্যাকেঞ্জী; এইচ. টি. প্রিন্সেপ; জে. সি. সি. সাদারল্যাণ্ড; এ. স্টার্লিং এবং এইচ. এইচ. উইলসন —সম্পাদক। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৮৩৪ সালে এই কমিটির সভাপতি-রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন লর্ড বেরিংটন মেকলে।[৩৬]

জেনারেল কমিটির সদস্যদের মধ্যে প্রাচ্যভাষা ও প্রাচ্যশিক্ষা প্রশ্নে ভিন্ন মত থাকলেও পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের বিষয়ে কোনো মতবিরোধ ছিল না। তাছাড়া উভয় গোষ্ঠী মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিরোধী ছিলেন। ১৮২৩ সালের এক সরকারি নির্দেশনামায় জেনারেল কমিটিকে দেশীয় ব্যক্তিদের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়নে উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে বলা হল। কমিটির মধ্যে প্রাচ্যপন্থী সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় প্রাচ্য-শিক্ষানুরাগী উইলসন ও প্রিন্সেপের নেতৃত্বে ক্ল্যাসিক্যাল অর্থাৎ সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষার মাধ্যমে প্রাচ্য-কলাবিদ্যা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের নীতি গ্রহণ করা হল। ব্রিটিশ-পার্লামেণ্ট কর্তৃক শিক্ষাখাতে বাৎসরিক বরাদ্দ এক লক্ষ টাকা হিসাবে তিন বৎসরের (১৮২১-১৮২৩ খ্রী:) তিন লক্ষ টাকার মধ্যে প্রাপ্ত ২,৬৬,৪০০ টাকা এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে তাঁরা উদ্যোগী হলেন। উইলসন ও প্রিন্সেপ সংস্কৃত ও আরবি ভাষার মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-চর্চায় যত্নশীল হন। তাঁরা কলকাতার মাদ্রাসা ও কাশীর সংস্কৃত কলেজের সংস্কারসাধন করেন, কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৪ সালে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক বহু ইংরেজি-গ্রন্থ সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় প্রকাশ করেন। তাছাড়া প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবি-গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হল।

এভাবে প্রাচ্যভাষায় বিদ্যাদানের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় এবং ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের প্রতি জেনারেল কমিটির অনীহা দেশীয় ভুস্বামী-বণিক-ধনিকশ্রেণীকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ফলে তাঁরা রাজা রামমোহনের নেতৃত্বে জেনারেল কমিটির প্রাচ্য-বিদ্যাদান ও ভাষানীতির-বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলেন। শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য, শিক্ষার ভাষামাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা-বিস্তারের পদ্ধতি প্রভৃতি প্রশ্ন নিয়ে কলকাতায় শিক্ষা-আন্দোলন গড়ে উঠে। এই শিক্ষা-আন্দোলনে শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম প্রশ্নটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব অর্জন করেছিল। এই প্রশ্নে তিনটি মত সৃষ্টি হয়েছিল। ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে ছিলেন লর্ড বেন্টিঙ্ক, লর্ড মেকলে, রাজা

রামমোহন, প্রিন্স দ্বারকানাথ, রাজা রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ প্রমুখ এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের একাংশ। হেস্টিংস, জোনাথান, কোলব্রুক, মিণ্টো, উইলসন, প্রিন্সেপ প্রমুখ ইউরোপীয় রাজকর্মচারী সংস্কৃত ও আরবি ভাষার সপক্ষে ছিলেন। মনরো, এলফিনস্টোন, কেরি, মার্শম্যান, অ্যাডাম, ডিরোজিও প্রমুখ তৃতীয় দল মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথম দুটি দলের তুলনায় তৃতীয় দলটি দুর্বল হওয়ায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-বিস্তারের দাবি উপেক্ষিত হল — রামমোহন যদি এই দাবি সমর্থন করতেন, তাহলে গ্রামবাংলা আধুনিক ভাবধারায় উদ্দীপ্ত হয়ে সামন্ত-শৃঙ্খল ভেঙে ফেলত। তবে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রচলনে উক্ত তিন দলের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য ছিল না।

দেশীয় ভূস্বামীশ্রেণীর দুই অংশ রামমোহন-দ্বারকানাথের 'আত্মীয়সভা' এবং রাধাকান্ত-ভবানীচরণের 'ধর্মসভা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই ইংরেজিভাষায় ইউরোপীয় বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়গুলি অধ্যয়নের পক্ষপাতী ছিলেন। উভয় গোষ্ঠীর কাছে ইংরেজি-শেখার অর্থ ছিল চাকরি, অর্থ ও সামাজিক সম্মানলাভ। 'ইংরাজি বিদ্যা দেশে প্রচলিত হইবা মাত্র লোকে দেখিতে পাইল যে, ইংরাজেরা সমুদ্রপার হইতে নানাবিধ অদ্ভুত সামগ্রী আনিয়াছেন, তার মধ্যে এও একটা অত্যন্ত অপরূপ সামগ্রী। অতি সহজে এ একটা পেট ভরিবার উপায়। এই বিদ্যার উপার্জ্জনে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ কড়ি খরচ করিতে হয় বটে ; কিন্তু তারপর ইহা বেচিয়া বা ইহার বিনিময়ে বা ইহার নামে যথেষ্ট কড়ি ঘরে আইসে। অর্থোপার্জ্জনের যত পন্থা দেশের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে এইটাই সবচেয়ে সহজ পন্থা হইল। ইহাতে অধিক মূলধনের দরকার হয় না। ইহাতে অধিক ব্যবসায় বুদ্ধি আবশ্যক হয় না, এবং সবচেয়ে সুবিধা — ইহাতে দেউলিয়া হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না।'[৩৭]

তাই ইংরেজিভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের দাবি করে রাজা রামমোহন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর তারিখে লর্ড আমহার্স্টকে এক চিঠিতে লিখেছেন, "যদি ইংরাজ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ রাখা উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে প্রাচীন স্কুলমেনদিগের অসার বিদ্যার পরিবর্ত্তে বেকনের প্রবর্ত্তিত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত হইতে না দিলেই হইত, কারণ প্রাচীন জ্ঞানই অজ্ঞতাকে বাহাল রাখিত। সেইরূপ এদেশীয়দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখা যদি গভর্ণমেণ্টের আকাঙ্ক্ষা ও নীতি হয়, তাহা হইলে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় তাহার উৎকৃষ্টতর উপায় আর নাই। তৎপরিবর্ত্তে এদেশীয়দিগের উন্নতিবিধান যখন গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা বিষয়ে উন্নত ও উদার রীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যদ্দ্বারা অপরাপর বিষয়ের সহিত, গণিত, জড় ও জীব-বিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীরস্থান-বিদ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে অর্থ এখন প্রস্তাবিত কার্য্যে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইউরোপে শিক্ষিত কতিপয় প্রতিভাশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে ও ইংরাজী শিক্ষার

জন্য একটি কালেজ স্থাপন করিলে ও তৎসঙ্গে পুস্তকালয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রাদি, প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল দিলেই পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।"[৩৮]

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রধানেরা অর্থাৎ 'ধর্মসভা'র নেতারা অর্থনৈতিক স্বার্থে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের প্রচেষ্টাকে সোচ্চারে সমর্থন করেছেন। সেকারণে অর্থকরী বিদ্যা-উপার্জনের আবশ্যকতাকেও তাঁরা শাস্ত্রসিদ্ধ বলেছেন। 'ধর্মসভা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থে লিখেছেন, "অতএব অর্থকরী বিদ্যোপার্জ্জনের আবশ্যকতা আছে তাহা শাস্ত্রসিদ্ধি বটে এবং যখন যিনি দেশাধিপতি হয়েন তখন তাহাদিগের বিদ্যাভ্যাস না করিলে কি প্রকারে রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় ইহাতে আমার মতে কোন দোষ দেখি না।"[৩৯] তিলক-শোভিত হিন্দু পণ্ডিত ও হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট পরিহিত কালো চামড়ার দিশি সাহেবরা অর্থকে পরমার্থ বলে মনে করেছেন। এবং সেকারণে মাতৃভাষাকে গঙ্গায় বিসর্জন দেবার ব্যবস্থায় তাঁরা একমত ছিলেন। তাদের কাছে ইংরেজিভাষা ছিল রাজার ভাষা, আর বাংলাভাষা ছিল লেংটি-পরা মানুষের লাঙলের ভাষা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, প্রাক্-বঙ্কিম যুগে "বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত- পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্বর জ্ঞান করিতেন"[৪০]

কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইংরেজিভাষায় ইংরেজিশিক্ষার প্রসার নয়, শ্বেতাঙ্গ-সরকার যাতে প্রাচ্য-শিক্ষাদানের নীতি পরিত্যাগ করে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করে সনদ-আইনে বরাদ্দ বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, সেজন্য রামমোহন পূর্বোক্ত চিঠিতে আমহার্স্টের কাছে আবেদন জানিয়ে লিখেছেন, "আমরা অবগত হয়েছি যে, ইংলণ্ডের সরকার ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষার জন্য বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করেছিলেন। আমরা নিশ্চিতভাবে আশা করেছিলাম যে গণিত, জড় ও জীব-বিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীর-স্থান-বিদ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষাদানের কাজে প্রতিভাধর ব্যক্তি ও শিক্ষাবিদকে এদেশে নিয়োগের জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হবে; কারণ বিজ্ঞান-বিষয়সমূহে উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা ইউরোপীয় জাতিসমূহ পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অধিবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে।"[৪১] ইউরোপীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য রামমোহন দাবি করলেও প্রাচ্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য জেনারেল কমিটির উদ্যোগে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মাদ্রাসার জন্য নতুন গৃহ নির্মিত হয়; সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কিছুদিন পরে ইংরেজিভাষা-শিক্ষা কলেজের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। তাসত্ত্বেও শিক্ষাখাতে বরাদ্দ টাকার অধিকাংশ প্রাচ্য শিক্ষার উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছে।

অথচ বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য জেনারেল কমিটির কাছে কয়েকটি শিক্ষা-প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। মাতৃভাষায়

আধুনিক শিক্ষার কাঠামো গড়ে তোলার জন্য জন. পি.. শেক্সপীয়ার কর্তৃক উপস্থাপিত প্রথম প্রস্তাবে (৬.৯.১৮১৩ খ্রী:) বলা হয়েছিল যে, প্রথম স্তরে প্রত্যেকটি থানা এলাকায় একটি বাংলা স্কুল, দ্বিতীয় স্তরে প্রত্যেকটি জেলার সদর-শহরে দুটি বাংলা স্কুল এবং প্রাদেশিক আদালত অবস্থিত ছ'টি বড় শহরে ছ'টি বাংলা স্কুল স্থাপন করা হোক। রেঃ. উইলিয়ম কেরি কর্তৃক লিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাবে (১৬.৯.১৮২৩ খ্রী:) বলা হয়েছে যে, দরিদ্রশ্রেণীর জন্য জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং দেশীয় ব্যক্তিদের মাতৃভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞান-শিক্ষা দেওয়া হোক। এখানে লক্ষ্যণীয়, মার্শম্যান, জন. পি. শেক্সপীয়ার, কেরি, ডিরোজিও প্রমুখ মাতৃভাষায় আধুনিক শিক্ষাদানের দাবি করলেও আমহার্স্টের কাছে লিখিত পূর্বোক্ত চিঠিতে রাজা রামমোহন এই দাবি উত্থাপন করেননি। অর্থাৎ তিনি দেশের মাটির পরিবর্তে বিদেশে নির্মিত টবে ফুল ফোটাতে চেয়েছেন। কিন্তু ডিরোজিওর শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা ছিল দেশের মাটির রসে সিক্ত।

ডিরোজিও শিক্ষক হিসাবে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। শিক্ষা-বিষয়ে তাঁর লব্ধ জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনার রূপরেখা পাওয়া যায় ১৮২৬ সালে প্রকাশিত 'Education in India' নামক প্রবন্ধে। 'Indian Magazine' পত্রিকায় প্রকাশিত শিক্ষা-বিষয়ক একটি প্রবন্ধের আলোচনা করতে গিয়ে ডিরোজিও বলেছেন যে, লেখক উক্ত প্রবন্ধে দেশীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা ('The necessity and benefit of Local Education') সঠিকভাবে দেখিয়েছেন, কিন্তু ইউরোপীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ('necessity of a European Education' রয়েছে। লেখক পক্ষপাতহীন মনোভাব নিয়ে দেশীয় শিক্ষার বিষয়টি বিচারকালে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ('the subject of Local Education has been very dispassionately and ably treated by the writer')। অর্থাৎ ডিরোজিও মনে করেন, এদেশের মাটিতে ইউরোপীয় জ্ঞানের বীজ রোপণের লক্ষ্য নিয়ে দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত।[৪২]

কেবলমাত্র ডিরোজিও নন, তাঁর ছাত্ররাও শিক্ষকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মাতৃভাষায় আধুনিক শিক্ষাদানের দাবির সমর্থনে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। ১৮৩৮ সনের জুন মাসে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা'র অধিবেশনে ডিরোজিওর প্রস্তাবিত দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার রূপরেখাকে বিস্তৃত করে ডিরোজিওর শিষ্য উদয়চন্দ্র আঢ্য দেশীয় ব্যক্তিদের জন্য মাতৃভাষা-চর্চা ও তার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক বাংলায় লিখিত প্রস্তাব পাঠ করেন। 'যাহাতে স্বদেশীয় ভাষায় বাঙ্গালিদিগের সুশিক্ষা হয়', সে-উদ্দেশ্যে লেখক তথ্য-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে দেখিয়েছেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের ফলেই ইউরোপীয়দের অগ্রগতি ঘটেছে এবং প্রত্যেক দেশে মাতৃভাষায় আধুনিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিরা 'বাঙ্গালা ভাষায় কোনো প্রয়োজন নিষ্পাদন হইতে পারিবেক না

ইহা ভিন্ন মনে অন্য কদাচ স্থান দেন না।'[৪৩]

রাজা রামমোহন আঞ্চলিক ভাষায় ইউরোপীয় শিক্ষাদানের দাবিকে সমর্থন না করলেও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন একদল মিশনারী এই আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই আন্দোলনে অনেকেই সামিল হয়েছিলেন। বিদেশী ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষায় আধুনিক শিক্ষাদানের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ এবং আঞ্চলিক ভাষার স্কুল স্থাপন —এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা এদেশে আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যখন মার্শম্যানের মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার পরিকল্পনা (পূর্বে উল্লিখিত 'মিনিট') এদেশ থেকে ইংলণ্ডের মিশনারী-কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছিল, তখন দেশীয় অভিজাতশ্রেণীকে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণে সুযোগ-সুবিধা দানের জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বার্থ-প্রণোদিত পরিকল্পনা ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষ ইংলণ্ড থেকে এদেশে পাঠিয়েছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের দ্বারা লিখিত পুস্তকগুলি তাঁদের ইংরেজ-ছাত্রদের জন্য রচিত হলেও বহু বাংলা স্কুলে পড়ানো হত। কেরির 'কথোপকথন' (১৮০১), 'ইতিহাসমালা' (১৮১২), 'বাংলা-ইংরেজি অভিধান' (১৮১৮), 'নব ধারাপাত' (১৮২০) ; রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১), 'লিপিমালা' (১৮০২) ; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'রাজাবলী' (১৮০৮), 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' (১৮১৭), 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' (১৮৩৩) ; তারিণীচরণ মিত্রের 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট' (১৮০৩), চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' (১৮০৫), হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' (১৮১৫), কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পদার্থ কৌমুদী' (১৮২১) ও 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' (১৮২২) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রসারে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করেছে।

মুদ্রিত পুস্তকের অভাব এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল। শ্রীরামপুর মিশন বিদ্যালয়-স্থাপনের পরিকল্পনার সঙ্গে সারণী, বিজ্ঞানের কপিবুক, ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক বই, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিসয়ের পুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করে। শিক্ষাবিস্তারে মিশনের সাফল্য অনেকাংশে এই মুদ্রিত পাঠ্য পুস্তকের জন্যই হয়েছিল। পাঠ্যপুস্তক-প্রকাশে মিশন ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় পাঁচশ' টাকা খরচ করে। মিশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকগুলি সেযুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন ফেলিক্স কেরি, জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রমুখ। তাঁদের উদ্যোগে '১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ভূগোল, জ্যোতিবিজ্ঞান, ইতিহাস, অভিধান, বর্ণমালা, শব্দকোষ প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ের ২৭ খানি পুস্তক শ্রীরামপুর হতে প্রকাশিত হয়।'[৪৪] বাংলায় বিশ্বকোষ গ্রন্থমালা সিরিজ প্রকাশের জন্য ফেলিকস কেরি অ্যানাটমি বা শারীর-ব্যবচ্ছেদ বিষয়ক গ্রন্থ 'বিদ্যাহারাবলী' (১ম খণ্ড, ১৮২০)

রচনা করেন। এসময়ে ইংলণ্ডের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ব্রিটন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' (১৮২০) প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের 'বিদ্যাহারাবলী' (স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক) প্রকাশিত হয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে। তাছাড়া তিনি 'যাত্রীরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' (দুই খণ্ড —১৮২১, ১৮২২) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যান বিবিধ বিষয়ে বাংলা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' (১৮১৯), 'সদ্গুণ ও বীর্য্য' (১৮২৯), 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (দুই খণ্ড — ১৮৩১), 'ক্ষেত্রবাগান বিবরণ' (১ম —১৮৩১; ২য় —১৮৩৬; ৩য় —১৮৩৭), 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ' (১৮৩৩), 'মারের ইংরাজী ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ' (১৮৩৩), 'ঈশপের গল্প' (দুই খণ্ড —১৮৩৪), 'আগ্রা ও বঙ্গরাজধানীর রাজসভা সম্পর্কীয় আইন' (দুই খণ্ড —১৮৩৬), 'বাংলার ইতিহাস' (১৮৪০), 'দেওয়ানী আইন সার' (১৮৪২), 'দারোগাদের কর্ম্মপ্রদর্শক গ্রন্থ' (১৮৫১), 'ব্যবস্থা বিধান' (১৮৫১) ইত্যাদি গ্রন্থগুলি তৎকালীন ছাত্রদের মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-অর্জনে প্রভূত সাহায্য করেছিল।

তাঁরা মাতৃভাষার জানালা দিয়ে দেখেছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলো; মাতৃভাষায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হয়েছিলেন। উইলিয়ম ইয়েটস রচনা করেছিলেন 'পদার্থ বিদ্যাসার' (১৮২৫), 'জ্যোতির্বিদ্যা' (১৮৩০) ও 'সারসংগ্রহ' (১৮৪৪)। রসায়ন শাস্ত্র-বিষয়ক 'কিমিয়াবিদ্যাসার' (১৮৩৪) রচনা করেছেন রেঃ, জন ম্যাক। বিজ্ঞান-বিষয়ক দুটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে — বিজ্ঞান সেবধি' (১৮৩২) এবং 'বিজ্ঞানসার সংগ্রহ' (১৮৩৪)।

সেকালে বাংলা গদ্য কতখানি সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছিল এবং বিজ্ঞানের ভারবহনে ক্ষমতা অর্জন করেছিল, তা জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিলে উপলব্ধি করা যাবে: "কেহ বলেন যে পৃথিবী চতুষ্কোণা ও কেহ বলেন ত্রিকোণা কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত-শিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থেতে কহেন যে পৃথিবী কদম্ব পুষ্পের মত গোলাকৃতি। এই প্রকার জ্যোতির্বেত্তাদের কথা আমাদের কথার সহিত মিলে ও প্রমাণসিদ্ধও বটে।"[৪৫]

লোকশিক্ষায় ও ভাষাবিকাশে সংবাদপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই শ্রীরামপুরের মিশনারীরা সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। তাঁরা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাংলাভাষায় 'দিগ্‌দর্শন' নামক মাসিক পত্রিকা এবং মে মাসে 'সমাচার দর্পণ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকায় 'ভূগোল, ইতিহাস, দেশ-বিদেশের জ্ঞাতব্য তথ্য, কৌতুককর অথবা বিস্ময়জনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী ইত্যাদি প্রকাশিত হইত। দিগ্‌দর্শনের ভাষা এবং বিষয়বস্তু উভয়ই ছিল বিদ্যালয়ের ব্যবহারের উপযোগী। সেইজন্য স্কুল বুক সোসাইটির বিদ্যালয়সমূহে দিগ্‌দর্শন পাঠ্যপুস্তকরূপে চলিত ছিল।'[৪৬]

পুস্তক-প্রকাশের ন্যায় আঞ্চলিক ভাষার আধুনিক বিদ্যালয়-স্থাপনেও শ্রীরাম-পুরের মিশনারীরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 'Hints'-এ প্রকাশিত মার্শম্যানের পরিকল্পনানুসারে ১৮১৬ সাল থেকে শ্রীরামপুর-সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মিশনের উদ্যোগে আঞ্চলিক ভাষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং তিন বৎসরের মধ্যে ১০৯টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭১৬৫। জেলাওয়ারি হিসাব নিম্নরূপ : [৪৭]

জেলার নাম	বিদ্যালয়-সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা
হুগলী জেলা (শ্রীরামপুর সহ)	৫৪	৩৬৮৪
চব্বিশ পরগণা	২২	১৩৭০
হাওড়া	১৮	১০৭৭
বর্ধমান	৭	৬৫৬
ঢাকা	৫	২৭৮
মুর্শিদাবাদ	৩	১০০
মোট —	১০৯	৭১৬৫

শ্রীরামপুর মিশনের ন্যায় চুঁচুড়ায় অবস্থিত লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির রে:. মে ২৫ বৎসর বয়সে এদেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই চুঁচুড়া সেণ্ট্রাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুল-স্থাপনের পশ্চাতে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের মতো রে:. মে-র খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না —কেবলমাত্র মাতৃভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষাদানই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই তাঁর নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীতে বাইবেল-পাঠ বা ধর্মবিষয়ক পাঠ্যবই ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল এই স্কুলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখানে মাতৃভাষায় পড়া, লেখা ও অঙ্ক শেখানো হত। পাঠ্যসূচী লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য মে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মাত্র ১৪ জন ছাত্র নিয়ে তিনি শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেন এবং নানাবিধ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি হতাশ হননি। শিক্ষকসুলভ আচরণেব দ্বারা মে গ্রামীণ মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হন এবং এক বৎসরের মধ্যে তাঁর ছাত্রসংখ্যা হয় ১১০। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মে পরবর্তীকালে অনেকগুলি শাখা-স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৫ সালে ১৫টি (ছাত্রসংখ্যা ১,০৮০), ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩০টি (ছাত্রসংখ্যা ২,৬৬২), ১৮১৭ সনে ৩৫টি (ছাত্রসংখ্যা ২,০৯৫), ১৮১৮ সালে ৩৬টি (ছাত্রসংখ্যা ৩,২৫৫) বাংলা-স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৮] ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন ছিল দরিদ্রশ্রেণী থেকে আগত। সচ্ছল পরিবারের অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের বাংলা-স্কুলে পাঠাতে অনিচ্ছুক ছিলেন। স্থানীয় স্বার্থান্বেষী মহল মে-র শিক্ষাপ্রয়াসকে বাধাদানের জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করেছিল। তাঁর অবৈতনিক স্কুলগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য কিছু জমিদার পাল্টা স্কুল স্থাপন করেছিল। এমন কি ইংরেজিভাষার পৃষ্ঠপোষক একজন জমিদার স্কুলের জন্য তাঁর

আঙ্গিনা ব্যবহার করতে দিতে অস্বীকার করেছিলেন এই অজুহাতে যে উচ্চতর বর্ণের ছাত্রদের সঙ্গে নিম্নবর্ণের ছাত্রদের একাসনে বসার বিরোধী তিনি। তবুও মে নিরুদ্যম হননি।

কিন্তু তাঁর মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য কোম্পানি-সরকার সচেষ্ট হলেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট হুগলীর জেলা-শাসককে একটি চিঠি লিখে জেনারেল কমিটি জানালেন যে, চুঁচুড়া স্কুলগুলির জন্য সমস্ত রকমের সরকারি অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হল। যে স্কুলগুলি দেশীয় ভাষা-মাধ্যমে ইউরোপীয় শিক্ষাদানের নীতিকে কার্যকরী করে ধর্মনিরপেক্ষ জনশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সাম্রাজ্যরক্ষার স্বার্থে সেই স্কুলগুলির অস্তিত্ব মুছে ফেলবার ব্যবস্থা করা হল। স্কুলগুলির দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' কলকাতার দেশীয় প্রাথমিক স্কুলগুলির মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে টাউন হলের জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী গঠিত 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'র লক্ষ্য ছিল: (১) দেশীয় বিদ্যালয়গুলির মানোন্নয়ন ও সহায়তা-দান; (২) দেশীয় নাগরিকদের আধুনিক জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করার জন্য নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা। স্কুল সোসাইটির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন ১৬ জন ইউ-রোপীয় ও ৮ জন দেশীয় ব্যক্তি। ৪ জন সম্পাদকের মধ্যে ২ জন ইউরোপীয় এবং ২ জন দেশীয়—লে:. আরভিন ও ই. এস. মণ্টেগু এবং রাধাকান্ত দেব ও মীর্জা কাজিম উলি খান। কিন্তু ১৮২০ সালে ৪ জন সম্পাদকের পরিবর্তে দুজন সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়—ডেভিড হেয়ার ও রাধাকান্ত দেব। বাংলাভাষা-চর্চায় উৎসাহ দেবার জন্য স্কুল সোসাইটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, বাংলায় যারা পারদর্শিতা প্রমাণ করতে সক্ষম হবে, ইংরেজিতে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের জন্য পটল-ডাঙ্গার ইংরেজি-স্কুলে অথবা হিন্দু কলেজে তাদের অধ্যয়নের ব্যয় সোসাইটি বহন করবেন। এইভাবে স্কুল সোসাইটি ইংরেজি-প্রাসাদ নির্মাণের পূর্বে মাতৃভাষার কঠিন ভিত্তি গড়তে প্রয়াসী হয়েছিলেন। উইলিয়ম অ্যাডাম স্কুল সোসাইটির বৈজ্ঞানিক ভাষা-নীতির ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন, "দেশের ভাষা-শিক্ষার প্রতি তাঁদের মনোযোগ, জনসাধারণের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশীয় ভাষাকে প্রধান মাধ্যম-রূপে গ্রহণ দেশীয় সমাজ-উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।"[৪৯]

এই পর্বে একদিকে মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু নতুন বাংলা-স্কুল স্থাপিত হয়েছে, অন্যদিকে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রাচীন দেশীয় পাঠশালাগুলিকে সংস্কার করা হয়েছে। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য মাতৃভাষায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিষয়ক পাঠ্যগ্রন্থ ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা স্কুল বুক

সোসাইটির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন ১৬ জন ইউরোপীয় ও ৮ জন দেশীয় ব্যক্তি : (১) স্যার হাইড ইস্ট, (২) জে. এম. হ্যারিংটন, (৩) ডবলিউ. বি. বেলি—সভাপতি, (৪) রে:. কেরি, (৫) রে:. জে. পিয়ার্সন, (৬) রে:. টি. টমসন, (৭) মেজর জে. ডবলিউ. টেলর, (৮) ক্যাপ্টেন টি. রোবাক, (৯) ক্যাপ্টেন এ. লকেট, (১০) ডবলিউ. এইচ. ম্যাকনাটেন, (১১) জি. জে. গর্ডন, (১২) জে. রবিনসন, (১৩) জে. ক্যালডের—কোষাধ্যক্ষ, (১৪) লে:. পি. আরভিন—সম্পাদক, (১৫) ই. এস. মণ্টেগু—সম্পাদক, (১৬) লে:. ডি. ব্রাইস, (১৭) মৌলভী আবদুল ওয়াইজ—সম্পাদক, (১৮) তারিণীচরণ মিত্র—সম্পাদক, (১৯) মৌলভী করম হোসেন, (২০) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, (২১) মৌলভী আব্‌দুল হামিদ, (২২) রাধাকান্ত দেব, (২৩) মৌলভী মোহম্মদ রসিদ এবং (২৪) রামকমল সেন।

ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল স্কুল বুক সোসাইটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য তাঁরা বলেছেন, "ধর্মমূলক পুস্তক প্রকাশের কোনো ইচ্ছা সোসাইটির নেই।"[৫০] তবে এই নিষেধাজ্ঞা 'কোন ব্যক্তির ধর্মীয় মতকে আঘাত না করে দেশীয় সমাজের চরিত্র ও নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য নীতিকথা-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে'[৫১] প্রযুক্ত হবে না। দেশীয় ছাত্রদের নৈতিক মান ও বোধ-শক্তি বৃদ্ধিকল্পে তাঁরা মাতৃভাষায় পুস্তক প্রকাশ করবেন এবং সস্তাদরে কিংবা বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণে প্রয়াসী হবেন।

ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে তাঁদের প্রকাশিত ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বর্ণমালা, নীতিকথা ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তকাবলীতে। প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্যে রাধাকান্ত দেবের রচিত 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' (১৮২১) মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বাংলা বর্ণমালা ও সংখ্যা শেখার জন্য এই গ্রন্থটি হল বাঙ্গালি রচিত প্রথম মুদ্রিত শিশুশিক্ষা-গ্রন্থ। ২৮৮ পৃষ্ঠার এই বইতে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ এবং দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় কিংবা তার বেশি অক্ষর সমন্বয়ে গঠিত শব্দ, বাক্য, ছোট ছোট অনুচ্ছেদ দেওয়া হয়েছে। তারপরে আছে ব্যাকরণ—বিশুদ্ধ বানান, সন্ধি ও বাক্য-গঠনের নিয়মাবলী বর্ণিত হয়েছে। ভূগোল ও ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের শেষে আছে ওজন, মাপ ও নামতা। আলোচ্য গ্রন্থ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, রাধাকান্ত দেব মাতৃভাষায় শিক্ষা-গ্রহণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। 'তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমেই জনসাধারণকে সুশিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজিভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-অর্জনের বিষয়টি তিনি সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ স্বল্প ইংরেজি-জ্ঞান যুবকদের কৃষি ও শিল্প থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাবে এবং তাদের সরকারী ও সওদাগরি অফিসে কেরাণী হতে প্রলুব্ধ করবে। তাতে বেশির ভাগ যুবকেরা হতাশায় ভুগবে এবং ইংরেজিভাষার স্বল্প জ্ঞান তাদের অহঙ্কারী করে তুলবে। তারা আর নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যে ফিরে আসতে পারবে না এবং ভবঘুরেতে পরিণত হবে।'[৫২]

রাধাকান্তের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ইংরেজিভাষা কিছুসংখ্যক মানুষকে কেরাণী করেছে, ব্যবসায়ী-শিল্পপতি করেনি ; তাঁরা আত্মকেন্দ্রিক হয়েছেন, দেশ ও জাতির সঙ্গে অপরিচয়ের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে উঠেছে। শিক্ষার মাশুল গুনেছে সমাজ, বিনিময়ে ইংরেজিভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিত্তশালী হয়ে উঠেছেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : গণিত (১৮১৭) —রে:. মে ; পাঠশালার বিবরণ (১৮১৭) — জে. ডি. পিয়ার্সন ; জ্যোতিষসার সংগ্রহ (১৮১৭)—রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ; নীতি কথা (১৮১৮) —তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন ; মনোরঞ্জনেতিহাস (১৮১৯) —তারাচাঁদ দত্ত ; ঔষধসার সংগ্রহ (১৮১৯) —রামকমল সেন ; গণিতাঙ্ক (১৮১৯) —রে:. হার্লে ; পত্রকৌমুদী (১৮২০) -- জে. ডি পিয়ার্সন ; ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ (১৮২০)—জে. ডি. পিয়ার্সন ; বাক্যাবলী (১৮২০) -- জে ডি. পিয়ার্সন ; হিতোপদেশ (১৮২০) —রামকমল সেন ; পশ্বাবলী (১৮২২) —ডবলিউ. এইচ. পিয়ার্স ; ব্যাকরণসার (১৮২৪) —মাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য ; ভূগোল এবং জ্যোতিষ বিষয়ক কথোপকথন (১৮২৭) — জে. ডি. পিয়ার্সন ; ভূগোল বৃত্তান্ত (১৮২৮) —ডবলিউ. এইচ. পিয়ার্স ; সত্য ইতিহাস সার (১৮৩০) —উইলিয়ম ইয়েটস ; প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় (১৮৩০) —উইলিয়ম ইয়েটস ; সংক্ষিপ্ত সদ্বিদ্যাবলী (১৮৩৩) —কালীকৃষ্ণ দেব ; গ্রীক-দেশের ইতিহাস (১৮৩৩) —ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ; গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩) —রামমোহন রায় ইত্যাদি। [৫৩]

১৮১৭ খ্রী: থেকে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকগুলিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা প্রয়োজন। প্রথম পর্যায় : ১৮১৭ খ্রী: থেকে ১৮২১ খ্রী: এবং দ্বিতীয় পর্যায় : ১৮২১ খ্রী: থেকে ১৮৩৫ খ্রী:। প্রথম পর্যায়ের চার বৎসরে স্কুল বুক সোসাইটি নিজেরা এবং শ্রীরামপুর মিশনের সাহায্যে ইংরেজি-বই সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ৫৪ টি পুস্তকের ১,৫০, ৯৭১ কপি প্রকাশ করেছেন। এগুলির মধ্যে বাংলাভাষায় মুদ্রিত হয়েছিল ২৪টি পুস্তক (মোট কপি ৯৮,২৫০) এবং ইংরেজিতে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা মাত্র ৪টি (মোট কপি ৪, ৮২২)। দেশের মানুষের মনে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত হওয়ার আগ্রহ কী বিপুল পরিমাণে ছিল তা বাংলা ও ইংরেজিতে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা থেকে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু তারপর থেকে ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে।

১৮২২ ও ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা-গ্রন্থ এবং ইংরেজি-গ্রন্থের মুদ্রিত কপির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৬, ৪৫১ ও ১.৫০০ ; কিন্তু সেখানে ১৮৩৪ ও ১৮৩৫ সালের চিত্র ভয়াবহ —মাত্র ৭টি বাংলা-গ্রন্থের মুদ্রিত কপির সংখ্যা ৯, ৭৫০, আর ১৬টি ইংরেজি-গ্রন্থের মুদ্রিত কপির সংখ্যা ২৯,০০০। বাংলা-গ্রন্থের মুদ্রণ-সংখ্যা হ্রাস এবং ইংরেজি-গ্রন্থের মুদ্রণ-সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হল, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত সমাজে

মাতৃভাষায় শিক্ষা-গ্রহণের পরিবর্তে ইংরেজিভাষায় শিক্ষা-অর্জনের ঝোঁক ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থোপার্জন মাতৃভাষায় সম্ভব নয়, ইংরেজিভাষাতেই সম্পদ-বৃদ্ধি ও প্রভাব বিস্তার সম্ভব, তাই ইংরেজিভাষার জন্য মাতৃভাষাকে শীর্ষস্থান ত্যাগ করতে হল। নিচের সারণীতে[৫৪] প্রদত্ত বাংলা ও ইংরেজি পুস্তক বিক্রি ও বিতরণের হিসাব দেখলে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশ থেকে বাংলাভাষা ধীরে ধীরে পিছু হঠছে ; ময়ুর পুচ্ছধারী দাঁড়কাকে দেশ ক্রমেই ভরে উঠছে :

পুস্তক বিতরণ ও বিক্রির হিসাব

বৎসর		বাংলা	ইংরেজি
১৮২২-২৩ (দু বৎসর)	খ্রী:	১১,৭০৪	৮৯৩
১৮২৪-২৫ (১৫ মাস)	,,	৭,৩২৬	৭৫৫
১৮২৬-২৭ (দু বৎসর)	,,	১২,৬৭৪	৪,৩২৭
১৮২৮-২৯ (দু বৎসর)	,,	১০,০৭৪	৯,৬১৬
১৮৩০-৩১ (দু বৎসর)	,,	৮,২৮১	১১,০৬৩
১৮৩২-৩৩ (দু বৎসর)	,,	৪,৮৯৬	১৪,৭৯২
১৯৩৪-৩৫ (দু বৎসর)	,,	৫,৭৫৪	৩১,৬৪৯

অর্থাৎ একদিকে মাতৃভাষা-চর্চার অবনতি, অন্যদিকে ইংরেজিভাষা-শিক্ষার বিপুল আগ্রহ একটি নিষ্করুণ সত্যকেই প্রমাণিত করে। তা হল, একদিকে যেমন মাতৃভাষার অঙ্গন থেকে দরিদ্রশ্রেণীকে ক্রমেই সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে ইংরেজিভাষার বাগানে সাহেবী পোষাকপরা অভিজাত সন্তানদের ভীড় বাড়ছে। তাসত্বেও একজন প্রবীণ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী বলেছেন, "এখানকার 'নবজাগরণে' অবশ্য মাতৃভাষার উপর সমভাবে জোর এসেছিল।"[৫৫]

রামমোহনের সমকালে উপরি-উক্ত মাতৃভাষা-চর্চার বিস্তৃত ইতিহাস থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাংলাভাষা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভার-বহনে ক্রমেই সক্ষম হয়ে উঠছিল। রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়সমূহের বাংলাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং শিক্ষকেরা যাতে এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান-দান করতে পারেন, সেজন্য শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির (পাঠশালা ও মক্তব) মানোন্নয়নের চেষ্টা করা হয়েছে এবং বেসরকারি প্রচেষ্টায় আঞ্চলিক ভাষার বহু নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইভাবে যখন সমগ্র জাতিকে প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত করে নতুন জীবনে দীক্ষিত করার বিপুল কর্মযজ্ঞ চলছিল, তখন রাজা রামমোহন একদিকে ইংরেজি-স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই জাতীয় স্কুল-স্থাপনে সাহায্য করেছেন, অন্যদিকে ইংরেজি-ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের জন্য আমহার্স্টের কাছে চিঠি লিখে দাবি জানিয়েছেন। তারফলে মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঞ্জীবনী স্পর্শে যে-জাতি সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল, ইংরেজিভাষার

সঙ্কোচন-যন্ত্রে সে-জাতির অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করা হল ; জ্ঞানরাজ্যের বহু বিচিত্র সম্ভারে যে-সমাজ সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল, চারদিকে ইংরেজিভাষার দেওয়াল তুলে সে-সমাজকে জ্ঞান-রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হল। বিত্তহীনশ্রেণীকে ঠেলে দেওয়া হল নিশ্চিদ্র ও নীরন্ধ্র অন্ধকারের জগতে। শ্রেণী-শোষণের জোয়াল চেপে বসল তাঁদের কাঁধে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, রাজা রামমোহন ইংরেজিভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের দাবি উত্থাপন করেছিলেন কি উদ্দেশ্যে এবং কাদের স্বার্থে? একজন মার্কসবাদী বামপন্থী বুদ্ধিজীবী বলেছেন, "ইংরেজিভাষায় শিক্ষালাভের প্রশ্নে সেকালের লক্ষ্য এবং রামমোহনের উদ্দেশ্য এক ছিল না।"[৫৬] কিন্তু রামমোহনের কি উদ্দেশ্য ছিল তা তিনি ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু তাঁর উক্তি ইতিহাস-সম্মত নয়। ইতিহাস বলে, সেকালের ভূম্যধিকারীশ্রেণীর লক্ষ্যের সঙ্গে রাজার উদ্দেশ্যের কোনো বিরোধ ছিল না। ভূস্বামীশ্রেণীর মতো রামমোহনও শিক্ষাকে স্বীয় শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন—মাতৃভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের দ্বারা জনশিক্ষা প্রসারের কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। জনশিক্ষার প্রধান হাতিয়ার যে মাতৃভাষা সেবিষয়ে রামমোহন সচেতন ছিলেন। তাই তিনি হিন্দুধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের জন্য মাতৃভাষাকেই হাতিয়ার-রূপে গ্রহণ করেছেন, অন্য কোনো ভাষাকে নয়—সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তক সংবাদ, গোস্বামীর সহিত বিচার, পথ্য-প্রদান, বেদান্ত গ্রন্থ, বেদান্ত সার ইত্যাদি বাংলা পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছেন সংস্কৃতে রচিত কঠ, বাজসনেয়িসংহিতা, তলবকার, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষদ-গুলির বাংলায় গদ্যানুবাদ করেছেন ও 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ এদেশীয় মানুষেরা বাংলায় ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করে যাতে তাঁর ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা সমর্থন করেন, সেকারণে তিনি মাতৃভাষাকে হাতিয়াররূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যখন শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা-মাধ্যমের প্রশ্ন ওঠে, তখন তিনি মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরেজিভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছেন। এমনকি রামমোহন প্রাথমিক-স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের দাবিও করেননি। ভাষা সম্পর্কে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচনা করে একালে মন্তব্য করা হয়েছে, "রামমোহন ইংরেজি, বাংলা, ফার্সিতে কেতাব লিখেছিলেন। তিনি বাংলায় লেখেন ৩৪।৩৫টি বই। তার একটিতেও সমকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেননি। সে আলোচনা করেছিলেন ইংরেজিতে লেখা নিবন্ধাদিতে। অর্থাৎ সেগুলি ইংরেজিশিক্ষিত সংকীর্ণ গণ্ডীভুক্ত বন্ধুবান্ধবদের জন্য রচিত, বৃহত্তর পাঠকসমাজের জন্য নয়।"[৫৭]

অথচ 'আত্মীয়সভা'র সঙ্গে 'ধর্মসভা' ইংরেজিভাষায় শিক্ষালাভের দাবি করলেও 'ধর্মসভা'র নেতা রাধাকান্ত দেব প্রাথমিক-স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। একদিকে তিনি প্রাথমিক-স্তরের ছাত্রদের জন্য 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' রচনা করেছেন, অন্যদিকে তিনি 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'র

সম্পাদক-রূপে বাংলা প্রাথমিক বিদ্যালয়-স্থাপনে অগ্রসর হয়েছেন, হিন্দু কলেজের অধীনে বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন। এই পাঠশালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল —"একটা জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং হিন্দু যুবকদের বাংলাভাষার মাধ্যমে ভারত ও ইউরোপের সাহিত্য-বিজ্ঞান-বিষয়ে শিক্ষাদান করাই হল পাঠশালা-স্থাপনের মূল লক্ষ্য।"[৫৮] 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি'র সদস্য রূপে রাধাকান্ত মাতৃভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যগ্রন্থ-প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

অথচ এসময়ে রামমোহন কলকাতায় ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য 'আত্মীয়সভা' (১৮১৫ খ্রী:) প্রতিষ্ঠা করলেও মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারের জন্য 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭ খ্রী:) কিংবা 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'র (১৮১৮ খ্রী:) সঙ্গে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সম্পর্ক ছিল না। এমন কি রামমোহনের এই জাতীয় কর্মপ্রচেষ্টার কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু রাধাকান্ত দেবের প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ক কর্মপ্রচেষ্টা দেখে প্রশ্ন হতে পারে, রাধাকান্ত কি তাঁর শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছিলেন? না, রাধাকান্ত শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করেননি। ভূম্যধিকারীশ্রেণীর যে-অংশ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁদের চিন্তা-কর্ম সব-কিছুই ছিল সমাজের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীকে কেন্দ্র করে। এই শ্রেণীকে ইংরেজিভাষায় উচ্চশিক্ষিত করার জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক-স্তরের ভিত্তি গঠনের উদ্দেশ্যে তাঁরা কলকাতা-সহ বিভিন্ন শহরে বাংলা পাঠশালা, আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন এবং সেকারণেই ভবানীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় লেখা হয়েছে, "যদ্যপি কোন বালক স্বভাষায় পরিপক্ক হইয়া পরে অন্য ভাষা শিক্ষা করেন"[৫৯] তবেই ধনোপার্জনের পথ প্রশস্ত হবে।

এ-সময়ে যাঁরা মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তাঁরা ইংরেজিভাষায় উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী হলেও ভাষাশিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ়-রূপে গঠনের জন্য প্রাথমিক-স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানে ব্রতী হয়েছেন। রাধাকান্ত দেব ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর উদ্যোগে স্কুল সোসাইটি ও হিন্দু কলেজে বিজ্ঞানসম্মত ভাষানীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। 'স্কুল সোসাইটির স্কুলসমূহের ও হিন্দু কলেজের এই নিয়ম ছিল যে, বাঙ্গালী ছেলেরা আট বৎসর পূর্বে কেহ ইংরেজি শিখিতে পারিবে না। এই বয়সে ছেলেদের একান্তভাবে বাংলা শিক্ষায়ই নিবিষ্ট থাকিতে হইত। আবার, আট বৎসরের পরেও যদি দেখা যাইত তাহাদের বাংলা শিক্ষা আশানুরূপ হয় নাই তাহা হইলে উহাও ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে শিখাইয়া লইবার ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার ভিত্তি পাকা হওয়ায় ইংরেজি শিক্ষায় তাহারা দ্রুত উন্নতি করিতে পারিত।'[৬০] কিন্তু রাধাকান্ত ও তাঁর গোষ্ঠী সকলের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের দাবিতে সোচ্চার

হননি কিংবা ব্রিটিশ-সরকারের ইংরেজিভাষায় শিক্ষাদানের নীতিকে সমালোচনা করেননি। এভাবেই রাধাকান্ত রামমোহনের মতো শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করেছেন।

সংস্কৃত-আরবি ভাষায় প্রাচ্য-শিক্ষা কিংবা ইংরেজিভাষায় পাশ্চাত্য-শিক্ষা নয়, মাতৃভাষায় দেশ ও সমাজকেন্দ্রিক আধুনিক শিক্ষা চাই, 'ইঙ্গরেজী পড়িয়া ইঙ্গরেজ' হওয়া নয়, 'স্বদেশীয় ভাষায় প্রচুর বিদ্যা ব্যুৎপত্তি' অর্জনের জন্য বাংলা-স্কুলের প্রয়োজন —এই দাবির মধ্যে গ্রাম-বাংলার নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিহিত ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ-শক্তি এদেশে জনশিক্ষা-প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে আসেননি; শোষণ-সাম্রাজ্যকে অব্যাহত রাখার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু শিক্ষা-বিস্তারে তাঁরা আগ্রহী। কারণ 'বুর্জোয়াজী... ততটুকু শিক্ষার সুযোগ দেয়, যতটুকু তাদের নিজের স্বার্থে প্রয়োজন।'[৬১] তাই তাঁরা ইংরেজিভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনে আগ্রহী ছিলেন। আর দেশীয় বণিক-জমিদারেরা সমৃদ্ধিলাভের আশায় ইংরেজি-শিক্ষা গ্রহণে উৎসুক ছিলেন। তাঁরাও শ্রেণীস্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের বিরোধী ছিলেন। ব্রিটিশ বণিক ও দেশীয় ভূস্বামীদের স্বার্থ একসূত্রে গাঁথা ছিল বলে এদেশে আধুনিক শিক্ষার বাহন হল ইংরেজিভাষা।

জেনারেল কমিটির নবনিযুক্ত সভাপতি লর্ড মেকলে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে দেশীয় ভূস্বামী ও অভিজাতশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করতে এদেশে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। বিত্তশালী সামন্তশ্রেণীর নেতৃবর্গ মাতৃভাষায় আধুনিক জ্ঞান-চর্চার পরিবর্তে ইংরেজিতে জ্ঞানার্জনের জন্য জনসাধারণের নামে শিক্ষা-আন্দোলন গড়ে তোলায় মেকলে ও তাঁর সহযোগীদের পক্ষে মাতৃঅঙ্গন থেকে মাতৃভাষাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা সহজসাধ্য হয়েছিল। এ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে মেকলে তাঁর বিখ্যাত 'মিনিট'-এ (২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫ খ্রী:) লিখেছেন, "একথা সকলেই স্বীকার করবেন বলে মনে হয় যে, দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁদের উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের আর্থিক সঙ্গতি আছে, তাঁদের জ্ঞান-উন্নয়ন অন্য ভাষার মাধ্যমে করতে হবে, মাতৃভাষায় নয়।"[৬২]

এদেশে ইংরেজিভাষায় ইউরোপীয় শিক্ষাদানের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেকলে বলেছেন, "আমাদের এখন যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করতে —যারা হবে আমাদের এবং আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোককে শাসন করছি সেই শাসিতদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানকারী। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা হবে রক্তে রঙে ভারতীয়, আর রুচিতে, মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।"[৬৩] অর্থাৎ অন্ধকার থেকে আলোর জগতে নিয়ে আসার কোনো মহৎ পরিকল্পনা নয়। ঔপনিবেশিক স্বার্থে একদল হ্যাট-কোট-প্যান্ট পরিহিত দেশীয় 'ইংরেজ-ভক্ত কেরাণী-দোভাষী সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এদেশে ইংরেজি-শিক্ষার প্রস্তাবনা। মেকলে এমন একদল শাসক সমর্থক দেশীয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যাঁরা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের

স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক অটুট রাখবেন। তাই 'ইউরোপের 'এলিট' সমাজ দেশীয় 'এলিট' তৈরি করায় মনোনিবেশ করলেন। তাঁরা সম্ভাবনাময় কিশোরদের বেছে নিলেন। উত্তপ্ত লোহাকে যেমন পিটিয়ে নিজের মনোমত জিনিস তৈরি করা হয় তেমনি তাদেরকে পশ্চিমী সংস্কৃতিতে দীক্ষা দেওয়া হল।'[৬৪] মেকলের নিকটাত্মীয় চার্লস ট্রেভেলিয়ান সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "আমাদের সংরক্ষণে থাকলেই তাঁদের দেশের উন্নয়ন ঘটতে পারে—একথা জানেন বলেই শিক্ষিত ব্যক্তিরা আমাদের অনুরক্ত থাকবেন।"[৬৫] তাছাড়া তাঁর মতে, "এই ইংরেজি ছাঁচে গড়ে-ওঠা মানুষগুলো স্বাধীন কোন দেশীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনায় ভীত সন্ত্রস্ত। কারণ যে বিদেশী শিক্ষা তাঁদের শাসকের কাছ থেকে সুযোগ, অর্থপ্রতিষ্ঠা এনে দিচ্ছে সেই বিদেশী শিক্ষাই ভবিষ্যতে জনগণের শত্রু হিসাবে তাঁদের চিহ্নিত করে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।"[৬৬]

মেকলের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মার্চ তারিখে শিক্ষার বাহন-রূপে ইংরেজিভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে এক ঘোষণায় বলেছেন, "সরকার নির্দেশ দিচ্ছে যে, শিক্ষা-সংস্কারের জন্য জেনারেল কমিটিকে প্রদত্ত সমগ্র অর্থ দেশীয় ব্যক্তিদের ইংরেজিভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে এবং সরকার কমিটিকে অনুরোধ করছে যে, তারা যেন অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের একটি পরিকল্পনা তৈরি করে সরকারের কাছে পেশ করে।"[৬৭]

এই ঘোষণায় উল্লসিত হয়েছেন দেশীয় জমিদার-মধ্যশ্রেণী। দ্বারকানাথ লর্ড ব্রুহামকে লিখেছেন, তারফলে বাংলাদেশের স্কুলসমূহ "দেশের অসামরিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য কোম্পানির শাসনবিভাগের নিম্নতর স্তরে বেশ কয়েকজন সুদক্ষ করণিককে পাঠাতে সমর্থ হয়েছে। **এরাই হল সরকারের কার্যসিদ্ধির সর্বোৎকৃষ্ট উপায় ও হাতিয়ার।**"[৬৮] (বড় হরফ লেখকের)। ইংরেজি-ভাষায় আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি করার পশ্চাতে জমিদার-মধ্যশ্রেণীর যে স্বদেশ-হিতৈষণার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, তা দ্বারকানাথের উক্তিতে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

ঔপনিবেশিক স্বার্থে একদল শিক্ষিত তল্পিবাহক তৈরি করার জন্য ইংরেজি-শিক্ষাকে বিত্তশালী ভূস্বামী ও ধনিক-বণিকসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হল; দেশের জনসমাজের বৃহত্তম অংশ কৃষক-সাধারণ রইলেন অজ্ঞতার অন্ধকারে; আজো তাঁরা অক্ষর-জ্ঞান থেকে বঞ্চিত, প্রাথমিক শিক্ষা তাঁদের কাছে দুর্লভ, উচ্চশিক্ষা বা ইংরেজি-শিক্ষা তাঁদের কাছে কল্পনাবিলাস মাত্র। তাই একালের একজন প্রবীণ মার্কসবাদী বামপন্থী বুদ্ধিজীবী বলেছেন, "কিন্তু সর্বসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার কথা কেউ ভাবতে পারেননি। ধর্ম প্রচারই বা কতদূর দূরান্তরগামী ছিল? রামমোহন এমন কি মহর্ষিও তাঁদের পাল্কী-বেহারাকে 'ব্রাহ্মসমাজে' নেবার বা ব্রাহ্ম করার কথা ভাবতেন কি? সুতরাং

তাদের ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর কথা ভাববার প্রশ্নই ওঠে না।"৬৯ ভূসম্পত্তির ক্রমবৃদ্ধি ও নিরাপত্তার স্বার্থে ভূস্বামী-মধ্যস্বত্বাধিকারীশ্রেণী যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদের দাবি উত্থাপন করেননি, তেমনি রায়ত-কৃষকের সন্তানকে তাঁরা সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি এবং পরবর্তীকালে তাঁরা বাংলাদেশের গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের বিরোধিতা করেছেন।

রাজা রামমোহন নিরক্ষর কৃষকের ঘরে আধুনিক শিক্ষার আলো পৌঁছিয়ে দেবার জন্য কোনো আন্দোলন করেননি কলকাতা শহরে ইংরেজি-স্কুল স্থাপন এবং ইংরেজি-শিক্ষা প্রসারে সাহায্য করলেও নিজের জমিদারিতে বা গ্রামে কোনো স্কুল স্থাপন করেননি। সামন্ত-শোষণ থেকে রক্ষার জন্য কৃষককে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার কোনো পরিকল্পনা রাজা রামমোহনের ছিল না। তাঁর ইংরেজি-শিক্ষা প্রবর্তনের আন্দোলনে কৃষকসমাজের কোনো স্থান ছিল না। তাই উনিশ শতকের নায়কদের ইংরেজি-শিক্ষার আন্দোলন ছিল দেশীয় বণিক-জমিদারদের আত্মবিস্তার ও আত্মসংহতির আন্দোলন। অন্যদিকে, বাংলার কৃষক ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হারিয়েছেন জমির মালিকানা, আর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা হারালেন মুখের ভাষায় শিক্ষাগ্রহণের অধিকার।

৭

নীল-চাষী ও নীলকর

উনিশ শতকের ভূস্বামীশ্রেণী থেকে আগত নায়করা বাংলার রায়ত-কৃষকদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ-সম্পর্ক গড়ে না তুলে কোম্পানির কর্মচারী ও ও শ্বেতাঙ্গ-বণিকদের সঙ্গে মৈত্রী-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যেমন সাম্রাজ্যিক স্বার্থে তাঁদের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেছেন, ইংরেজিভাষাকে আধুনিক শিক্ষার মাধ্যম-রূপে ঘোষণা করেছেন, তেমনি দেশীয় জমিদার-বণিকরা জাতীয় স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আত্মবিস্তার ও আত্মসংহতিকল্পে তাঁরা বিদেশী বণিকদের স্বার্থে বিভিন্ন বিষয়ে আন্দোলন করেছেন। নীলচাষ ও নীলকরদের বিষয়ে তাঁদের ভূমিকা এদেশে বিদেশী শোষণকে দৃঢ়তর ও তীব্রতর করেছে, বাংলাদেশ রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। নীলচাষের ইতিহাস রক্তক্ষরণের ইতিহাস।

বাংলাদেশে নীলচাষ আরম্ভ হয় ১৭৭২ সালে। এই বছরে লুই বোনদ নামে একজন ফরাসী চন্দননগরের নিকটবর্তী গোন্দলপাড়া গ্রামে প্রথম নীলকুঠি স্থাপন করেন। ১৭৭৩ সনে তিনি চুঁচুড়ার কাছে তালডাঙ্গায় আর একটি নীলকুঠি প্রতিষ্ঠা করেন। এসময়ে ক্যারেল ব্লুম নামে একজন ইংরেজ নীলের চাষ আরম্ভ করেন এবং দুজন ফরাসী চিকিৎসকের উদ্যোগে হাওড়ায় নীলকুঠি স্থাপিত হয়। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্লুম লাভজনক নীলের ব্যবসার প্রতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং নীলচাষ ব্যাপকভাবে আরম্ভ করার জন্য আবেদন জানান। ১৭৮৩ সালের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন জেলায় অনেকগুলি নীলকুঠি স্থাপিত হয় এবং এই বছরে বাংলাদেশ থেকে ইংলণ্ডে ১২০০ থেকে ১৩০০ মন নীল রপ্তানি হয়।[১]

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে উন্নত বস্ত্র-শিল্প

গড়ে ওঠার জন্য নীলের চাহিদা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। তারফলে ভারতে নীলচাষ ব্যাপকভাবে করার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এগিয়ে আসে এবং হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি জেলায় অসংখ্য নীলকুঠি স্থাপিত হয়। কোম্পানি ১৭৯০ সালে নীলচাষে ১ লক্ষ সিক্কা টাকা বিনিয়োগ করেছিল। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর-জেনারেলকে বলা হয়েছিল যে, কেবলমাত্র কোম্পানি-শাসিত অঞ্চলে নীলচাষে উৎসাহদানের জন্য অর্থ-বিনিয়োগ করাই হল উদ্দেশ্য। ১৭৯৫ সনে নিম্নলিখিত ব্যবসায়ে কোম্পানির অর্থ-বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৮৭, ৭৭, ৮১৬ সিক্কা টাকা—তাঁতবস্ত্রে ৪৭,৭৪,৫৯১ টাকা, সিল্ক বস্ত্রে ১৭,২৪,১৩৭ টাকা, চিনি ১৯,৪১,২১৩ টাকা, শোরা ৩,৩৭, ৮৭৫ টাকা। এগুলি ছিল কোম্পানির প্রধান ব্যবসা। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবসায়ে অর্থ-বিনিয়োগের চরিত্র বদলে গেল এবং নীল-ব্যবসায়ে ১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করাই উত্তম নীতি বলে বিবেচিত হল। কারণ সেসময়ে ইউরোপে বার্ষিক নীল-ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড।[২] ১৮০৩ সাল পর্যন্ত নীলচাষের জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন হত, তার প্রায় সবই কোম্পানি অল্প সুদে নীলকরদের অগ্রিম দিতেন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নীলচাষের জন্য নামমাত্র সুদে কোম্পানির ঋণদানের পরিমাণ ছিল এক কোটি সিক্কা টাকা। বিনিময়ে কোম্পানি অল্পমূল্যে উৎপন্ন নীলের সবটাই কিনে নিতেন এবং লণ্ডনের বাজারে চড়া দরে বিক্রি করতেন; তাঁদের ক্রয়মূল্য ছিল প্রতি পাউণ্ড এক টাকা চার আনা ও বিক্রয়মূল্য ছিল প্রতি পাউণ্ড পাঁচ থেকে সাত টাকা। নীল থেকে তাঁদের বাৎসরিক মুনাফা ছিল দশ-বারো লক্ষ টাকা।

নীল-ব্যবসা প্রচণ্ড লাভজনক হওয়ায় এদেশে নীলচাষ এত ব্যাপক হয়ে উঠে-ছিল যে, ১৮১৫-১৬ সনে কেবলমাত্র বাংলায় এক লক্ষ আটাশ হাজার মন নীল উৎপন্ন হয়েছিল। তার পূর্বে ১৭৯০ সনে ইংলণ্ড নীল আমদানি করেছিল ১,৮৪০, ৮১১ পাউণ্ড। তার মধ্যে ৬২৬,০৪২ পাউণ্ড আমেরিকা থেকে; ৩৫৫,৮৫৯ পাউণ্ড স্পেন থেকে; ১২৬,২২৭ পাউণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে; ৫৩১,৬১৯ পাউণ্ড সমগ্র এশিয়া থেকে। কিন্তু ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ থেকেই ২,৯৫৫, ৮৬২ পাউণ্ড নীল রপ্তানি হয়েছে ইংলণ্ডে।[৩] এদেশের নীলের জন্য কোম্পানি ও ব্যক্তিগত-ব্যবসায়ী উভয়েই মূলধন নিয়োগ করলেও কোম্পানি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সমস্ত নীল কিনে নিয়ে বিশ্বের বাজারে রপ্তানি করে সারা পৃথিবীর চাহিদা মিটিয়েছে। এইভাবে আফিম, লবণ, বস্ত্র, রেশম ইত্যাদি অন্যান্য ব্যবসার মত নীল-ব্যবসাও কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ে পরিণত হল।

নীলচাষ করে রাতারাতি ধনী হওয়ার জন্য কোম্পানির অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে নীলকুঠি স্থাপন করতে থাকেন। এঁদের অপরিমিত মুনাফা লুঠতে দেখে দেশীয় জমিদারদের অনেকে নীলকর হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে নড়াইলের জমিদাররা এবং রামমোহন-সুহৃদ ও রবীন্দ্রনাথের পিতামহ

প্রিন্স দ্বারকানাথ অগ্রণী ছিলেন। দ্বারকানাথের অনেকগুলি নীলের কারখানা ছিল। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপীয়দের মালিকানায় ২৭১টি ও দেশীয় ব্যক্তিদের ১৪০টি নীলের কারখানা ছিল।[৪] এই সমস্ত দেশী ও বিদেশী 'প্রাইভেট মার্চেন্ট'-দের মোট মূলধন ও মুনাফার পরিমাণ কোম্পানির চেয়ে বেশি ছাড়া কম ছিল না। দেশী-বিদেশী বণিকেরা সম্মিলিতভাবে যে-সমস্ত এজেন্সী হাউস গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরাও নীলের ব্যবসায়ে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৮০২ সালে নীল-রপ্তানির ক্ষেত্রে কোম্পানি যে-অর্থ বিনিয়োগ করেছিল, তার তুলনায় তিনগুণ বেশি অর্থ লগ্নি করেছিল এজেন্সী হাউসগুলি।[৫] অধিকাংশ ইউরোপীয় নীলকর নীল-চাষের জন্য এজেন্সী হাউসের ঋণের উপরে নির্ভর করত।

লণ্ডনস্থিত কোর্ট অব ডিরেক্টর্স কোম্পানির নিজস্ব নীলকুঠি স্থাপনের পরিকল্পনাকে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেননি। তাঁদের হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লণ্ডনের বাজারে নীল-রপ্তানির আনুমানিক মূল্য ছিল ৭৬ লক্ষ টাকা এবং সেকারণে তাঁরা চেয়েছিলেন যে, কোম্পানির অগ্রিম-প্রদান উক্ত মূল্যের ¼ অংশ —২০ লক্ষ টাকা হওয়া উচিত। একথাই তাঁরা ১৮১১ সনে লিখেছিলেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা নীল-ব্যবসায়ে ৩০ লক্ষ টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন। কোম্পানি নীল কিনেছিলেন ১৮২৫-২৬ সালে ৪০,২২,৩০৫ টাকা, ১৮২৭ সনে ৩০,০০,০০০ টাকা, ১৮২৮ সালে ৪০,০০,০০০ টাকা, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৩০,০০,০০০ টাকা। বেসরকারি নীল-ব্যবসার সঠিক হিসাব করা সম্ভব নয়। সমগ্র দেশে নীল-চাষের জন্য বার্ষিক ব্যয় ২ কোটি টাকার বেশি ছিল। এই টাকার মধ্যে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিল কলকাতার ৬টি প্রধান এজেন্সী হাউস — আলেকজাণ্ডার অ্যাণ্ড কোং, পামার অ্যাণ্ড কোং, কলভিন অ্যাণ্ড কোং, ফার্গুসন অ্যাণ্ড কোং, ম্যাকিনটোস অ্যাণ্ড কোং এবং ক্রুটেনডেন অ্যাণ্ড কোং।[৬] নীল-চাষের এই প্রথম পর্বের ইতিহাস থেকে বুঝা যায় যে, অষ্টাদশ শতকের শেষ দশক থেকে উনিশ শতকের প্রথম-চতুর্থাংশের অর্থাৎ ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাণিজ্যফসল নীল বাংলার উর্বরা ধানী-জমি কতদূর পর্যন্ত জবর-দখল করেছিল এবং নীলকর ও নীলকুঠির প্রভাব বাংলার গ্রামে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। বাংলাদেশে এমন কোনো জেলা নেই যেখানে নীলকর-দস্যুদের অত্যাচার-উৎপীড়নের কথা জনকাহিনীতে পরিণত হয়নি। প্রবল শীতের শিহরণের মত নীলকর-সাহেবদের পীড়ন-লুণ্ঠনের কাহিনী শুনলে উনিশ শতকের গ্রামীণ মানুষের শরীর শিউরে উঠত।

নীল-চাষ দুভাবে করা হত —নিজ আবাদী ও রায়তী আবাদী। যে-সমস্ত নীলকর দেশীয় জমিদারদের কাছ থেকে পাঁচ বৎসরের জন্য জমি পত্তনি নিয়ে সেই জমিতে ক্ষেতমজুর দ্বারা নীল-চাষ করাতেন, তাকে বলা হত 'নিজ আবাদী'। এই পদ্ধতিতে চাষের সমস্ত খরচ নীলকরকে বহন করতে হত। কিন্তু 'রায়তী আবাদী'তে রায়ত বিঘা প্রতি দু টাকা দাদন নিয়ে নিজের জমিতে চাষ করতে

বাধ্য হত এবং চাষের সমস্ত খরচ রায়তকেই বহন করতে হত। 'রায়তী আবাদী'র চেয়ে 'নিজ আবাদী'তে তিনগুণ বেশি খরচ পড়ত বলে অধিকাংশ নীলকর-সাহেবরা 'রায়তী আবাদী'তেই নীল-চাষ করাতেন। তাছাড়া নীলকরেরা রায়তী-স্বত্ব-সহ জমিদারি কিনতেন না। তাঁরা যে-সব জমিদারি পত্তনি নিতেন বা বেনামায় কিনতেন, তার রায়তী-স্বত্ব প্রজারই থাকত; কারণ রায়তের জমিতে, রায়তের খরচে, রায়তকে দিয়ে নীলের চাষ করানো নীলকরদের পক্ষে অধিক লাভজনক ছিল। কিন্তু জমির পত্তনি নিলেও নীলকরেরা আইনত জমির স্বত্বাধিকারী হতে পারতেন না। তাই তাঁদের সাধারণত পাঁচ বছর অন্তত জমির পত্তনি নিতে হত।

এসময়ে ইউরোপীয়দের এদেশে জমিজমা কিনে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার-দান এবং অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার-দানের জন্য শহরের ইংরেজ-বণিকদের সঙ্গে একযোগে রাজা রামমোহন, প্রিন্স দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ সেদিনের জননায়কেরা তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করলেন। তাঁরা মনে করতেন যে, 'সুসভ্য' ইংরেজদের সংশ্রবে এসে 'অসভ্য' ভারতবাসীরা সভ্য হয়ে উঠবে এবং ইউরোপীয়দের অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে; কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন যে, নীল-চাষ এদেশের পক্ষে মঙ্গলজনক এবং নীলকরেরা নীল-চাষ করে এদেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে। তাই তাঁরা দাবি করেছিলেন যে, এদেশে নীলকরদের জমির মালিকানা দেওয়া হোক অর্থাৎ শ্বেত-জমিদার সৃষ্টি করা হোক।

শ্বেতাঙ্গ-জমিদার সৃষ্টি করার দাবির সমর্থনে রামমোহন-দ্বারকানাথ-প্রসন্নকুমারের পৃষ্ঠপোষিত 'সম্বাদ কৌমুদী', 'বঙ্গদূত', 'বেঙ্গল হেরাল্ড', 'বেঙ্গল হরকরা', 'রিফর্মার' ইত্যাদি পত্রিকাগুলি এগিয়ে এল। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ নভেম্বর-এ অনুষ্ঠিত টাউন হলের জনসভা থেকে ব্রিটিশ-পার্লামেণ্টের কাছে এদেশে ইংরেজদের জমিজমা কিনে বসবাসের অধিকার-দানের জন্য আবেদন জানানো হল। এই আন্দোলন ইংরেজিতে 'কলোনাইজেসন মুভমেণ্ট' (Colonisation Movement) নামে ইতিহাসে স্থানলাভ করেছে। নীলকর-সাহেব ও অন্যান্য বাগিচা-শিল্পের ইউরোপীয় মালিকদের এদেশের জমিদার করার জন্য রামমোহন-দ্বারকানাথের পৃষ্ঠপোষিত আন্দোলনের বিস্তৃত পর্যালোচনা প্রয়োজন। কারণ সাম্প্রতিককালে পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবীমহলের কেউ কেউ রামমোহন-দ্বারকানাথের এই কাজকে সমর্থন করতে গিয়ে নীলকরদের অমানুষিক কৃষক-শোষণ এবং নির্লজ্জ ও কুৎসিততম আচরণের বিষয়টিকে লাঘব করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। যেমন রামমোহনের দ্বিজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "নীলের চাষ শুরু হতেই দেশের মধ্যে দু' রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল —ভালো নীলকরের আশপাশের লোকেদের আর্থিক স্বাচ্ছল্য

স্পষ্টতর হয়ে উঠল ; কিন্তু অত্যাচারী দুর্বৃত্ত জমিদারদের ন্যায় নীলকরের অভাব ছিল না, সেখানে শোষণ পেষণ পুরোদস্তুর চলত। আমরা নীল-চাষের এই নঙাত্মক দিকটার সঙ্গে সুপরিচিত। কিন্তু industrialization-এর অপর দিকটার প্রতি মনোযোগ দিইনি 'নীলদর্পণে'র একপেশে কড়া বাস্তব রূপটা পড়ে।"[৭] এই ধরণের কথা একালে কিছুদিন আগে বলেছেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন' গ্রন্থে এবং সেকালে রামমোহন-দ্বারকানাথ বলেছেন জনসভায় ও বিভিন্ন পত্রিকায় লিখিত চিঠিতে-প্রবন্ধে। সুতরাং ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের জন্য সেদেশের শিল্পপতিরা যে ভারতে অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার দাবি করেছিলেন সেই দাবির প্রতি সমর্থন জানানো এবং তা নিয়ে আন্দোলন করা বাংলাদেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছে কিনা, এদেশে জমিদার-রূপে আবির্ভূত হওয়ার সপক্ষে নীলকরদের সদর্থক ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল কিনা এবং 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকরদের 'একপেশে কড়া' সমালোচনা করা হয়েছিল কিনা ইত্যাদি প্রশ্নগুলিকে সতর্কতার সঙ্গে তথ্যনিষ্ঠ বিচার করতে হবে।

নীল-যুগের ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায়, উৎকট মুনাফা-লালসায় উন্মত্ত নীলকর-দানবদের নির্মম উল্লাস, আর শোনা যায়, অসহায় নীল-চাষীদের মৃত্যুকাতর আর্তনাদ। কোথাও নীলকরদের সদর্থক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না। সেকালের সংবাদপত্রগুলি তার সাক্ষী। তবে সাক্ষীদের সাক্ষ্য শোনার পূর্বে নীলকরদের সম্পর্কে রামমোহন-দ্বারকানাথের বক্তব্য জানা প্রয়োজন।

নীলকর কর্তৃক বলপূর্বক ধানী জমি দখলের সমালোচনা করে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকা লিখেছেন যে, ইতোমধ্যেই নীলকররা ধানের জমি দখল করে সেখানে নীলচাষ করছে এবং তারফলে দেশে চালের উৎপাদন কমে যাচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে লোকের দুঃখ-কষ্টও বেড়ে যাচ্ছে,।[৮] তার উত্তরে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারির 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকায় 'একজন জমিদার' নামে লিখেছেন, "এ দেশে যাঁর ভূসম্পত্তি আছে এবং যিনি নিজে তাঁর জমিদারী দেখাশোনা করেন তাঁরই কাছে একথা সুবিদিত যে নীলচাষের জন্য কী বিরাট পরিমাণ পতিত জমিতে আবাদ হয়েছে এবং নীলচাষের মালিকরা যে দেশ জুড়ে টাকা ছড়াচ্ছেন তাতে দেশের নিম্নশ্রেণীরা কেমন স্বচ্ছন্দে দিনপাত করছে। আগেকার দিনে যে সব চাষী জমিদারের জবরদস্তিতে বিনামূল্যে বা অল্প পরিমাণ ধানের বিনিময়ে কাজ করতে বাধ্য হত তারা এখন নীলকরদের আওতায় খানিকটা স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে ; তারা প্রত্যেকেই নীলকরদের কাছ থেকে মাসিক চার টাকা বেতন পাচ্ছে এবং অনেক মধ্যবিত্ত যারা নিজেকে ও পরিবারকে প্রতিপালন করতে পারত না তারা নীলকরদের দ্বারা উঁচু বেতনে সরকার প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হচ্ছে। এখন তারা জমিদারের বা বেনিয়ার খামখেয়ালি ও মর্জি দ্বারা নির্যাতিত হয় না।"[৯]

বাংলাদেশে ইউরোপীয়দের বসবাসের সপক্ষে ও নীলকরদের সমর্থনে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আগস্ট 'জন বুল্' পত্রিকায় 'বেন ব্লক, আই পি,' নামে জনৈক নীলকরের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিতে বলা হয়, "একথা সবাই জানে যে, যেখানে নীলকরেরা বসবাস করছেন সেখানে গত পনেরো বছরের মধ্যে মজুরদের মজুরি দ্বিগুণ হয়েছে ও জমির খাজনাও সে অনুপাতে বেড়েছে।"[১০] কলকাতা শহরের বড় বড় বিদেশী ব্যবসায়ী ও কিছু দেশীয় জমিদার ১৮২৯ সালের ২৮ জানুয়ারিতে গভর্ণর-জেনারেলের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে দাবি করলেন যে, এদেশে ইউরোপীয়দের গ্রামাঞ্চলে জমি কেনার অধিকার দেওয়া হোক। লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি তাঁদের প্রস্তাব গ্রহণ করে কোর্ট অব ডিরেক্টর্স-এর কাছে সেই মর্মে সুপারিশ করলেন।

অবশ্য লর্ড আমহার্স্ট ১৮২৪ সালে সর্বপ্রথম জমি ইজারা নিয়ে ইউরোপীয়দের বসবাস করার অধিকার দিয়েছিলেন যখন তিনি কফি-উৎপাদকদের এবং তারপরেই তুলা ও আখ-বাগিচার ইউরোপীয় মালিকদের জমি ইজারা দিলেন।[১১] কিন্তু বাংলাদেশের একদল জমিদার নীলচাষ ও এদেশে নীলকরদের জমি কেনার অধিকার-দানের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কিছু বনেদী জমিদার ছিলেন। রামমোহন-দ্বারকানাথের উদ্যোগে বেন্টিঙ্কের সমর্থন-সহ যে-আবেদনপত্র ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের কাছে পাঠানো হয়, তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এই জমিদারগোষ্ঠী পাল্টা আর-একখানি আবেদনপত্র পার্লামেন্টে পাঠালেন। এই আবেদনপত্রে তাঁরা বলেছেন, "যে সব জেলায় নীলকররা বা অন্যান্য লোকেরা নিজেদের বাসস্থান স্থাপন করেছেন সেখানে জনসাধারণ অন্যান্য স্থানের জনসাধারণের চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, কেননা নীলকররা বলপূর্বক ঐসব জমি দখল করেছেন এবং ধানগাছ নষ্ট করে নীলচাষ করছেন (ধানের উৎপাদন কমে যাওয়ার এবং অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসের অভাবের তাই কারণ।)। তাঁরা গবাদি পশু আটকে রাখেন এবং দরিদ্রদের কাছ থেকে বলপূর্বক অর্থ আদায় করেন। .. যদি তাঁদের এখানকার জমিদারীর বা ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে বসবার অধিকার দেওয়া হয় তাহলে এদেশের জমিদার ও রায়ত সমূলে ধ্বংস হবে। ভারতের অধিবাসী বিশেষ করে যাঁদের পদমর্যাদা আছে বা যাঁরা উচ্চশ্রেণীভুক্ত—ভূসম্পত্তি ব্যতীত তাঁদের জীবিকার্জনের অন্য কোন পথ নেই। ...এই অবস্থায় যদি তাঁদের জমিদারী (যা বকেয়া খাজনার জন্য প্রকাশ্য ভাবে নীলাম হতে পারে) বিদেশী দ্বারা ক্রয় করতে দেওয়া হয় তবে জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য এবং পদমর্যাদা রক্ষার্থে তাঁদের অত্যন্ত দুঃখে কষ্টে দিনযাপন করতে হবে।"[১২]

বিরোধী ভূস্বামী-গোষ্ঠীর স্মারকলিপির বক্তব্য খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন প্রিন্স দ্বারকানাথ। তিনি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ মার্চ 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় পুনরায় 'জনৈক জমিদার' নামে এক দীর্ঘ পত্র লিখে এদেশে নীলকরদের বসবাসের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাঁদের সাধুবাদ জানালেন। দ্বারকানাথের বক্তব্যকে

সমর্থন করে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সনের ৩০ মে লণ্ডনে কোম্পানির 'কোর্ট অব ডিরেক্টর্স'-এর কাছে রিপোর্ট পাঠাতে গিয়ে বলেছেন, "আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, নীলকরেরা যে-উপকার চারিদিকে বিস্তার করেছে তার তুলনায় তাদের কদাচিৎ দুর্ব্যবহার ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কৃষিব্যাপারে জেলাগুলির যা উন্নতি সাধিত হয়েছে তার বেশির ভাগই সেখানকার নীলকরদের দ্বারা সাধিত হয়েছে। সাধারণভাবে একথা সত্য বলে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেক নীল-কারখানা উন্নতির কেন্দ্র। যে-সব লোক নীলের কারখানায় কাজ করে তাদের ও আশপাশের লোকদের উন্নতি সাধন করে নীলের কারখানা।"[১৩]

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ নভেম্বর-এ কলকাতার ইংরেজ ও ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একসঙ্গে মিলে টাউন হলে সভা করার জন্য শেরিফের কাছে অনুমতি চেয়ে যুক্ত দরখাস্ত করলেন। উক্ত সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁরা বললেন যে, ইংলণ্ডে নতুন সনদ প্রণয়নের সময়ে যাতে ভারতের ও চীনের বাণিজ্যে সমস্ত বাধা-নিষেধ তুলে দিয়ে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া হয় এবং ভারতের বাণিজ্যে ও কৃষিকার্যে ব্রিটিশ-মূলধন ও দক্ষতা বিনা বাধায় নিয়োগ করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়, সেজন্য তাঁরা ব্রিটিশ-পার্লামেন্টের কাছে দরখাস্ত পেশ করতে চান। ইংরেজদের সঙ্গে যে-সমস্ত বাঙ্গালী এই দরখাস্তে স্বাক্ষর করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধামাধব ব্যানার্জী, কাশীনাথ রায়, রঘুরাম গোস্বামী, প্রমথনাথ রায়, রামরতন বোস, রামচাঁদ বোস, আশুতোষ দে, রাধাকৃষ্ণ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বড়াল, রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ। এই সভা ১৮২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়।[১৪]

এই সভায় প্রিন্স দ্বারকানাথ আলোচ্য বিষয়ের প্রতি সমথন জানিয়ে বলেছেন, "আমি দেখেছি, নীলের চাষ ও ইউরোপীয়দের বসবাস দেশের ও দেশের সমস্ত শ্রেণীর লোকের প্রভূত উপকার সাধন করেছে। জমিদারেরা ধনী হয়েছেন ও উন্নতি করেছেন, চাষীদের অবস্থাও অনেক উন্নত হয়েছে। যেসব জায়গায় নীলের চাষ নেই ও নীলের কারখানা নেই সেসব জায়গার অধিবাসীদের চেয়ে তাদের অবস্থা অনেক ভালো হয়েছে। নীলের চাষ যেখানে হচ্ছে তার কাছাকাছি জায়গার জমির দাম বেড়ে গেছে ও চাষবাসেরও খুব দ্রুত উন্নতি হয়েছে।"[১৫]

উক্ত সভার প্রস্তাব সমর্থন করে রাজা রামমোহন বলেছেন, "নীলকরদের সম্বন্ধে আমি বলতে পারি যে, বাংলা ও বিহারের কয়েকটি জেলায় নীলকুঠিগুলির কাছাকাছি অঞ্চলে আমি ঘুরেছি। আমি দেখেছি যে, নীলকুঠির আশেপাশের বাসিন্দারা নীলকুঠি থেকে দূরের জায়গার লোকদের চেয়ে ভালো কাপড় পরে ও ভালো অবস্থায় বাস করে। নীলকরেরা আংশিকভাবে ক্ষতি করে থাকতে পারে, কিন্তু সব দিক বিচার করে বলা যেতে পারে যে, সরকারি ও বেসরকারি সব শ্রেণীর ইউরোপীয়দের চেয়ে এই নীলকরেরা এদেশের সাধারণ লোকের অনেক বেশি উপকার করেছে।"[১৬]

কিন্তু উক্ত সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ও বিরোধী জমিদারগোষ্ঠীর দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে এই বছরের ডিসেম্বর মাসে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় যে-লেখা প্রকাশিত হয়, দ্বারকানাথ তার প্রতিবাদ করেন। তাঁর দুটি চিঠি ১৮৩০ সালের ১ জানুয়ারি ও ১০ জানুয়ারি 'নিরপেক্ষ জমিদার' নামে 'সম্বাদ কৌমুদী'তে প্রকাশিত হয়। দ্বারকানাথের পৃষ্ঠপোষিত 'বঙ্গদূত' পত্রিকা রামমোহন--দ্বারকানাথের বক্তব্যকে সমর্থন করে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে লিখেছেন, "মফঃসলে সাহেবলোকেরদিগের নীলের কুঠি হওনে বিস্তর উপকার হইয়াছে অর্থাৎ যে সকল ভূমি কস্মিনকালে আবাদ হইত না এইক্ষণে সেই সকল ভূমির কর অনেক উৎপন্ন হইবায় তালুকদারদিগের পক্ষে কত ভাল হইয়াছে তাহা লিপিবাহুল্য এবং বিশিষ্ট শিষ্ট ব্যক্তিরা যাঁহারা অন্যান্য বিষয় কর্ম্ম করিতে অক্ষম তাঁহারা কুঠিতে চাকরী করিয়া প্রায় অনেকেই ভাগ্যবন্ত হইয়াছেন পরন্তু প্রজাগণের পক্ষেও মঙ্গল হইয়াছে যেহেতুক মুদ্রা উপার্জনে যাহারা অক্ষম ছিল তাহারা নীলোপলক্ষে বিলক্ষণ যোত্র করিয়াছে এবং মজুরলোকদিগের এমত উপকার দর্শিয়াছে যে পূর্ব্বে যাহারা সমস্ত দিবা শ্রম করিয়া তিন পণ কড়ি উপার্জ্জন করিতে পারে নাই তাহারা এইক্ষণে আড়াই আনা তিন আনা পর্য্যন্ত আহরণ করিতেছে। অতএব কহি ইঙ্গরেজ লোকে এ প্রদেশে বাহুল্যরূপে কৃষিকর্ম্ম করিলে উত্তরোত্তর প্রজারদিগের আরো উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।"[১৭]

এদেশে ইউরোপীয়দের বসবাস ও চলাফেরা কোম্পানির বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। কলকাতা থেকে দূর মফস্বলে যেতে হলে তাঁদের লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র নিতে হত। তাই এই লাইসেন্স-প্রথা বাতিল করে বাংলার গ্রামে ইউরোপীয়দের বসবাস করার অধিকার লাভের জন্য যখন তাঁরা আন্দোলন করছেন, তখন এই 'কলোনাইজেসন মুভমেণ্ট'-এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন ডিরোজিওর গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হিন্দু কলেজের কিছু ছাত্র। এই বিষয়ে রচিত 'On the Colonization of India' নামে একটি প্রবন্ধ অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভায় পাঠ করা হয় এবং 'India Gazette' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৮৩০ খ্রী:, ১২ ফেব্রুয়ারি)।[১৮] আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির 'জনদরদী' মুখোস খুলে দিয়েছেন। গ্রীক, রোম, ফিনিসিয়া প্রভৃতি প্রাচীন এবং ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, স্পেন প্রভৃতি আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি কিভাবে তাদের উপনিবেশ সমূহে শোষণ-অত্যাচার করেছে, তার বহু দৃষ্টান্ত উত্থাপন করে ভারত-প্রসঙ্গে তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে তিনি বলেছেন, "ইউরোপীয়গণ ভারতে আসিয়াই এদেশের লোকের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। নানা জাতীয় মদ্য—রাম, জিন, ব্র্যাণ্ডি ও আধুনিক সভ্যতার অনুরূপ অন্যান্য উপকরণ আমদানি করিয়া কিরূপ অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা এই বর্বর জাতিকে সভ্য করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।"[১৯] রাজা রামমোহন এই

প্রবন্ধের কোনো উত্তর দেননি, নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন। এসম্পর্কে বিমানবিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেন, "ভারতীয় জনগণের উপরে একের পর এক অত্যাচারের জলন্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের ফলে রাজা রামমোহনকে নিশ্চয়ই খুব অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। ভারতে উপনিবেশ-স্থাপন সম্পর্কে তিনি তাঁর বিবৃতিতে এর উত্তর দেবার কোনো চেষ্টাই করেননি।"[২০]

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জুলাইর লণ্ডনের পত্রিকায় রামমোহন ভারতে ইউ-রোপীয়দের বসবাসের সপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক নীলকরদের সৎ আচরণের প্রশংসা করে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। ব্রিটিশ-পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির কাছে রামমোহন যে স্মারকলিপি পেশ করেন, তাতে তিনি বলেছেন যে, এদেশে ইউ-রোপীয়রা জমিজমা কিনে স্থায়ী অধিবাসী হলে ভারতবাসীদের নয় রকমের উপকার আর পাঁচ রকমের অপকার হতে পারে। উপকারগুলি হল: (১) ইউরোপীয়দের জ্ঞান-বিজ্ঞান, মূলধন দেশের কৃষিকার্যে নিয়োজিত হলে, যেমন নীলচাষে হয়েছে, তাতে ভারতীয়দের উপকার হবে; (২) ইউরোপীয়দের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ভারতীয়দের মন কুসংস্কার মুক্ত হবে; (৩) যেহেতু ইউরোপীয় বাসিন্দারা শাসকদের সমকক্ষ ও জনসাধারণের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন, তারা সরকারের কাছ থেকে অথবা পার্লামেন্টের কাছ থেকে ভালো জনহিতকর আইন পাশ করিয়ে নিতে পারবে, বিচার-বিভাগেরও যথেষ্ট উন্নতি হবে; (৪) ইউরোপীয়দের উপস্থিতি ও সাহায্য জমিদার, মহাজন ও কর্তৃপক্ষের উৎপীড়ন থেকে প্রজাদের রক্ষা করবে; (৫) ইউরোপীয় অধিবাসীরা তাদের বদান্যতা, রাষ্ট্রীয় চেতনা ও দেশীয় প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যবোধের দরুন স্কুল-কলেজ স্থাপন করবে ও তারফলে এদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তার লাভ করবে; (৬) এদেশে ইউরোপীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ইউরোপের লোকদের আদান-প্রদানের ফলে কর্তৃপক্ষ এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানতে পারবেন ও সেই কারণে ভারতের আইন-প্রণয়নে এখন থেকে আরও বেশি উপযুক্ত হবেন; (৭) পূর্বদিক থেকেই হোক আর পশ্চিমদিক থেকেই হোক, ভারতবর্ষ আক্রান্ত হলে দেশীয় লোক ছাড়াও অধিক সংখ্যক ইউরোপীয়দের সাহায্য ভারত সরকার পাবে; (৮) পূর্বোক্ত কারণবশতঃ ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে সম্বন্ধ দৃঢ় ও চিরস্থায়ী হতে পারে—যদি ভারতবর্ষ পার্লামেণ্টারি ও অন্যান্য উদারনৈতিক পন্থায় শাসিত হয়; (৯) আর যদি ঘটনাচক্রে এ-দুটো দেশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও যায়, তাহলেও এই সম্মানীয় অধিবাসীরা ভারতবর্ষকে ইউরোপের সাহায্যে এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিকেও শিক্ষিত ও সুসভ্য করে তুলতে পারে।

রামমোহনের মতে এদেশে ইউরোপীয়দের স্থায়ীভাবে বসবাসের ফলে পাঁচ রকমের সম্ভাব্য অপকার দেখা দিতে পারে। এই অপকারগুলি হল: (১) ইউরোপীয়রা ভিন্ন জাতির লোক ও শাসকগোষ্ঠীর স্বগোত্রীয়। ভারতীয়দের উপর আধিপত্য বিস্তার করবার জন্যই তারা ব্যগ্র হয়ে উঠবে। স্বভাবতই দেশের লোকদের—যারা শাসকশ্রেণীর নিকট সমাদৃত নয়—দাবিয়ে দিয়ে স্বতন্ত্র অধিকার

ও সুবিধা ভোগ করবার চেষ্টা করবে। তারা ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী, সুতরাং তারা ভারতীয়দের ধর্মে আঘাত দিতে কোনো কুণ্ঠাবোধ করবে না; তাদের হাতে স্বতন্ত্র জাতি, বর্ণ, ধর্মের লোক —ভারতবাসীর লাঞ্ছনা ও অপমানের অবধি থাকে না; (২) ইউরোপীয়দের তাদের স্বদেশীয় শাসকশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে তার সুযোগ নেবার সম্ভাবনা থাকবে; (৩) সকল শ্রেণীর ও সমস্ত রকমের ইউরোপীয়দের অবাধে আসতে দিলে, পরস্পরের স্বার্থের অনবরত সংঘর্ষের ফলে দেশী ও বিদেশী জাতির মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে, যে-সংঘর্ষ একটা জাতি আর-একটা জাতিকে দাবিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত থামবে না; (৪) ইউরোপীয়রা আর ভারতীয়রা একত্রিত হয়ে আমেরিকার মত বিদ্রোহ করতে পারে, কিন্তু ভালো গভর্ণমেণ্ট হলে তা নাও হতে পারে, যেমন কানাডায় হয়েছে; (৫) এদেশের বিরূপ আবহাওয়ার জন্য ইউরোপীয়রা তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে।[২১]

পরিশেষে সাফল্যলাভের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটল। রামমোহন-দ্বারকানাথের ভাষায় 'অসভ্য ভারতীয়গণকে সভ্য করার জন্য' ও 'ভারতীয় কৃষকদের বৈষয়িক উন্নতি বিধানের জন্য' ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ-সরকার ইংরেজ-বণিকদের অর্থাৎ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাগিচা-শিল্পের দাস-পরিচালকদের ভারতে জমি-কেনার অনুমতি দান করে আইন প্রণয়ন করলেন।[২২]

বাংলাদেশে শ্বেত-জমিদার সৃষ্টির আন্দোলনকে সতর্কতার সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে রামমোহন-দ্বারকানাথ-বেণ্টিঙ্ক প্রমুখের বক্তব্যকে সংক্ষেপে স্মরণে রাখতে হবে:— (১) নীল-চাষে ভারতীয়দের উপকার হয়েছে (—রামমোহন); (২) নীলকরেরা আংশিক ক্ষতি করে থাকলেও অন্যান্য শ্রেণীর ইউরোপীয়দের তুলনায় তারা সাধারণ লোকের অনেক বেশি উপকার করেছে (—রামমোহন); (৩) নীল-চাষের জন্য নীলকরেরা সমগ্র দেশে টাকা ছড়ানোর ফলে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে এবং নীল-চাষীরা নীলকরের দ্বারা নির্যাতিত হয় না (—দ্বারকানাথ); (৪) নীল-চাষীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং যে-সব জায়গায় নীলের চাষ নেই ও নীলের কারখানা নেই, সে-সব জায়গার অধিবাসীদের চেয়ে তাদের অবস্থা অনেক ভালো (—দ্বারকা-নাথ); ৫) যেখানে নীলকরেরা বসবাস করছেন সেখানে গত পনেরো বছরের মধ্যে মজুরদের মজুরি দ্বিগুণ হয়েছে (বেন ব্লক); (৬) যে-সব ক্ষেতমজুর পূর্বে সারাদিন মেহনত করে তিন পণ কড়ি উপার্জন করত, তারা এখন নীল-চাষ করে দিনে আড়াই আনা তিন আনা উপার্জন করছে (—বঙ্গদূত); (৭) নীলকরেরা দেশের অতুলনীয় উপকার করছে, প্রত্যেক নীল-কারখানা উন্নতির কেন্দ্র এবং যে-সব লোক নীলের কারখানায় কাজ করে তাদের ও আশেপাশের লোকদের উন্নতি-সাধন করে নীলের কারখানা (—বেণ্টিঙ্ক)।

কিন্তু নীল-চাষের ইতিহাস রামমোহন-দ্বারকানাথ গোষ্ঠীর বক্তব্যের পক্ষে সাক্ষ্য

দেয় না, বরং ইতিহাস তাঁদের প্রতি বড়ো নির্দয়, বড়ো নির্মম। নীলকরদের দমন-পেষণের যন্ত্রণায় ইতিহাস বেদনা-বিদীর্ণ কণ্ঠে বলে, এরূপ একটা নীলের বাক্সও ইংল্যাণ্ডে পৌঁছায়নি, যা মানুষের রক্তে রঞ্জিত নয়। নতুন ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে বিদেশীদের মদমত্ত পদভারে বাংলার গ্রাম কম্পিত হল, রক্তে সিক্ত হল বাংলার মাটি। তাই নীল-চাষীদের রক্তক্ষরণের ইতিহাস কয়েকজন ঐতিহাসিক সাক্ষীর কাছ থেকেই শোনা যাক।

'অসভ্য ভারতীয়গণকে সভ্য করার জন্য' নীলকর সাহেবরা কি-ধরণের 'ভদ্র' ব্যবহার করতেন, ত্যর পরিচয় পাওয়া যায় লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগ্নী মিস এমিলি ইডেনের ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুন তারিখের চিঠিতে। তিনি লিখেছেন, "সেদিন তো এক নীলকর সাহেব তার ষোলো বছরের বর্ণসঙ্কর-বৌকে মারতে মারতে মেরেই ফেলল। বীভৎস ব্যাপার। কিন্তু মেয়েটা তো ট্যাস-ফিরিঙ্গি, তাই ধারে কাছে অন্য যেসব নীলকর সাহেব ছিলেন সবাই একজোট হয়ে খুনীকে ঝটপট সরিয়ে দিল। কাগজে লেখালেখি না হওয়া পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও চোখ বুজে রইলেন। সরকার যখন এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য নড়েচড়ে বসলেন, ততদিনে খুনে নীলকর ফ্রান্সে তার নিজের দেশে নিরাপদে ফিরে গেছে।"২৩

বাংলার কৃষকরা কিভাবে নীলচাষ করতে বাধ্য হতেন এবং তাঁরা কিভাবে নীলকরদের ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিলেন, সে-কাহিনী শুনিয়েছেন অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। তিনি লিখেছেন, "নীলকরদিগের কার্য্যের বিবরণ করিতে হইলে কেবল প্রজাপীড়নেরই বৃত্তান্ত লিখিতে হয়। তাঁহারা দুই প্রকারে নীল প্রাপ্ত হয়েন, প্রজাদিগকে অগ্রিম মূল্য দিয়া তাহারদের নীল ক্রয় করেন, (অর্থাৎ রায়তকে দাদন দিয়ে রায়তের জমিতে রায়তকে দিয়ে নীল-চাষ করানো হয় এবং একে 'রায়তী আবাদী' চাষ বলা হয়। —লেখক) এবং আপনারা ভূমি কর্ষণ করিয়া নীল প্রস্তুত করেন (অর্থাৎ পত্তনিপ্রাপ্ত জমিতে নীলকরেরা ক্ষেতমজুরকে দিয়ে নীল-চাষ করাতেন এবং একে 'নিজ আবাদী' চাষ বলা হয়।—লেখক)। সরল স্বভাব সাধু ব্যক্তিরা মনে করিতে পারেন, ইহাতে দোষ কি ? কিন্তু লোকের কত ক্লেশ, কত আশাভঙ্গ, কত দিন অনশন, কত যন্ত্রণা যে এই উভয়ের অন্তর্ভূত রহিয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। এই উভয়ই প্রজা-নাশের দুই অমোঘ উপায়। নীল প্রস্তুত করা প্রজাদিগের মানস নহে ; নীলকর তাহারদিগকে বলদ্বারা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন ও নীলবীজ বপনার্থে তাহারদিগের উত্তমোত্তম ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। দ্রব্যের উচিত পণ প্রদান করা তাঁহার রীতি নহে ; অতএব তিনি প্রজাদিগের নীলের অত্যল্প অনুচিত মূল্য ধার্য্য করেন। নীলকর সাহেব স্বাধিকারের একাধিপতিস্বরূপ, তিনি মনে করিলেই প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিতে পারেন, তবু অনুগ্রহ ভাবিয়া দাদনস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রদান করিতে অনুমতি করেন, গোমস্তা ও অন্যান্য আমলাদের

দস্তুরি ও হিসাবানাদি উপলক্ষ্যে তাহারও কোন না অর্দ্ধাংশ কর্ত্তন যায় ? একারণ প্রজারা যে ভূমিতে ধান্য ও অন্যান্য শস্য বপন করিলে অনায়াসে সম্বৎসর পরিবার প্রতিপালন করিয়া কালযাপন করিতে পারে, তাহাতে নীলকর সাহেবের নীল বপন করিলে লাভাভাব দূরে থাকুক, তাহারদিগকে দুশ্চেদ্য ঋণজালে বদ্ধ হইতে হয়। অতএব তাহারা কোনক্রমেই স্বেচ্ছানুসারে এবিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। বিশেষতঃ কৃষিকার্য্যই তাহারদের উপজীব্য, ভূমিই তাহারদের একমাত্র সম্পত্তি এবং তাহারই উপর তাহারদের সমুদায় আশা ভরসা নির্ভর করে। কোন্ ব্যক্তি ইচ্ছাধীন এমত সঞ্চিত ধনে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মবধ করিতে চাহে ? কিন্তু তাহারদের কি উপায়ান্তর আছে ? প্রবল প্রতাপান্বিত মহাবল-পরাক্রান্ত নীলকর সাহেবের অনিবার্য অনুমতির অন্যথাচরণ করা কি দীন দরিদ্র ক্ষুদ্র প্রজাদিগের সাধ্য ? তাহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে সভার মনের বেদনা নিবেদন করুক, বা অতীব কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ নিঃসারণ পুরঃসর তাঁহারদের পদানত হউক, কিছুতেই তাঁহারদের চিত্তভূমি কারুণ্যরসে আর্দ্র হয় না, —কিছুতেই তাঁহারদের অবিচলিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় না। তাঁহারা এরূপ ব্যবহার করিয়াও আপনাদিগকে নির্দয় জ্ঞান করেন না; বরঞ্চ কোন প্রজার নেত্রদ্বয়ে অশ্রুজল বিগলিত হইতে দেখিলে এইরূপ হেতু নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিয়া থাকেন যে "তোর ১০ বিঘা ভূমি আছে তাহার ৫ বিঘা ভূমি কি নিমিত্তে না দিবি ? ৫টা গরু আছে, নীলের কর্ম্মে তাহারই বা দুইটা কেন না নিযুক্ত করিবি ?" দীন দুঃখী প্রজারা এপ্রকার পরুষ বাক্য শ্রবণ করিলে আর কি করিতে পারে ? তাহারদিগের স্বীয় ভূমিতে অবশ্যই নীল বপন করিতে হয়, —প্রত্যক্ষ দেখিয়াও আপনার জ্ঞাতসারে স্বহস্তে গরল পান করিতেই হয়। এই ভূমির নাম খাতাই জমি, —খাতাই জমির প্রসঙ্গমাত্রে প্রজাদের শোকসাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ...একে নীলকর সাহেব তাহারদিগকে উচিত মূল্যের অর্দ্ধ মাত্রও প্রদানে স্বীকৃত হন না, তাহাতে আবার আমলারা তাহারদের উপর ছলে বলে কৌশলে নানা প্রকার অত্যাচার করে। ইহাতে শত শত ব্যক্তি বর্ষে বর্ষে নীলকর সাহেবদের সন্নিধানে নীলের দাদন গ্রহণ করিয়া ক্রমে এ প্রকার ঋণগ্রস্থ হইতে থাকে, যে তাহারদের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র প্রভৃতিও তৎপরিশোধে সমর্থ হয় না। ক্লেশ, উৎকণ্ঠা, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, অনশন ইত্যাদি নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও তাহারদের নিস্তার নাই, তাহারদিগের ঋণপাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠে। ভূমি কর্ষণ পূর্ব্বক নীল প্রস্তুত করা নীলকরের দ্বিতীয় কার্য্য। তিনি যেমন প্রথম কার্য্য সম্পাদনার্থে প্রজাদিগকে যথার্থ মূল্যদানে অস্বীকার পান, সেইরূপ দ্বিতীয় কার্য্য সাধনার্থে তাহারদিগকে সমুচিত বেতনে বঞ্চিত করেন। তিনি এই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, কাহাকেও উচিত বেতন প্রদান করিবেন না, সুতরাং তাহারা পার্য্যমানে কোন ক্রমেই তাঁহার কর্ম্ম স্বীকার করিতে চাহেনা। কিন্তু তাহারা কি করিবে ? নীলকর সাহেবের প্রবল প্রতাপ, ভয়ঙ্কর উপদ্রব ও

করাল মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া কম্পান্বিত কলেবরে তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হয়।”[২৪]

ভূমিদাস প্রথায় ভূমিদাস প্রভুর ইচ্ছার ক্রীড়নক মাত্র। প্রভুর আহ্বান-মাত্র নিজেদের সমস্ত কাজ ফেলে রেখে প্রভুর হুকুম পালন করতে হয়; অন্যথা হলে প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকে। তাঁদের কোনো স্বাধীনতা থাকে না। সর্বাগ্রে প্রভুর জমিতে চাষ করাই হল ভূমিদাসদের একমাত্র কর্তব্য। নীলকরের আমলে ভূমিদাসদের সঙ্গে নীলচাষীদের অবস্থার কোনো পার্থক্য ছিল না। স্বাধীনতা তো দূরের কথা, তাঁরা প্রকৃত পক্ষে নীলকরদের ভূমিদাস ছিলেন। এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় ফ্রেডারিক স্হড়-এর সাক্ষ্যে। তিনি নীল-কমিশনের সামনে বলেছেন, “রায়তেরা যখন মাঠে তাদের কাজে খুব ব্যস্ত থাকে, তখন তাদেরকে নীলকরের জমিতে কাজ করার জন্য ডাকা হয়। তৎক্ষণাৎ কুঠিতে উপস্থিত না হলে তাদেরকে প্রহার করা হয়। সে-জন্য রায়তেরা তাদের ধান, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি কিছুই চাষ করতে পারে না।”[২৫] অক্ষয়কুমার দত্তের বক্তব্যে একই চিত্র পাওয়া যায়: “সাহেবের অনিবার্য্য অনুমতি অবশ্যই অবশ্যই পালন করিতে হয় — স্বাভিমত সমুদায় কর্ম্মক্ষতি করিয়াও তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। …যে সময়ে তাহারদের স্বীয় ভূমি কর্ষণ পূর্ব্বক সম্বৎসরের অন্ন সংস্থান করা আবশ্যক, যে সময়ে তাহারা স্বকীয় কার্য্য সমাধা করিতেই স্বাবকাশ পায় না সেই সময়ে তাহারদিগকে অযথোচিত বেতন স্বীকারপূর্ব্বক অন্যের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া শরীর ক্ষয় করিতে হয়।”[২৬]

নীলকরদের আমলে নীল-চাষীরা কি পূর্বের তুলনায় বেশি উপার্জন করতেন অথবা তাঁরা নীলকর-শোষণের অসহায় শিকার ছিলেন, তার উত্তর পাওয়া যাবে দেশীয় নীলকর ও রাণাঘাটের জমিদার জয়চাঁদ পালচৌধুরীর সাক্ষ্যে। নীল-কমিশনের কাছে তিনি বলেছেন, “যেখানে আটখানা লাঙলের (মজুর সমেত) বাজার-দর ছিল এক টাকা, সেখানে নীলকরদের দাম ছিল মাত্র অর্ধেক অর্থাৎ টাকায় ১৬ খানা। তারপর জয়চাঁদ স্বীকার করেন যে, ‘সব নীলকরই ঐ দর দিত। সুতরাং আমিও তাই দিতাম।…নীল-চাষে রায়তের কোনই লাভ থাকে না।’ জয়চাঁদের মতে ‘নিজ চাষের’ জন্য নীলকরকে খুব কম খরচ করতে হত। জয়চাঁদ একজন সাধারণ রায়তের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, এই চাষীটির দুই বিঘায় নীল-চাষ করতে খরচ হত খুব কম করে দশ টাকা তেরো আনা। (তাছাড়া চাষীকে জরিমানা ইত্যাদি বাবদ খরচ করতে হত, যেমন গরুর অনধিকার প্রবেশের জন্য গরুপিছু প্রতিদিন ছয় আনা। এই খরচগুলি হিসেবের খাতায় উঠত না, কারণ গরু ছাড়িয়ে আনার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চাষীকে এই টাকা দিতে হত) তারপর তার ফসলের জন্য চাষী কি পেত? তার ফসল হয়েছে বত্রিশ বাণ্ডিল; টাকায় আট বাণ্ডিল দরে তার দাম হয় চার টাকা। যেখানে তাকে ফসল তৈরি করতে খরচ করতে হয়েছে দশ টাকা তেরো আনা,

সেখানে সে পাচ্ছে মাত্র চার টাকা, আর তার লোকসান হচ্ছে ছয় টাকা তেরো আনা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, রায়ত তার মজুরি বাবদ কিছুই পাচ্ছে না, অর্থাৎ নীলকরের জন্য তাকে সারা বছর ধরে নিছক বেগার খেটে দিতে হচ্ছে। এতসব লোকসানের পরেও চাষীকে আমলাদের 'দস্তুরি' কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হত, যার পরিমাণ দাঁড়াত আট থেকে দশ আনা। এই পন্থায় যে চাষী নীলকরের কাছে একবার দাদন নিয়েছে, সেই দাদন আর কোন কালেই শোধ হত না।"[২৭]

আর-একজন ঐতিহাসিক সাক্ষী প্যারীচাঁদ মিত্র একই কথা বলেছেন তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে (১৮৫৬ খ্রী:), "...প্রজারা নীল বুনিতে ইচ্ছুক নহে, কারণ ধান্যাদি বোনাতে অধিক লাভ, আর যিনি নীলকরের কুঠিতে যাইয়া একবার দাদন লইয়াছেন তাঁহার দফা একেবারে রফা হয়।"[২৮]

সুতরাং চাষীর পক্ষে নীল-চাষ ছিল সম্পূর্ণ লোকসানের ব্যাপার এবং চাষীর পরিবারের পক্ষে নীল-চাষের অর্থ ছিল অনশন। নীলকরদের উদ্দেশ্য ছিল খুবই স্পষ্ট — নিম্নতম ব্যয়ে অথবা কোনো ব্যয় না করেই সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা।[২৯] 'রায়তকে নীল-চাষ করার জন্য সারা বৎসর ধরে সমস্ত সময় নীলকরের জন্যই বেগার খাটতে হয়। আর সে-জন্য রায়তকে তার অন্যান্য ফসলের কাজ ফেলে রাখতে হয়।'[৩০] কিন্তু রায়তেরা এত লোকসান সত্ত্বেও কেন নীলচাষ করছেন — এ প্রশ্নের উত্তরে পূর্বোক্ত দেশীয় নীলকর জয়চাঁদ বলেছেন যে, রায়তদের "নীলচাষ করার কারণ নীলকরদের অসংখ্য প্রকার অত্যাচার ও বলপ্রয়োগ, যথা, রায়তদের গুদামঘরে আটক রাখা, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, তাদের উপর মারপিট করা ইত্যাদি।"[৩১]

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টারি সিলেক্ট কমিটির তদন্তকালে ডেভিড হিল নামে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে নীল-চাষের ফলে বাংলাদেশের কোনো উন্নতি হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, "গ্রামের চেহারার (অর্থাৎ রাস্তাঘাটের) যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, কিন্তু জনসাধারণের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি।"[৩২]

রেভারেণ্ড ফ্রেডারিক স্যড়কে নীল-কমিশন প্রশ্ন করেছিলেন যে, ফর্লঙ্গের (কুখ্যাত নীলকর) কুঠি প্রতি বৎসর যে তিন লক্ষ টাকা নীল-চাষে লগ্নি করে, তারফলে জনসাধারণের কোনো উপকার হয় কিনা? উত্তরে স্যড় বলেছিলেন যে, যারা কুঠির কাজে নিযুক্ত হয় তারা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়, কিন্তু কৃষকের যে ক্ষতি হয় তা এই উপকার অপেক্ষা অনেক বেশি।[৩৩]

আর একজন মিশনারী তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে, কুঠির কর্মচারীরাই কেবল নীল-চাষের সমর্থক, অন্য কেউ নয়। তিনি আরো বলেছিলেন যে, কৃষকেরা কেবল নীলকরের জন্যই নয়, জমিদারের জন্যও নীল-চাষ করতে অস্বীকার করে। আর নীলকরদের তৈরি রাস্তাঘাট সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন যে, ঐগুলি তৈরি হয়েছিল এক কুঠি থেকে আর-এক কুঠিতে যাতায়াতের জন্য এবং রাস্তাগুলি

তৈরির সমস্ত খরচ চাষীর কাছ থেকে জোর করে আদায় করা হয়েছিল।[৩৪]

উপরের ইতিহাসের পটভূমিতে একালের একজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন, "রায়তদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ভিত্তিহীন অভিযোগ দায়ের করাটাই ছিল নীলকরদের প্রধান অস্ত্র যা রায়তদের বিরুদ্ধে প্রায়ই প্রয়োগ করা হত এবং তারফলে তাঁরা নীলকরদের কিংবা তাঁদের দালালদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হত, জাল সাক্ষী সস্তা দরে সংগৃহীত হত এবং নীলকরদের সাজানো অভিযোগগুলি খুবই কম খারিজ হত। নীল-চাষীদের দাদন নিতে বাধ্য করা হত এবং নীল-চাষের জন্য যে-জমি দাবি করা হত, তা তাঁরা দিতে সক্ষম হতেন না। সমগ্র ব্যবস্থাটাই ছিল চূড়ান্তভাবে শঠতাপূর্ণ। ইউরোপীয় দক্ষতা, ইউরোপীয় উদ্যম ও ইউরোপীয় কর্মক্ষমতার সঙ্গে অত্যাচার-উৎপীড়ন এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল যে, নীল-চাষকে নীলের ক্রীতদাসত্ব বলা ভুল হবে না।"[৩৫]

পূর্বোক্ত সাক্ষ্যদাতারা অধিকাংশই হলেন রামমোহনের পরবর্তীকালের সাক্ষী। সুতরাং একালের নীলকর-সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা বলতে পারেন যে, রামমোহন-দ্বারকানাথ যখন নীলকর সাহেবদের সমর্থনে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, তখন নীলকরদের অধিকাংশ সৎ ও উন্নত-চরিত্রের অধিকারী ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন এবং রায়তেরা তাঁদের অধীনে স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে স্বেচ্ছায় নীল-চাষ করতেন। একালের মার্কসবাদী বামপন্থী বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্র গুপ্ত রাজা রামমোহনের নীল-নীতিকে সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন, "১৮৩৩ সালে অবাধ বাণিজ্যের নীতি সীমিতভাবে স্বীকৃত হলে এই অত্যাচার-শোষণ বেড়ে যায়। রামমোহনের সময়ে অতটা নিদারুণ অবস্থা হতে পারেনি।"[৩৬] রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও একই কথা বলেছেন। সুতরাং রামমোহনের সমকালের নীলকরেরা বাংলার রায়ত-কৃষকের প্রতি কি ধরণের ব্যবহার করতেন তা তৎকালীন সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে জানা যেতে পারে।

১৭৯৬ সালের সদর দেওয়ানি আদালতের নথিপত্রে দেখা যায়, দুজন মুসলমান জমিদার নীলকরদের বিরুদ্ধে এক দরখাস্তে অভিযোগ পেশ করে বলেছেন যে, তাঁদের যে-সব জমির ধান প্রায় পেকে উঠেছিল, একজন নীলকর সাহেব সেই ধানগুলি নষ্ট করে তাতে বলপূর্বক নীল-চাষ করেছেন। রায়তেরা যাতে তাঁদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হন, সে-জন্য ঐ সাহেব তাঁদেরকে প্রচণ্ড প্রহারে জর্জরিত করেছেন এবং তাঁদের বাঁশ, তালগাছ ও খড় জোর করে নিয়ে গেছেন এবং নীল জমা দেওয়া হলেও চুক্তিতে নির্ধারিত সম্পূর্ণ অর্থ দিতে অস্বীকার করেছেন। জমিদার দু'জন আরো অভিযোগ করেছেন যে, রায়তেরা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে গ্রাম ত্যাগ করে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেছেন।[৩৭]

নীল-কুঠিয়ালদের সম্পর্কে **Buchanan Hamilton** ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছেন যে, বাংলাদেশের চাষীরা নীলকরদের উপরে যে-বিরূপ তার বিশেষ কারণ এই যে, একবার দাদন নিলে নীলকর সাহেবরা তাঁদের সঙ্গে ক্রীতদাসের

মত ব্যবহার করতেন। টাকা শোধ দেবার সুযোগ তাঁদের দিতেন না, জোর করে দাদন নিতে বাধ্য করতেন এবং তাঁদের দু'দিক দিয়ে ঠকাতেন —জমির মাপে এবং ফসলের মাপে।[৩৮]

এই সময়কার (১৮০৭ খ্রী:) ঘটনার উল্লেখ করে অ্যাটর্নি উইলিয়ম হিকি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, তাঁর এক বন্ধু মেটল্যাণ্ড আর্নট কোম্পানির ক্যাডেট হয়ে ১৭৭৭ সালে তাঁর সঙ্গে একই জাহাজে ভারতবর্ষে আসেন এবং পরে সেনা-বিভাগের ক্যাপটেনের পদে উন্নীত হন। কিন্তু রাতারাতি ধনী হওয়ার আশায় আর্নট সাহেব ক্যাপটেনের কাজ ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণনগরে দাদন দিয়ে নীলের চাষ আরম্ভ করেন এবং মুনাফার লালসায় উন্মত্ত হয়ে আইনের দায়িত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর অত্যাচারে দুইজন কৃষক প্রাণ হারান।[৩৯]

নীল-চাষের শুরু থেকেই নীলকর সাহেবরা যে ক্ষমতার অপব্যবহার করছিলেন এবং নীলকর ও নীল-চাষীদের মধ্যে সম্পর্ক যে ক্রমশ তিক্ত হয়ে উঠেছিল, সে-বিষয়ে কোম্পানি-সরকার সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড মিণ্টো এক আদেশলিপিতে মন্তব্য করেছেন যে, নীলকরদের এটা স্বভাবে পরিণত হয়েছে তাঁরা জোর করে রায়তদেরকে নীলের দাদন নিতে এবং নীল-চাষ করতে বাধ্য করতেন। নীল-চাষীদের উপর অত্যাচারের প্রমাণ পেয়ে তিনি চারজন নীলকরের লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছেন এবং জেলা-শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, রায়তদেরকে বেআইনীভাবে কয়েদ করা, চাবুক দিয়ে প্রহার করা, অন্যান্য নীলকরদের সঙ্গে দাঙ্গায় লিপ্ত হওয়া এবং অন্যান্য বেআইনী কাজ বন্ধ করার জন্য প্রতিহত করেন।[৪০]

'১৮২০-এর দশকেও নিরীহ নীল-চাষীদের উপর লাইসেন্স-প্রাপ্ত ইউরোপীয় নীল-করদের নানারকম অত্যাচারের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।'[৪১] অত্যাচার-উৎপীড়ন চলতে থাকে। কিন্তু ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের লর্ড মিণ্টোর শাসনকাল থেকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের লর্ড ক্যানিং পর্যন্ত কোম্পানি-সরকার নীলকর সাহেবদের হিংস্র আচরণ সম্পর্কে আর কোনো কঠোর বিবৃতি দেননি। কারণ ১৮১৩ সালের পর থেকে ভারতীয়দের মনোভাব সম্পর্কে সরকারের দুশ্চিন্তা কম ছিল।[৪২] প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, রাজা রামমোহন এসময়ে কলকাতায় এসে কোম্পানির কর্মচারী ও ব্রিটিশ-বণিকদের সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন করেছেন এবং দেশীয় ভূস্বামীদের সঙ্গে নিয়ে হিন্দুধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছেন।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ মে-র 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় নীলকরদের উৎপীড়নের নিম্নোক্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল: "মফঃস্বলে কোন কোন নীলকর প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন তাহার বিশেষ কারণ এই। যে প্রজা নীলের দাদন না লয় তাহাদিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকেন ও খালাসীদিগকে কহিয়া রাখেন যে ঐ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট আইলে সে গরু ধরিয়া কুঠিতে আনিবা। তাহারা ঐ চেষ্টাতে নীলের জমির নিকট থাকে, কিন্তু যখন গরু নীলের নিকট

আইসে যগুপি নীলের কোন ক্ষতি না করে তথাপি তথনই সে গরু ধরিয়া কুঠিতে চালান করে, সে গরু এমত কয়েদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় না। ইহাতে প্রজালোক নিতান্ত কাতর হইয়া কুঠিতে যায়। প্রথম তাহাদিগকে দেখিয়া কেহ কথা কহে না, পরে গরু অনাহারে যত শুষ্ক হয় ততই প্রজার দুঃখ হয়। ইহাতে সে প্রজা রোদনাদি করিয়া সরকার লোককে 'কছু ঘুষ দিয়া ও নীলের দাদন লইয়া গরু খালাস করিয়া গৃহে আইসে। এবং নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণ পর্য্যন্ত খালাস নাই যেহেতুক হিসাব রক্ষা হয় না, প্রতি সনেই দাদন সময়ে বাকীদার কহিয়া ধরিয়া কয়েদ রাখে। তাহাতে প্রজারা ভীত হইয়া হাল বকেয়া লিখিয়া দিয়া দাদন লইয়া যায়। এইরূপ যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে, তাহার অন্যথা হইলে স্থান ত্যাগ করে যেহেতুক দাদন থাকিতে অন্য শস্য আবাদ করিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে না।"[৪৩]

১৮২৮ সালের ৬ আগস্ট তারিখে লণ্ডনের কোর্ট অব ডিরেক্টর্স এক চিঠিতে বেণ্টিঙ্ককে লিখেছেন, নীলকরদের বিরুদ্ধে লুণ্ঠন, দাঙ্গা, কয়েদ করা, চাষীদের প্রহার করা এবং বলপূর্বক চাষীদের জমি দখল করা প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁরা বহু রিপোর্ট পেয়েছেন। স্থানীয় আদালত এগুলি প্রতিকার করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁরা আরো লিখেছেন, ভারতীয়রা যখন নীলকরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন তখন আদালত তাঁদের দরখাস্তগুলি মাসের পর মাস ফেলে রাখেন; কিন্তু এজেন্সী-হাউসগুলি নীলকরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে দরখাস্ত পেশ করলে তৎক্ষণাৎ তা প্রতিকার করা হয়। এমন কি সরকারও তাঁদের মামলা সম্পর্কে আদালতের কাজে হস্তক্ষেপ করেন।[৪৪]

বাংলাদেশের ফৌজদারী আদালতের নথিপত্রসমূহ সাক্ষ্য দেয় যে, নীল-চাষ প্রবর্তনের প্রথম দিন থেকেই অনিচ্ছুক রায়তদের নীল-চাষে বাধ্য করার জন্য ব্যাপকভাবে কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে হত্যাকাণ্ড, খুন-জখম, দাঙ্গা-লুঠতরাজ, গৃহদাহ, লোক-অপহরণ, বলাৎকার, অবৈধভাবে গুদামে কয়েদ করে দিনের পর দিন ভাত-জল না দেওয়া, চাবুক মেরে দেহ ক্ষত-বিক্ষত করা ইত্যাদি সমস্ত রকমের নৃশংস-নিষ্ঠুর পদ্ধতি অবলম্বন করা হত। ১৮১০ সালের লর্ড মিণ্টোর পূর্বোক্ত বিজ্ঞপ্তিতেই রায়তদের উপরে নীলকরদের অত্যাচার-উৎপীড়নকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে,—(১) আক্রমণাত্মক অপরাধ, যেগুলিকে আইনগত অর্থে নরহত্যা বলা না গেলেও যার ফলে দেশীয়গণের মৃত্যু ঘটেছে; (২) প্রাপ্য বলে কথিত অর্থ আদায় অথবা অন্যান্য কারণে দেশীয়গণকে বিশেষত গুদামে অবৈধভাবে আটক রাখা; (৩) অন্যান্য নীলকরদের সঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামা করার উদ্দেশ্যে কারখানার লোকজন অথবা ভাড়াটে গুণ্ডাদের একত্র করা; (৪) চাষী ও অন্যান্য দেশীয়দের অবৈধ-ভাবে বেত্রাঘাত ও অন্যান্য শাস্তি-দান।[৪৫]

কিন্তু নীলকরদের দমন করার কোনো কার্যকর-পদ্ধতি গ্রহণ করা হল না। পক্ষান্তরে ১৮৩০ সনের কুখ্যাত পঞ্চম আইনে (Regulation V *of* 1830) ঘোষণা

করা হল যে, দাদন-গ্রহণকারী কৃষকদের পক্ষে নীল-চাষ না করাটা হবে আইন-বিরুদ্ধ। এই অপরাধের জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে নীলকরেরা ফৌজদারীতে অভিযোগ আনতে পারেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে কৃষকদের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। ফলেকৃষকদের উপরে নীলকরদের অত্যাচার বেড়ে যায়। এইসব অত্যাচার বর্ণনা করে জনৈক মফঃস্বলবাসী তখনকার 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় একখানি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে বলা হয়, নীলকরদের অসংখ্য উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা দরিদ্র প্রজাদের নেই। যাঁরা প্রতিবাদ করতে যান, প্রথমত তাঁদের জীবন বিপন্ন হয়। দ্বিতীয়ত প্রতিবাদ করতে হলে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তা দরিদ্র কৃষকদের নেই। পত্রলেখক এই চিঠিতে আর-একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, নীলকরেরা যে আমাদের দেশের জমিতে শিকড় গেড়ে বসতে সক্ষম হয়েছিল, তার কারণ এই যে, ছোট-ছোট জমিদারেরা লোভের বশবর্তী হয়ে নীলকরদের সাহায্য করত ও তাঁদের অধীনে কাজ করত।[৪৬]

১৮৩২ সালের ১০ এপ্রিল-এ কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টর্স লণ্ডন থেকে ভারতের গভর্ণর জেনারেলের কাছে একটি চিঠি দিয়ে লিখেছেন, "রায়তদের উপর যে-অত্যাচার ও লুণ্ঠন চালানো হচ্ছে, সে-সম্বন্ধে অজস্র প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এইসব দুষ্কর্ম যদিও বা নীলকররা নাও করে থাকেন, তাঁদের কর্মচারীরা তাঁদেরই নামে ও তাঁদেরই লাভের জন্য তা করছে। চারদিকে প্রচুর দাঙ্গাহাঙ্গামা হচ্ছে, যার ফলে অনেক লোক আহত তো হচ্ছেই, এমন কি নিহতও হচ্ছে। দেশের আইন-কানুন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থ জোর করে আদায় করে নেবার জন্য নীলকরেরা ভাড়াটিয়া সশস্ত্র লোক নিয়োগ করে এইসব দুষ্কর্ম করাচ্ছেন।"[৪৭]

নীলকরেরা যে-দাবি জানিয়েছিলেন, দাদন নিয়ে নীল-চাষ না করলে চাষীদের ফৌজদারী আইনানুসারে জেলে দিতে হবে, সে-দাবি পূরণ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও নীলকরদের অত্যাচার কমেনি। "এই বৎসর (১৮৩২ খ্রী:) মে মাসে একমাত্র যশোহর জেলাতেই ১৬২ জন চাষী নীলের ব্যাপারে জেলে রয়েছেন"—এই তথ্য উল্লেখ করে উক্ত চিঠিতে ডিরেক্টররা নদীয়া জেলার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট টার্নবুলের অভিমতও লিপিবদ্ধ করেছেন। নদীয়ার জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে টার্নবুলের নীল চাষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর রিপোর্টে টার্নবুল নিরপেক্ষভাবে ও সততার সঙ্গে নীলকরদের অত্যাচার ও নীল-চাষীদের দুরবস্থার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি তাতে দেখিয়েছেন কিভাবে ছলে-বলে-কৌশলে নীলকরেরা অশিক্ষিত চাষীদের চুক্তিবদ্ধ করে থাকেন, কিভাবে দেওয়ান-নায়েব-গোমস্তার এই লুণ্ঠন-যজ্ঞে নিজেদের ভাগ বসায়, কিভাবে ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল নিযুক্ত করে কৃষকদের উপরে দিনের পর দিন হামলা চালায় ও তাঁদের ক্রীতদাস করে রাখবার চেষ্টা করেন ইত্যাদি।

একটুও অতিরঞ্জিত না করে ম্যাজিস্ট্রেট টার্নবুল কোম্পানির কোর্ট অব

ডিরেক্টর্স-এর কাছে যে-রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, তা তাঁর জবানীতেই শোনা যাক: "রায়তদের সঙ্গে যে চুক্তি করা হত, তা অনেক সময়ে অলিখিত কিংবা প্রায়ই অস্পষ্ট। সাধারণত: তা রায়তদের পক্ষে চূড়ান্ত ক্ষতিকর। প্রকৃতপক্ষে নীল-চাষে একবার নিযুক্ত হলে তাঁদেরকে ক্রীতদাস করে রাখা হয়—তাঁদেরকে স্বাধীনভাবে অন্য কাজ বেছে নেবার পথে বাধা সৃষ্টি করা হয়। সবচেয়ে অবিশ্বাসী হল দেওয়ান, নায়েব, গোমস্তা ও অন্যান্য ব্যক্তিরা যাদের নিয়োগ করেছেন নীলকরেরা। আমার সন্দেহ, নীল-চাষের জন্য জমির পরিমাপ ছাড়া অন্য কিছুই তাঁরা দেখেন না। কিভাবে জমি দখল করা হল সে-বিষয়ে তাঁরা লক্ষ্য করেন না।···নানাধরণের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের জন্য নীলকরদের মধ্যে কলহ-শত্রুতার অনেক ঘটনা দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। পার্শ্ববর্তী নীল-চাষের জেলাগুলিতে তৎকালে যে-অরাজক অবস্থা ছিল, আমার বিশ্বাস, বর্তমানে তা প্রশমিত হয়নি। জমি চাষ করা ও বীজ বপনের সময় থেকে শুরু করে ফসল তোলা পর্যন্ত সরকারের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কারণ সমগ্র জেলায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের পুলিশ-অফিসারদের উপস্থিতিতে এমন কি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গুরুতর শান্তিভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে। বেআইনী কাজের জন্য বহু সশস্ত্র ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়। তারা সমস্ত রকমের আইন লংঘন করে ও কর্তৃপক্ষকে একেবারে অস্বীকার করে বলপূর্বক জমি দখল করে কিংবা দখল বজায় রেখে ফসল নিয়ে যায়। ভয়াবহ দাঙ্গা কিংবা নিয়মিতভাবে তীব্র সংঘর্ষের জন্য রক্তক্ষয়, খুন-জখম হয়। আমাদের পুলিশ-প্রশাসন দুর্নীতিপরায়ণ এবং নীলকর, ইউরোপীয় ও দেশীয়দের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাঁদের সাহায্য করার জন্য দারোগারা কুখ্যাতি অর্জন করেছে। গুপ্ত হত্যা মাঝে-মধ্যে ঘটে; জালিয়াতি ও মিথ্যা হলফনামা তাঁদের প্রধান শক্তি। সংক্ষেপে, আইনত দণ্ডনীয় সমস্ত রকমের অপরাধ করা হয় এবং আমার ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এই তালিকায় রয়েছে, খুন লুঠ করার মত ভিত্তিহীন অভিযোগ দায়ের করা যা সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে; কিন্তু তারফলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ও ম্যাজিস্ট্রেটকে হয়রান হতে হয়।"[৪৮]

বিদেশী নীলকরদের মতো দেশীয় নীলকরেরাও কৃষকদের উপরে একই কায়দায় অত্যাচার-নিপীড়ন করেছেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুন-এর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় জনৈক পত্র-প্রেরক জানিয়েছেন: "আমারদিগের পূর্ব্বসংস্কার এইরূপ ছিল যে, আমারদিগের কোন বাঙ্গালী নীলকর হইলে দেশের অধিক অনিষ্ট ঘটিবেক না, কারণ তাঁহারা আপনারদিগের দেশের মঙ্গলোন্নতির চেষ্টা বিলক্ষণরূপে পাইবেন, কিন্তু আমারদিগের সে আশা এইক্ষণে দুরাশা হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহারদিগের দ্বারা দেশের উন্নতি সম্ভাবনা দূরে থাকুক, তাঁহারা কিরূপে লোকের সর্ব্বস্ব হরণ করিবেন, কিরূপেই বা মানী ব্যক্তির অপমান করিবেন সেই চেষ্টাই তাঁহারদিগের মনে সতত প্রবাহিত হইতেছে।"[৪৯]

নীলকরদের উৎপীড়ন-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদালতে সুবিচার প্রার্থনা করলে

নীল-চাষীরা কোনো ন্যায় বিচার পেতেন না, বরং তাঁরা লাঞ্ছিত হতেন; কারণ ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে নীলকরদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে এবং তাঁরা প্রায়ই নীলকরদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এ-সম্পর্কে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা লিখেছেন, "ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের নিকট নীলকর সাহেবের অত্যাচার ঘটিত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে সুবিচার হয় না। ··· নীলকরদিগের মধ্যে অনেকেই ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষের হস্ত ধরিয়া সেকেহ্যান করেন, এবং ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সহিত কোন২ নীলকরের আলাপ ও কুটুম্বিতা আছে, বিশেষত জিলার কর্ত্তা সাহেবেরা শিকারার্থ কোন বনে গমন করিলে নীলের কুঠিতেই উপস্থিত হয়েন, তথা হইতে হস্তি, কুক্কুর ইত্যাদি গ্রহণ করেন, এবং আহারাদিও করিয়া থাকেন, সুতরাং নীলকরেরা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ঘরের লোক বোধ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারদিগের পক্ষেই জয়লব্ধ হইয়া থাকে।"[৫০]

একই চিত্র পাওয়া যায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মন্তব্য করেছেন, "এ দেশীয় লোকের মফঃসলস্থ ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিকটে নীলকরদিগের নামে অভিযোগ করিবার অধিকার নাই, কিন্তু তাঁহাদের এ দেশীয় লোকের নামে অভিযোগ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। ইহাতে বিচারস্থলেও নীলকরদিগেরই প্রভুত্ব ও পরাক্রম প্রকাশ পায়। তাহারা আপনারা নির্ভয়ে থাকিয়া এ দেশীয় লোককে অনায়াসে অভিভব করিতে পারে। জজ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ইওরোপীয় বিচারক ও নীলকরদিগের সর্ব্বদা পরস্পর সাক্ষাৎকার ঘটনা, একত্র ভ্রমণ ও মৃগয়ায় গমন, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণাদি দ্বারা পরস্পর আনুগত্য ও প্রণয়বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাতে লোকে বোধ করে যে, নীলকর সাহেব ভোজনকালে ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজ সাহেবের কর্ণ সন্নিধানে মৃদুস্বরে দুটি কথা জল্পনা করিয়া যে রূপ ফললাভ করিতে পারেন, এ দেশীয় ভূস্বামিরাও আপনার যথার্থ পক্ষ রক্ষার্থে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াও তদ্রূপ পারেন না। অতএব ভীরু স্বভাব প্রজারা নীলকরদিগকে প্রবল পরাক্রান্ত বোধ করিয়া তাহারদিগকে অত্যন্ত ভয় করে, তাহারদের সহিত বিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হয়, ও তাহারদের অত্যাচার জনিত দুঃসহ দুঃখানলে অবিরত দগ্ধ হইয়াও তৎপ্রতীকার চেষ্টায় পরাঙ্মুখ থাকে।"[৫১] উনিশ শতকের বাংলা ও ইংরেজি সাময়িকপত্রে নীলকরদের অমানুষিক শোষণ-পেষণ সম্পর্কে এত রচনা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে যে, শুধু বাংলা পত্রিকার নীলবিষয়ক রচনাগুলি সঙ্কলন করলে নীল-চাষীদের রক্তে রঞ্জিত হাজার পৃষ্ঠার একটি মহাকাব্য সৃষ্টি হতে পারে।

কিন্তু নীলকরদের দানবিক মুনাফা-প্রবৃত্তিকে সংযত করার জন্য ইংলণ্ডীয় সরকারের কোনো আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল না; বরং তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে একদিকে কোম্পানীর বল্গা-ছাড়া মুনাফা-লালসাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, অন্যদিকে তাঁরা এদেশে শ্বেতাঙ্গ জমিদার-প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন এবং পরোক্ষভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। তাই দেশীয় জমিদার ও ইংরেজ-বণিকেরা

যাতে টাউন হলে সভা করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন, সেজন্য কলকাতার শেরীফ তাঁদেরকে টাউন হল ব্যবহারের সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার দাবিতে টাউন হলে জনসভা করতে চাইলে শেরীফ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এদেশে একদল ইউরোপীয়কে শ্বেত জমিদার-রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্রিটিশ-সরকারের যে-রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল তা জানা যায় স্যার চার্লস মেটকাফের রিপোর্টে। ভারতীয় ভূস্বামী-সমাজে একদল শক্তিশালী ইউরোপীয় সমর্থক সৃষ্টি করার জন্য ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারির রিপোর্টে মেটকাফ বিলাতের কর্তৃপক্ষের কাছে লিখেছিলেন, "আমাদের ভারত-সাম্রাজ্য সর্বদাই বিপজ্জনক অবস্থায় থাকবে, যদি না আমাদের প্রতি অনুগত একটি প্রভাবশালী শ্রেণী ভারতে শিকড় বিস্তার করে বসতে পারে। সুতরাং আমি মনে করি, আমাদের দেশবাসী-দের ভারতে বসবাসে সাহায্য করবে, এই রকম প্রত্যেকটি পন্থা আমাদের সাম্রাজ্যকে দৃঢ় করবে।"[৫২]

ভারত-সাম্রাজ্যকে নিরাপদে রাখার জন্য অর্থাৎ কৃষক-বিদ্রোহের অগ্নিশিখা থেকে সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য লর্ড বেন্টিঙ্কও তিন মাস পরে (৩০ মে, ১৮২৯ খ্রী:) একই কথা বলেছেন, "ভারতে এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যারা আমাদের বিপদের সময়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে: ভারতের প্রভাবশালী, ক্ষমতাবান, সাহসী লোকদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই আমাদের অপছন্দ করে। আমাদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অসুবিধাগুলিও দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। বিনা বাধায় প্রচুর ইউরোপীয়ের ভারতে বসবাসের দ্বারা আমরা এই বাধাবিঘ্নগুলি কাটিয়ে উঠতে পারব।"[৫৩]

শ্বেত-জমিদারদের কর্তব্য-কর্ম সম্পর্কে হোল্ট ম্যাকেঞ্জি ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে বলেছেন, "ভারতের ইউরোপীয় উপনিবেশকারীরা পুলিশের প্রয়োজনীয় এজেন্ট হতে পারবে, আর তারা হবে সংবাদ আদান-প্রদানের কেন্দ্রস্থল —যেসব সংবাদ আমাদের খুবই দরকার। গ্রামের অধিবাসীদের উপর তাদের প্রভাবও খুব থাকবে, একই মনোভাবের জন্য তারা একই বন্ধন-সূত্রে আমাদের সঙ্গে জড়িত থাকবে।"[৫৪]

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নতুন সনদ গ্রহণের দ্বারা ইংলণ্ডীয় সরকার ইউরোপীয়দের এদেশে জমিজমা কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ও অবাধ বাণিজ্য করার পূর্ণ অধিকার দিলেন। অন্যান্য বিষয়ে রামমোহন-দ্বারকানাথের পরামর্শে ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেননি। তাঁরা বুর্জোয়া-আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে-সব দাবি করেছিলেন —ভারতবাসীদের উচ্চপদে ও অধিক সংখ্যায় সরকারি কার্যে নিয়োগ করা, বিচার-বৈষম্য দূর করে ভারতবাসী ও ইংরেজকে একই আইন, একই আদালতের অধীনে আনা ইত্যাদি বিষয় নতুন সনদে কোন স্থানই পেল না। ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ রাজা রামমোহনের আশানুযায়ী ভদ্র-অভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত,

সঙ্গতিপন্ন-সঙ্গতিহীন ইংরেজদের মধ্যে ছেদ টেনে দেয়নি — সকল ইংরেজই সমান অধিকার-লাভ করল। তারপর থেকে যে-সব নীলকর বাংলদেশে জমিজমা কিনে বা দখল করে জাঁকিয়ে বসতে লাগলেন তাঁদের মধ্যে একজন ডেভিড হেয়ারকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। যাদের পাওয়া গেল তারা প্রায় প্রত্যেকেই নৃশংস, শঠতাপরায়ণ, দুর্বৃত্ত, প্রবঞ্চক, অমানুষ — ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বাগিচাগুলিতে নিগ্রো ক্রীতদাসদের উপরে পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে যারা সিদ্ধহস্ত।[৫৫] এই সময়ে অর্থাৎ ১৮:৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে দাস-ব্যবসা আইনত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে এই দেশের দাস-বাহিনীর কুখ্যাত পরিচালকেরাই ভারতে এসে জমিজমা কিনে নীল, কফি ইত্যাদি বাগিচা-শিল্প প্রতিষ্ঠা করে বাগিচা-শ্রমিকদের সঙ্গে পশুসুলভ ব্যবহার করে। নীল-চাষীদের উপরে তাদের বীভৎস অত্যাচারই বাংলাদেশে নীল-বিদ্রোহ (১৮৬০ খ্রী:) সৃষ্টি করেছিল। 'একটি পরাধীন জাতির পক্ষে কলোনাইজেসনের নীতি যে কী মারাত্মক এক বিভীষিকা, রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তি মাত্রেরই তা জানা। ...রামমোহন প্রার্থিত অবাধ কলোনাইজেসন যদি সত্য-সত্যই ভারতবর্ষে ঘটত, তাহলে বর্তমান কালে সে-বিষয়ে আলোচনা করার জন্য বোধ করি আমাদের কারও অস্তিত্বই থাকত না।'[৫৬]

নীলকরদের হিংস্র-রক্তলোলুপ স্বভাব দেখেও রাজা রামমোহন নীলকরদের কেন সমর্থন করেছিলেন এবং তাঁদেরকে এদেশে জমি কিনে জমিদার হওয়ার অধিকার-দানের জন্য আন্দোলন করেছিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন, "এমন নয় যে, রামমোহন বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, নিশ্চয়ই ছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে অথবা একে উপেক্ষা করে তিনি যখন অত্যাচারীকে সদাশয় বলে চিত্রিত করেন, তখন এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, এই বিষয়টিকে তিনি তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও ব্যবসায়িক স্বার্থের প্রেক্ষিত থেকে বিচার করেছেন, নিগৃহীত চাষীর দৃষ্টিমার্গ থেকে নয়। করেছেন আরও এ কারণে যে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির জন্য ঔপনিবেশিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল মানুষেরা —রামমোহন-দ্বারকানাথের মত ব্যক্তিগণ - টমাস পীককের ভাষায় তাঁদের নিজেদের স্বার্থ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ অভিন্ন বলে গণ্য করতেন।"[৫৬]

সুতরাং বর্ণিত ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, রাজা রামমোহন শ্রেণীস্বার্থের দ্বারা চালিত হয়ে বাংলাদেশে শ্বেতাঙ্গ জমিদার-রূপে নীলকর সাহেবদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলন করেছেন; কারণ তিনি ছিলেন বুর্জোয়া-আদর্শে উদ্বুদ্ধ নয়া ভূস্বামীশ্রেণীর প্রতিনিধি এবং এই নবোদ্ভূত ভূম্যধিকারীশ্রেণী কোম্পানির দেওয়ানি-বেনিয়ানি ও মুচ্ছুদ্দিগিরি করে প্রভূত ধনসম্পদ ও জমিদারির মালিক হয়েছিলেন ও তাঁরাই একদিকে ইংরেজ-নীলকরদের কাছে উচ্চ সেলামী ও উচ্চ খাজনায় জমি পত্তনি দিয়েছিলেন, অন্যদিকে নিজেরা নীল-কারখানা করে শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের মতো সমানভাবে নীল-চাষীদের উপরে পেষণ-পীড়ন করেছেন। C. E. Buckland এর ভাষায় বলা যেতে পারে, "দেশীয় জমিদাররা সাধারণত শ্রেণীগতভাবে নীলকরদের বিরোধী ছিল না।"[৫৮]

৮

অবাধ-বাণিজ্য আন্দোলন

ভারতে ইউরোপীয়দের স্থায়ীভাবে বসবাস ও অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার দানের জন্য উনিশ শতকে যে-আন্দোলন হয়েছিল, সেই আন্দোলনে রামমোহন-দ্বারকানাথ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বরে কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় অবাধ-বাণিজ্য নীতির সমর্থনে তাঁরা বলেছিলেন যে, এদেশে ইংরেজরা যে-সমস্ত শিল্প প্রবর্তন করেছেন, তাতে দেশের মানুষেরা উপকৃত হয়েছেন। তাই তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, বাণিজ্যের বাধা-নিষেধগুলি উঠে গেলে এবং ইউরোপীয়দের এদেশে মূলধন খাটাবার ও স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার সুযোগ দিলে ভারতের উন্নতি হবে; দেশবাসীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, তাঁরা সাহিত্যে, ধর্মে, রাজনীতিতে অগ্রসর হবেন। রাজা রামমোহন উক্ত জনসভায় বলেছেন, "ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি নিশ্চিত যে, ইউরোপীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমাদের আদান-প্রদান যত বৃদ্ধি পাবে, ততই সাহিত্যে, সামাজিক-জীবনে ও রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি ঘটবে।"[১]

কিন্তু অবাধ-বাণিজ্য নীতির দাবিকে সমর্থন করে রামমোহন-দ্বারকানাথ কি ভারতের আধুনিক শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছিলেন? তাঁদের ভূমিকা কি কৃষি-প্রধান ভারতকে শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত করতে সহায়ক হয়েছিল?

এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, "অর্থনৈতিক শোষণই অবাধ-বাণিজ্যের ভিত্তি। তবু একচেটিয়া ব্যবস্থার চেয়ে এই স্তর উন্নততর। তাছাড়া এই স্তর ভারতীয় শিল্পে ধনবাদের অগ্রগতি ঘটাবে। রামমোহন সেজন্য মনোপলি বনাম ফ্রি ট্রেডের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে ফ্রি ট্রেডের পক্ষ গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক-ভাবে এই বণিকতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের বিকাশ

প্রয়োজনীয় ছিল। রামমোহন সেই ইতিহাস-লিখন যথার্থ উপলব্ধি করেছিলেন।"[২] রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে, সকল শ্রেণীর ইউরোপীয়দের সহবাসে কল্যাণ হয় না ; যাঁরা সুশিক্ষিত, ভদ্র, ধর্মানুরাগী, রামমোহন শুধু তাঁদের কথাই ভেবেছিলেন।[৩] রবীন্দ্র-জীবনীলেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "বাংলাদেশের মধ্যযুগীয় শিল্প ও কৃষিনীতি কখনোই বাঙ্গালীর অর্থনীতিকে পুষ্ট করতে পারবে না, একথা তিনি ভালো করেই বুঝেছিলেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রথায় নাল, ইক্ষু উৎপাদন ও তাদের সম্পৃক্ত শিল্পের উন্নতির জন্য ইউরোপীয়দের আগমন তিনি সমর্থন করেন।"[৪] আবার আর একজন লেখক বলেছেন যে, রামমোহন প্রশ্নটাকে আর একভাবে বিচার করেছিলেন। তাঁর মতে রামমোহন পার্লামেণ্টারি কমিটির কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে জনৈক পদস্থ বৃটনের দেওয়া তথ্য উল্লেখ করে দেখিয়েছিলেন যে, "১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ কোটি পাউণ্ড শুধু এই বাবদেই (অর্থাৎ কোম্পানির ইংরেজ-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও পেনসন বাবদ —লেখক) ভারত থেকে বৃটেনে গেছে। রাজা প্রস্তাব করেছিলেন যে, এর চাইতে ইউরোপীয় পুঁজিপতিরা বরং ভারতে বাস করুক স্থায়ীভাবে তাদের পরিবারবর্গকে নিয়ে। তাতে লাভ হবে এই যে, ভারতের অর্থ ভারতে থেকে যাবে এবং সেই অর্থ নিয়োজিত হবে ভারতের কল্যাণে। আরও লাভ হবে, ইউরোপীয়দের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের উন্নততর কৃষিপদ্ধতিও ভারতে প্রবর্তিত হবে।"[৫] আবার সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে রামমোহন ভারতে শিল্প-বিপ্লব ঘটাবার জন্যই অবাধ-বাণিজ্য নীতিকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি বলেছেন, " 'কলোনাইজেসন' এই শব্দটিকে ঘিরে সেদিন যে তুমুল বাদবিতণ্ডা চলছিলো তার মোদ্দা কথাটি ছিল —শিল্প-বিপ্লব চাই কি শিল্প বিপ্লব চাই না। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন শিল্প-বিপ্লবের পক্ষে। অবাধ-বাণিজ্যের নীতি গৃহীত না হলে ভারতের শিল্প-বিপ্লব কিছুতেই ঘটতে পারে না।" তিনি আরো বলেছেন, "ক্যাপিটালিজমের সম্প্রসারণ ও অগ্রগতির জন্যে অবাধ-বাণিজ্যনীতি ছিল সেদিন একমাত্র নীতি। ...সাগরের এপার ওপার —দু'পারেই তখন একচেটিয়া বাণিজ্য-নীতির সঙ্গে অবাধ-বাণিজ্য-নীতির জোর লড়াই চলতে লাগল।"[৬]

অবাধ-বাণিজ্য নীতির পক্ষে রাজা রামমোহনের বক্তব্যকে সমর্থন করতে গিয়ে একালের পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবীরা যে-সমস্ত বক্তব্য উপস্থিত করেছেন তা কি ইতিহাস-সম্মত? তাঁরা কি বিজ্ঞানভিত্তিক ও আবেগবর্জিত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তব ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন? এই সমস্ত প্রশ্নের যথার্থ সঠিক উত্তর পেতে হলে অবাধ-বাণিজ্য-আন্দোলনের উদ্ভব ও তার ফলাফল স্মরণে রাখতে হবে এবং তখনই রাজার ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একদিকে ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে ব্রিটেন ও ইউরোপের বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয়

করে বিপুল পরিমাণে মুনাফা লুটছিলেন এবং অন্যদিকে তাঁরা এই বাণিজ্যিক স্বার্থে ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করছিলেন। '১৭৬৫ সনের মাঝামাঝিতে বিদ্যমান রাজনীতির আপেক্ষিক অবস্থা এই যে স্বাধীনতার প্রয়াসী নবাব মীরকাশিম চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত, মীরজাফরের নাবালক পুত্র নাজমুদ্দৌল্লাহ কোম্পানীর কৃপায় গদীসীন, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লাহ কোম্পানীর কৃপাপ্রার্থী, সাম্রাজ্যহীন সম্রাট শাহ আলম সহায়-সম্পদহীন অবস্থায় নবাব সুজাউদ্দৌল্লাহর হাতে প্রায় বন্দী। এক কথা, আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্যতা নষ্ট হয়ে কোম্পানীই এখন এঅঞ্চলের ভাগ্যবিধাতা, আর দেশীয় রাজশক্তিগুলি অবক্ষয়ের আবর্তে জীবন্মৃত।'[৭]

দেশীয় রাজশক্তিগুলির শক্তিহীনতার সুযোগ নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে ব্যবসার নামে যে-লুণ্ঠন আরম্ভ করেছিলেন, অশ্রুতপূর্ব সেই লুণ্ঠনে সুতীবস্ত্রের মতো রেশম-শিল্পও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বাংলাদেশের রেশম-শিল্পকে উন্নত করার পরিবর্তে কোম্পানির 'ডিরেক্টর্স বোর্ড' ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ মার্চ-এ এক নির্দেশনামার দ্বারা রেশমী বস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ করে দেন এবং কাঁচা রেশম উৎপাদন করার নির্দেশ দেন। তাছাড়া তাঁরা সেই নির্দেশনামায় একথাও বলেছেন যে, যারা রেশমী বস্ত্র তৈরি করে তাদের প্রত্যেককে কোম্পানির ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে হবে ; কেউই ফ্যাক্টরীর বাইরে ঘরে বসে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না। যদি কেউ সেই চেষ্টা করে তবে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।[৮] কোম্পানি-অনুসৃত এই নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটি লিখেছেন, "কোম্পানির এই চিঠিতে তার নীতি সম্বন্ধে এবং বাংলাদেশের রেশম-বস্ত্রের উৎপাদনকারীদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও উৎসাহদানের বিষয়ে একটি নিখুঁত পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। এই নীতি অবশ্যই ব্যাপকভাবে কার্যকরী করতে হবে, আর তা করতে হবে এমন ভাবে যাতে বাংলাদেশের রেশম-বস্ত্রের উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। যাতে এই শিল্পোন্নত দেশটির (অর্থাৎ বাংলাদেশের —লেখক) অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে এবং দেশটি গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পোৎপাদনের চাহিদা অনুযায়ী কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিণত হয়, সেই ভাবেই এই নীতি কার্যকরী করে তোলা অবশ্য কর্তব্য।"[৯]

পার্লামেণ্ট-নির্দেশিত এই 'অবশ্য কর্তব্য' কোম্পানি নিষ্ঠাভরে পালন করেছিলেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশে রেশমী-বস্ত্রের উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং পূর্ববর্তী শতকে যাঁরা ইউরোপ ও এশিয়ার বাজারে বাংলার সুতী ও রেশমী-বস্ত্র রপ্তানি করতেন, তাঁরা এবারে সুতী ও রেশমী-বস্ত্র ক্রমবর্ধমান হারে আমদানি করলেন। পরবর্তী পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ষোল বছরের (১৭৯৪ খ্রী:-১৮০৯ খ্রী:) ইংলণ্ড থেকে রপ্তানিকৃত সুতীবস্ত্রের মূল্যের তালিকাটি[১০] দেখলে বুঝা যাবে যে, গ্রেট ব্রিটেন থেকে ভারতে সুতীবস্ত্রের রপ্তানি কিভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল :

১৭৯৪	খ্রী	...	...	:৫৬	পাউণ্ড	মূল্য
১৭৯৫	,,	...	...	৭১৭	,,	,,
১৭৯৬	,,	...	...	১১২	,,	,,
১৭৯৭	,,	...	...	২,৫০১	,,	,,
১৭৯৮	,,	...	...	৪,৪৩৬	,,	,,
১৭৯৯	,,	...	...	৭,৩১৭	,,	,,
১৮০০	,,	...	---	১৯,৫৭২	,,	,,
১৮০১	,,	...	...	২১,২০০	,,	,,
১৮০২	,,	...	...	১৬,১৯১	,,	,,
১৮০৩	,,	...	...	২৭,৮৭৬	,,	,,
১৮০৪	,,	...	...	৫,৯৩৬	,,	,,
১৮০৫	,,	...	..	১,৯৪৩	,,	,,
১৮০৬	,,	...	..	৪৮,৫২৫	,,	,,
১৮০৭	,,	...	..	৪৬,৫৪৯	,,	,,
১৮০৮	,,	...	...	৬৯,৮৪১	,,	,,
১৮০৯	..	...	...	১,১৮,৪০৮	,,	,,

অর্থাৎ ১৭৯৪ সালে কাপড় আমদানি হয় দেড় হাজার টাকার ; কিন্তু ষোল বছরের মধ্যে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে তার পরিমাণ বেড়ে গিয়ে হল প্রায় ১২ লক্ষ টাকা এই লুণ্ঠনের হার ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। ইংরেজরাও এই অমানুষিক শোষণ-লুণ্ঠনকে গোপন করতে পারেননি। উইলসন সাহেব মন্তব্য করেছেন, "১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মেশিনের সুতো ও কাপড় পৌঁছুতে শুরু করল। ১১ বছরের মধ্যে কলকাতাতে এই আমদানির মূল্য এক লক্ষ সিক্কা টাকার কম থেকে ৩৩ লক্ষ টাকায় উঠল।"[১১]

ভারত থেকে বস্ত্র-রপ্তানির হার ক্রমশ কমিয়ে দিয়ে ব্রিটেন থেকে বস্ত্র-আমদানির হার বাড়ানোর জন্য তাঁরা এদেশে বস্ত্র-উৎপাদন হ্রাসকল্পে তাঁতিদের উপরে অমানুষিক অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছেন। উইলিয়ম বোল্টস লিখেছেন, "ইহা অতীব সত্য যে কোম্পানির বিনিয়োগনীতি ও কর্মচারীদের আভ্যন্তরীণ প্রাইভেট ব্যবসা এমন অত্যাচার-উৎপীড়ন সৃষ্টি করেছে যে, এর কবল থেকে কোন তাঁতী কারিগরের রক্ষা পাবার উপায় নেই। দেশের প্রত্যেকটি উৎপাদনের উপর ইংরেজের একচেটিয়া বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইংরেজ-ব্যবসায়ীরা তাদের বানিয়া ও দালালদের সহায়তায় নিজেরাই সিদ্ধান্ত করে জিনিষের সরবরাহের পরিমাণ ও মূল্য। ...তাঁতীদের বলপূর্বক বাধ্য করা হয় আগাম গ্রহণ করতে। আগাম নিতে অস্বীকার করলে এমনও শুনা যায় যে তাঁতীকে ডেকে এনে গাঁইটে আগাম গুঁজে দিয়ে বেত্রাঘাতে বিদায় করা হয় এবং বলা হয় নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র নির্দিষ্ট সময়ে দিতে। ...একবার আগাম গ্রহণ করলে তাঁতীর উপায় নেই অন্য

কারও কাছে বাজারমূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করায়। গোমস্তারা তাঁর সরবরাহকৃত বস্ত্রের উপর যে মূল্য ধার্য করে তা বাজারমূল্যের চাইতে শতকরা পনর থেকে চল্লিশ ভাগ কম। তাঁতীরা যেন পালিয়ে না যায় বা গোপনে অন্যের কাছে বস্ত্র বিক্রয় না করতে পারে সেজন্য তাদের উপর নিয়ত খবরদারী করার জন্য পিয়ন নিযুক্ত করা হয়।"[১২]

কার্ল মার্কস বলেছেন, "ঔপনিবেশিক অভিযানের ফলে বাণিজ্য ও বাষ্পীয় যানের আশ্চর্য বিকাশ হল। বাণিজ্যের সনদ পেল যে সব কোম্পানি, তারা বণিকশ্রেণীর প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের কাজে সহায় হল। উপনিবেশগুলি উদীয়মান বণিকদের পণ্যের বাজার তো হলই, সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একচেটিয়া বাজারে পরিণত হয়ে দ্রুত মূলধন সঞ্চয়ে তাদের সাহায্য করল। প্রভুত্ব করে, লুঠতরাজ করে, খুনজখম করে ইউরোপের বাইরে থেকে এইভাবে তারা যে ধনসম্পদ সঞ্চয় করতে আরম্ভ করল, অজস্র ধারায় সেই সম্পদ স্বদেশের ভাণ্ডারে এসে জমা হয়ে রূপান্তরিত হল মূলধনে।"[১৩] এই উক্তি ভারতের ক্ষেত্রেও নির্মম সত্য। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে ইউরোপ থেকে সোনা-রূপা নিয়ে এসে ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। কিন্তু 'পলাশীর পর থেকে কোম্পানী ইউরোপ থেকে সোনা-রূপার আকারে পুঁজি আনা প্রায় বন্ধ করে দেয়। তখন থেকে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির মোটা অংশ মুর্শিদাবাদের মসনদে নবাব-উঠানো-বসানোর রাজনীতি থেকে আদায় করা হয়। কিন্তু দস্যুবৃত্তি কোন স্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে না। পুঁজি জোগানোর কোন স্থায়ী উপায় বের করা চাই। ক্লাইভ এর উপায় বের করেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার দীউয়ানী লাভ করে।'[১৪] এই দেওয়ানি থেকে তাঁরা যে-অর্থ সংগ্রহ করেছেন, তা কোম্পানির তথাকথিত 'ব্যবসায়ে' লগ্নি করেছেন এবং মুনাফার টাকা ভারত থেকে ইংলণ্ডে পাচার করেছেন। সেই লুণ্ঠিত অর্থ ইংলণ্ডের শিল্পে বিনিয়োগের জন্য মূলধনে রূপান্তরিত হয়েছে। এ সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র বাগল মন্তব্য করেছেন, "১৮০৭ সালে হিসেব করে দেখা যায়, এদেশে থেকে পূর্ববর্তী ত্রিশ বছরে এক হাজার পঁচাশি কোটি টাকা বিলাতে চলে গিয়েছে। তখন ভারতবর্ষের অতি সামান্য অংশই ইংরেজের অধীনে ছিল। ভারতের অর্থে ইংরেজ ধনী হচ্ছে, আর সাধারণ ভারতবাসী ক্রমশ: নি:স্ব হয়ে পড়েছে।"[১৫]

শ্রী বাগলের উক্তি অতিরঞ্জিত কিংবা অনৈতিহাসিক নয়। তাঁর উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় বেণ্টিঙ্কের চিঠিতে। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে লর্ড বেণ্টিঙ্ক মি: নর্টনকে লেখা এক চিঠিতে বলেছেন, "কে না জানে, যে-সব বিত্ত, সম্পত্তি ও মূল-ধনকে আশ্রয় করে এযাবৎ কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠেছে—তার প্রায় সবটুকুই এসেছে এদেশীয়দের কাছ থেকে।"[১৬]

এভাবে 'শিল্পজীবী ভারতবর্ষের সমগ্র মূর্তি পরিবর্তিত হইয়া গ্রেট ব্রিটেনের কলের জন্য উপকরণ দ্রব্যের (সূতা ইত্যাদি) উৎপাদন-ক্ষেত্রে পরিণত

হইয়াছিল।'[১৭] তাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এই নৃশংস শোষণ-অত্যাচারের কোনো প্রতিক্রিয়া সেদিন ইংলণ্ডে দেখা যায়নি ; সাম্রাজ্যের স্বার্থে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলগুলি নীরব ছিল। অথচ 'গোটা ১৮শ শতক ধরে ভারত থেকে ইংলণ্ডে যে ধন প্রেরিত হয় তা অর্জিত হয়েছিল অপেক্ষাকৃত নগণ্য বাণিজ্যের দরুণ ততটা নয়, যতটা সে-দেশের প্রত্যক্ষ শোষণের দরুণ এবং যে বিপুল ঐশ্বর্য জোর করে আদায় করে ইংলণ্ডে পাচার করা হয়েছিল তার দরুণ।'[১৮] এবং এই লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য দিয়েই গড়ে তোলা হয়েছিল ইংলণ্ডের আধুনিক কলকারখানা।

ভারত-লুণ্ঠনের পূর্বে ইংলণ্ডের কেউ শিল্প-বিপ্লবের কথা চিন্তা করতে পারেননি। কারণ শিল্প-স্থাপনের জন্য যে-বিপুল পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন তা ইংলণ্ডের ছিল না। ফলে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বণিক-পুঁজিপতিদের (Mercantile Capitalist) স্বার্থ রক্ষাই গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ভারতের লুণ্ঠিত ধনসম্পদের দ্বারা ইংলণ্ডের শিল্প-পুঁজির সৃষ্টি হয় এবং তারফলেই দেখা দেয় ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব। এসম্পর্কে ব্রুক এডামস বলেছেন, "পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই বাংলাদেশের লুণ্ঠিত ধনসম্পদ ইংলণ্ডে পৌছাতে আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ফল দেখা দেয়। কারণ বিশেষজ্ঞরা একথা স্বীকার করেন যে, যে-শিল্পবিপ্লব উনিশ শতককে পূর্ববর্তী সকল যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, সেই শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয়েছিল ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে (অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের মাত্র তিন বছর পর থেকে — লেখক)। ...ইংলণ্ডে ভারতের ধনসম্পদ এসে পৌছুবার এবং ঋণ-ব্যবস্থার প্রবর্তনের পূর্বে প্রয়োজনারূপ শক্তি (অর্থাৎ মূলধন) ইংলণ্ডে ছিল না। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭ খ্রী:) পর্যন্ত ইংলণ্ডের সমৃদ্ধির গতি ছিল অতি ধীর, কিন্তু ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই গতি হয়েছিল অত্যন্ত দ্রুত ও বিস্ময়কর।"[১৯]

শিল্প-বিপ্লবের ফলে গ্রেট বৃটেনের অর্থনৈতিক জীবনে দু'টি বিরোধী স্বার্থের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটল —একদিকে বাণিজ্যপতি (Mercantile Capitalist), অন্যদিকে শিল্পপতি (Industrial Capitalist)। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন উৎকৃষ্ট ভারতীয় বস্ত্র ইংলণ্ডের বাজারে রপ্তানি করে প্রচুর মুনাফা লুটছিলেন, তখন নবজাত বস্ত্র-শিল্পের মালিকেরা ব্রিটেনের বাজারে ভারতীয় বস্ত্র-বিক্রয় নিষিদ্ধ করার দাবিতে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুললেন। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে এবং পরে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের চেষ্টায় ভারতে প্রস্তুত শিল্প ও ক্যালিকো ইংলণ্ডে আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ভারতে প্রস্তুত তুলাজাত দ্রব্যের উপরে ক্রমশ অত্যধিক শুল্ক চাপানো হতে থাকে।[২০] 'তৃতীয় উইলিয়ম, ১১ ও ১২ অ্যাক্ট, ক্যাপশন ১০ আইন বলে ভারত, পারস্য ও চীন থেকে আমদানি করা রেশমী-বস্ত্র ও ছাপা বা রঙ-করা ক্যালিকো পরা নিষিদ্ধ হল ও তার পরিধানকারী বা বিক্রয়-কারী সকলের উপরেই ২০০ পাউণ্ড জরিমানা ধার্য হল। পরে যাঁরা 'আলোক-

'প্রাপ্ত' হয়ে উঠেন সেই ব্রিটিশ মাল-উৎপাদকদের বারম্বার বিলাপে ১ম, ২য় ও ৩য় জর্জের আমলেও অনুরূপ আইন হয়। এইভাবে ১৮শ শতকের বেশির ভাগটা ধরে ভারতের মাল ইংলণ্ডে সাধারণত আমদানি করা হত ইউরোপীয় মহাদেশে বিক্রয়ের জন্য।'[২১]

এইভাবে গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পপতিরা ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে ব্রিটিশ-সরকারের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ভারতের বাজারের উপরে ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের লোভ অনেক আগে থেকেই পড়েছিল। তাঁদের কাছে ভারতের বাজার ছিল 'এক খাঁটি স্বর্ণখনি'। তাই তাঁদের স্বার্থে ব্রিটিশ-পার্লামেণ্ট ভারতের শিল্প ধ্বংস করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে থাকে। '১৭৭৩ সালের আইনে কোম্পানির সনদ ১৮১৪ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে এই ব্যবস্থা করা হল যাতে প্রায় সব রকমের পণ্যই কোম্পানি-বহির্ভূত ব্যক্তিবিশেষ ইংলণ্ড থেকে রপ্তানি এবং কোম্পানির ভারতীয় কর্মচারীরা ইংলণ্ডে আমদানি করার অধিকার পায়। কিন্তু এই সুবিধাদান এমন সব শর্ত দিয়ে বাঁধা হয় যাতে ব্রিটিশ-ভারতে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের রপ্তানির ক্ষেত্রে তার কোনো ফল পড়ল না।'[২২]

অথচ এই যুগ ছিল ইংলণ্ডে বণিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে শিল্পপতিদের, বাণিজ্য-ধনিকদের বিরুদ্ধে শিল্প-ধনিকদের সংঘর্ষের যুগ। আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তার —এই উভয় উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য শিল্পপতিরা বণিকতন্ত্রের একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের পরিবর্তে অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার দাবি করেছিলেন। তাঁদের অন্তরের কামনা অভিব্যক্ত হয়েছিল টমাস মান-এর 'England's Treasure by Foreign Trade' গ্রন্থে — "ধনসম্পদ সঞ্চয় করতে হলে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করাই সাধারণ উপায়। কিন্তু এই উপায় সম্বন্ধে সব সময়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিদেশীদের জিনিস আমরা যা ব্যবহার করব তার চেয়ে বেশি জিনিস বিদেশীদের কাছে আমাদের বিক্রি করতে হবে।"[২৩] সুতরাং ব্রিটিশজাত পণ্যের জন্য ভারতের বাজার প্রয়োজন। শিল্প-বিপ্লবের পর ইংলণ্ডে বহু কলকারখানা গড়ে উঠেছিল এবং নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্য বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছিল। ভারতের বাজার ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন বাজার তাঁদের কাছে বন্ধ ছিল। নেপোলিয়ন ব্রিটেনের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য ইউরোপের বন্দরগুলিতে ব্রিটিশ-দ্রব্যাদির রপ্তানি একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে ইংলণ্ডের শিল্প-জগতে সঙ্কট দেখা দিল। ব্রিটেনের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্পগুলি সমাজ-জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছিল এবং বস্ত্রশিল্পের মালিকেরা প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ-রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্ণধার-রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই 'প্রত্যেকটা বাণিজ্য-সঙ্কটেই পূর্ব ভারতীয় বাণিজ্য ব্রিটিশ সুতী-কারখানা-মালিকদের পক্ষে হয়ে উঠেছে ক্রমেই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভারতীয় মহাদেশ হয়েছে আসলে তাদের সেরা বাজার। যে হারে সুতা মাল উৎপাদন হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্রিটেনের গোটা সমাজ-কাঠামোর পক্ষে মূল স্বার্থ, ঠিক সেই হারেই পূর্ব ভারতও হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্রিটিশ সুতা মাল উৎপাদনের পক্ষে মূল স্বার্থ।'[২৪]

শিল্পক্ষেত্রে ইংলণ্ড ছিল অন্যান্য দেশগুলি থেকে অনেক বেশি অগ্রসর ; শিল্প-জগতে তার তখন একচেটিয়া অধিকার বললেই চলে। তাই শ্রেণীস্বার্থে ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা 'অবাধ-বাণিজ্য নীতি'র ধ্বনি তুললেন। এই 'অবাধ-বাণিজ্য নীতি'র প্রকৃত অর্থ হল, যখন অন্য কোনো দেশে ইংলণ্ডের মত শক্তিশালী শিল্প দেখা দেয়নি, তখন বিশ্বের বাজারে স্বাধীন ও সমতামূলক প্রতিযোগিতার অধিকার দাবি করে অনুন্নত দেশের বাজার দখল করা। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রভুত্ব বিস্তারের জন্যই ব্রিটেনের শিল্পপতিরা অবাধ-বাণিজ্যাধিকারের দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু কোনো স্বাধীন দেশই —আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, কেউই 'অবাধ-বাণিজ্য নীতি' মেনে নেয়নি। উপরন্তু তারা সকলেই কঠোর শিল্প-সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে তাদের জাতীয় শিল্প গড়ে তুলেছিল এবং ব্রিটিশ-পণ্যের বিরুদ্ধে উচ্চহারে শুল্ক বসিয়ে ইংলণ্ডের অবাধ-বাণিজ্যের অধিকারের দাবি প্রতিরোধ করেছিল। এমন কি চীনও অবাধ-বাণিজ্যের নামে ব্রিটিশ-শোষণকে প্রতিহত করেছিল।

হাউস অব কমন্সের দ্বারা নিযুক্ত কমিটির সামনে ১৮৩০ সালে চীন দেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে চার্লস মার্জোরিব্যাঙ্কস্ বলেছেন, "দেশীয় শিল্প ও উৎপাদনকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা চীন-সরকারের রয়েছে। পশম-বস্ত্রের উপরে উচ্চহারে শুল্ক ধার্য করাই হচ্ছে তার নিদর্শন। চীনে পশম-বস্ত্রের মূল্য হল সাধারণত ৪০ ডলার, কিন্তু তার উপরে শুল্ক ধার্য করা হয়েছে ১৮ ডলার অর্থাৎ বিক্রয়-মূল্যের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ শুল্ক। ভারত-সাম্রাজ্যে আমরা যা করেছি, চীনাদের প্রতি তা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। উচ্চহারে নিষেধাজ্ঞামূলক কর ধার্যের দ্বারা আমরা ইংলণ্ডের বাজার থেকে ভারতীয় পণ্যগুলিকে বহিষ্কার করেছি এবং আমাদের নিজেদের উৎপাদিত পণ্য-গুলিকে ভারতে ব্যবহার করার জন্য আমরা প্রবলভাবে উৎসাহ দিয়েছি (অর্থাৎ জুলুম করেছি - লেখক)। স্বার্থপর নীতির দ্বারা আমরা ঢাকা ও অন্যান্য স্থানের দেশীয় পণ্যগুলিকে হঠিয়ে দিয়ে তাদের দেশকে আমাদের পণ্যের দ্বারা প্লাবিত করেছি। কিন্তু চীনে সে-ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা উচ্চহারে শুল্ক ধার্যের দ্বারা তাদের পণ্যগুলিকে আমাদের দেশে নিষিদ্ধ করতে পারি, কিন্তু আমাদের শর্তে আমাদের পণ্যগুলিকে গ্রহণ করতে চীনাদের আমরা বাধ্য করতে পারি না। নিজেদের রক্ষা করার ব্যাপারে তারা যথেষ্ট বিচক্ষণ।"[২৫]

সুতরাং ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হত এবং নেতারা যদি বিচক্ষণ হতেন, তাহলে ভারতও ব্রিটিশ-পণ্যের অবাধ আমদানির বিরুদ্ধে শিল্প-সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতে পারত। এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক এইচ. এইচ. উইলসন। তিনি লিখেছেন, "ভারত যদি স্বাধীন হত, তবে সেও প্রতিশোধ নিত, ব্রিটেনজাত দ্রব্যসামগ্রীর উপরে নিষেধাজ্ঞামূলক মাশুল আরোপ করত এবং এইভাবে তার নিজের উৎপাদনশীল শিল্পকে ধ্বংসের হাত

থেকে রক্ষা করত। তাকে এই আত্মরক্ষার অধিকার দেওয়া হয়নি। সে আগন্তুকের করুণার উপরে নির্ভরশীল ছিল। ব্রিটেনজাত পণ্যসামগ্রী বিনা শুল্কে তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে-প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে তারা কখনোই এঁটে উঠতে পারত না তাকে দাবিয়ে রাখা ও শেষ পর্যন্ত কণ্ঠরোধ করে হত্যা করবার জন্য বিদেশী পণ্য-উৎপাদনকারীরা রাজনৈতিক অবিচারের হাতিয়ারকে ব্যবহার করেছিল।"[২৬] সুতরাং সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সম্প্রসারণ এবং আধুনিক শিল্পোন্নয়নের জন্য অবাধ-বাণিজ্য নীতি অনুন্নত পরাধীন ও দুর্বল দেশগুলির স্বার্থ-রক্ষার পক্ষে সহায়ক ছিল না। কারণ 'নিজ প্রযুক্তিগত আর আর্থনীতিক প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ভারতকে ব্রিটিশ-পণ্যদ্রব্যের একটা বড় রকমের বাজারে পরিণত করার জন্য ব্রিটেনকে জবরদস্তি উপায়ে ভারতের স্বাভাবিক বিচ্ছিন্নতা ভাঙতে হয়েছিল, ঠিক যেমনটা ব্রিটেন করেছিল ভারতকে কাঁচামালের জোগানদার হিসেবে বিশ্ববাজারে নিয়ে ফেলবার জন্য। এদিকে প্রথম পদক্ষেপের ফলে ভারতের শুল্ক সংক্রান্ত স্বাধীনতা প্রথমে লণ্ডভণ্ড এবং ব্রিটিশ-দখল সম্প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ-শিল্প আর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার ফলে সবচেয়ে প্রচণ্ড আঘাত পড়েছিল ভারতীয় কারিগরী শিল্পের সেইসব শাখার উপর, যেগুলো আগেই কৃষির সঙ্গেকার স্বাভাবিক সম্পর্কতন্ত্র থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ কিনা, সবচেয়ে বিপন্ন হয়েছিল ভারতের অর্থনীতির সবচেয়ে অগ্রসর অংশগুলো। যেসব ক্ষেত্রে উৎপাদন-সম্পর্ক এবং সামাজিক শ্রমবিভাগ সবচেয়ে সুপরিণত হয়ে উঠেছিল সেগুলোই বৈদেশিক প্রতিযোগিতার ফলে সবচেয়ে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল।'[২৭]

ব্রিটিশ-শিল্পপতিদের চাপে ইংলণ্ডীয় সরকার ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ পুনর্নবীকরণের সময়ে ভারতবর্ষে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা করার অধিকার কেড়ে নিয়ে কতকগুলি শর্তে ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য করার অধিকার দিলেন। ফলে বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যান্য অংশ ব্রিটিশ-পণ্যের অসহায় শিকারে পরিণত হল। ইংলণ্ডে নির্মিত উৎকৃষ্ট ও সুলভ মূল্যে লভ্য বস্ত্রের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় ভারতের তৈরি তাঁতবস্ত্র আত্মরক্ষা করতে পারল না। কলকাতায় ব্রিটিশ-পণ্য রপ্তানি করার জন্য ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা যেখানে শতকরা ২½ ভাগ শুল্ক-কর দিত, সেখানে ভারতীয় পণ্যকে ইংলণ্ডে প্রবেশের জন্য শতকরা ১০ থেকে ১০০০ পর্যন্ত শুল্ক-কর দিতে হত।[২৮] এর বিষময় ফল ভারতীয় বস্ত্রের বাজারে দেখা গেল। কলকাতা যেখানে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে ২০ লক্ষ স্টার্লিং মূল্যের সুতীবস্ত্র রপ্তানি করেছিল, সেখানে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা ২০ লক্ষ স্টার্লিং মূল্যের ইংলণ্ডে নির্মিত বস্ত্রসম্ভার আমদানি করে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ব্রিটিশ-বস্ত্রের আমদানির পরিমাণ ছিল ১,২১,০০০ পাউণ্ড আর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৪০,০০,০০০ পাউণ্ড।[২৯]

ব্রিটিশ-সরকারের এই বৈষম্যমূলক শোষণ-নীতির ফলে কলকাতা বন্দর থেকে গ্রেট ব্রিটেনে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি ১৮১৩ সালের পর থেকে কী পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল এবং ভারতীয় শিল্পসমূহ কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল তা নিচের তালিকা[৩০] দেখলে বুঝা যায় :

বৎসর (খ্রীষ্টাব্দ)	তুলা (গাঁইট)	তুলাজাত কাপড়ের থান (গাঁইট)	রেশম (গাঁইট)	রেশমজাত থান (গাঁইট)
১৮১৩	১১,৭০৫	৫৫৭	৬৩৮	হিসেব দেওয়া নেই
১৮১৪	২১,৫৮৭	৯১৯	১,৭৮৬	,,
১৮১৫	১৭,২২৮	৩,৮৪২	২,৭৯৬	,,
১৮১৬	৮৫,০২৪	২,৭১১	৮,৮৮৪	,,
১৮১৭	৫০,১৭৬	১,৯০৪	২,২৬০	,,
১৮১৮	১,২৭,১২৪	৬৬৬	২,০৬৬	,,
১৮১৯	৩০,৬৮৩	৫৩৬	৬,৯৯৮	৪৬৮
১৮২০	১২,৯৩৯	৩,১৮৬	৬,৮০৫	৫২২
১৮২১	৫,৪১৫	২,১৩০	৬,৯৭৭	০০৪
১৮২২	৬,৫৪৪	১,৬৬৮	৭,৮৯৩	৯৫০
১৮২৩	১১,৭১৩	১,৩৫৪	৬,৩৫৭	৭৪২
১৮২৪	১২,৪১৫	১,৩৩৭	৭,০৬৯	১,১০৫
১৮২৫	১৫,৮০০	১,৮৭৮	৮,০৬১	১,৫৫৮
১৮২৬	১৫,১০১	১,২৫৩	৬,৮৫৬	১,২৩৩
১৮২৭	৪,৭৩৫	৫৪১	৭,৭১৯	৯৭১
১৮২৮	৪,১০৫	৭৩৬	১০,৪৩১	৫৫০
১৮২৯	...	৪৩৩	৭,০০০ (?)	...

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের ব্যবসায়ীদের কাছে ভারতের বাণিজ্য উন্মুক্ত হওয়ায় ইংলণ্ডের ভারতীয় পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ১৮১৫ সালে হঠাৎ তেজী ভাব লক্ষ্য করা যায় ; কিন্তু তা ছিল সাময়িক। কারণ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইংলণ্ডে ভারতীয় সূতীবস্ত্রের রপ্তানি ক্রমাগতই হ্রাস পায় এবং কোনো সময়েই তা উর্ধ্ব-মুখী হয়নি। কেবলমাত্র ইংলণ্ডের বাজারে নয়, ইউরোপ এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশেও ভারতীয় সূতীবস্ত্রের রপ্তানির ক্রমহ্রাসমান চেহারা পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকায় ১৮০১ সালে ১৩,৬৩৩ গাঁইট সূতীবস্ত্র রপ্তানি হয়েছিল ; ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২৫৮ গাঁইট রপ্তানি হয়। ১৮০০ সনে ডেনমার্কে রপ্তানি হয়েছিল ১৪৫৭ গাঁইট, আর ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ১৫০ গাঁইটের বেশি রপ্তানি হয়নি। ১৭৯৯ সালে পর্তুগাল যেখানে ভারতীয় বস্ত্র ৯৭১৪ গাঁইট আমদানি করেছিল, সেখানে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ১০০০ গাঁইটের বেশি বস্ত্র আমদানি করেনি।[৩১] এইভাবে ভারতীয় পণ্যসমূহের রপ্তানি একদিকে যেমন ক্রমাগত কমে

গিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি ব্রিটিশ-পণ্যের আমদানি ক্রমাগত বেড়ে গিয়েছিল। কলকাতা-বন্দরে ব্রিটিশ-পণ্য আমদানির নিম্নলিখিত তালিকায়[৪২] ভারত-শোষণের নগ্ন রূপ দেখা যায় :

বৎসর খৃষ্টাব্দ	মোটা পশমী বস্ত্র	তুলার সূতা (পাউণ্ডে)	তুলা পাকানো (পাউণ্ডে)	সূতা কাটার ফলে পাকানো সূতা (পাউণ্ডে)	থান মূল্য (পাউণ্ড, স্টার্লিংয়ে)	মদ্য মূল্য (পাউণ্ড, স্টার্লিংয়ে)
১৮১৩	৩,৩৮১	হিসেব নেই	হিসেব নেই	হিসেব নেই	হিসেব নেই	৫২,২৫৩
১৮১৪	৪,৬৩৫	,,	,,	,,	,,	৫৭,২০১
১৮১৫	৩,৯০৮	,,	,,	,,	,,	৫৯,৪৬২
১৮১৬	৩,৭০৭	,,	,,	,,	,,	৫৬,৪১১
১৮১৭	২,৩৫৫	,,	,,	,,	,,	৫৩,১৫৭
১৮১৮	৫,৬১৩	,,	,,	,,	,,	৩৬,৭১২
১৮১৯	৯,২৪৪	,,	,,	,,	,,	২০,৯৮৮
১৮২০	৫,৫৪৬	,,	,,	,,	,,	২৬,০৪৯
১৮২১	৭,৫৯০	,,	,,	,,	,,	৩০,৩৮১
১৮২২	৫,১০৮	,,	,,	,,	,,	৪৬,২৩৫
১৮২৩	৭,৩১৬	,,	,,	,,	৬৪,৪৪৯	৩০,১২৯
১৮২৪	৫,৪০১	,,	,,	,,	৪৩,০৩০	২২,৪৩৯
১৮২৫	১৩,৯৮১	,,	,,	,,	১,৫৮,০৭৬	১৪,২২৩
১৮২৬	৯,৬২৯	,,	,,	,,	১,৭৮,৪৮১	৫৬,০৫৮
১৮২৭	৫.৪৩০	৮২,৭৭৮	৪,৩২,৮৭৮	৩,৩৯ ২৭৪	২,৯৬,১৭৭	৮০,৫৯৫
১৮২৮	৭,৬০৯	১,৪৯ ০৭৬	৬,৪২,৩০৬	৪,৬৪,৭৭৬	২,৩৫,৮৩৭	৪১,১৪২
১৮২৯	১১,৮৩৮	৯৮,১৫৪	৩,৯৮,৯৩০	৯,১৮,৬১৬	১ ৯৭,২৯০	৩১,৩১১

উপরের তথ্যসমূহ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টারি কমিটির কাছে সাক্ষ্যদানকালে প্রকাশিত হয়। সুতারাং রাজার অবাধ বাণিজ্যের সমর্থকেরা বলতে পারেন যে, রামমোহন যখন অবাধ-বাণিজ্য আন্দোলন সমর্থন করেন, তখন বাণিজ্যের নামে ব্রিটিশ-শিল্পপতিদের ভারত-লুণ্ঠন সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য জনসমক্ষে উপস্থিত হয়নি, তাই তিনি এসম্পর্কে তথ্যসহ তাঁর বক্তব্য পার্লামেণ্টারি কমিটির কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে উপস্থিত করতে পারেননি। তিনি কেবলমাত্র কোম্পানির কর্মচারী-দের বেতন-ভাতা-পেনসন বাবদ ভারতের অর্থ ইংলণ্ডে পাচার করার ঘটনা (যা তিনি জানতেন) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইতিহাস এই জাতীয় বক্তব্যকে সমর্থন করে না। কারণ প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী রাজা রামমোহন অতীত ইতিহাস ও সমসাময়িক ঘটনা সমূহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন ; নিয়মিত ভাবে তিনি দেশী ও বিদেশী সংবাদপত্র পাঠ করতেন। আর দেশীয় সংবাদপত্রে 'কলোনাইজেশন

মুভমেণ্ট'-এর বিরোধিতা করে যুক্তিধর্মী ও তথ্যনির্ভর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা ইংলণ্ডের লুব্ধ শিকারীদের কাছে অসহায় ভারতের আত্মদানের কাহিনীও প্রকাশ করেছেন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারির India Gazette পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে হিন্দু কলেজের 'একজন ছাত্র' বিভিন্ন ঔপনিবেশিক শক্তির উপনিবেশ-শোষণের চিত্র তুলে ধরে 'কলোনাইজেসন'-আন্দোলন যে ভারতের উন্নতির পক্ষে সহায়ক নয়, তা বিভিন্ন যুক্তি-তথ্য উপস্থাপনের দ্বারা প্রমাণ করেন। কিন্তু রাজা রামমোহন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে বিরুদ্ধপক্ষের প্রত্যেকটি বক্তব্যের জবাব দিলেও উক্ত প্রবন্ধটি সম্বন্ধে কোনো অভিমত ব্যক্ত করেননি, নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন। ঔপনিবেশিক-শক্তির সমালোচনা সম্ভবত তাঁর মনঃপূত হয়নি।

২. ৯. ১৮২৬, ১৭. ১১. ১৮২৭ ও ১৫. ১২. ১৮২৭ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা নিষ্করুণ ভারত-লুণ্ঠনের কাহিনী প্রকাশ করেছেন। ২. ৯. ১৮২৬ খ্রী:-এর উক্ত পত্রিকা থেকে জানা যায়: "এতদ্দেশে ইউরোপীয় বস্ত্রের আমদানি কিরূপে বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হইতেছে তাহা নীচের লিখিত হিসাব দেখিলে সকলেই বোধ করিতে পারিবেন:

বৎসর খ্রীষ্টাব্দ				কাপড়ের মূল্য
১৮১৫	...	...	...	১,৪৯,০৬৮
১৮১৬	...	...	...	১,৬৩,৬১৫
১৮১৭	...	...	...	৪,২৩,৮৩৪
১৮১৮	...	...	...	৭,০১,৫৯২
১৮১৯	...	...	...	৪,৬৬,০১৬
১৮২০	...	...	...	৮,৬৩,৬৩১
১৮২১	...	...	...	১১,৩৬,০৭৪
১৮২২	...	...	...	১১,৬৭,২৪৬
১৮২৩	...	..	...	১১,৮১,৬৭১
১৮২৪	...	...	...	১১,৩৮,১৬৭"

১৫.১২.১৮২৭ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' বলেছেন, "বস্ত্রের বিষয়ে রপ্তানির অতি অল্পতা হইয়াছে যেহেতুক ১৭৯২ সালে এদেশ হইতে বার লক্ষ তেইশ হাজার থান কাপড় ইংলণ্ডে যায় তৎপরে এই বাণিজ্য এমত পতিত হয় যে ১৮২২ সালে কেবল এক লক্ষ থান কাপড় এদেশ হইতে রপ্তানি হয়। ইহাতে দেখা যায় যে ইহার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যত রপ্তানি হইত তাহার বারো ভাগের এক ভাগ এক্ষণে রপ্তানি হয়। পুনশ্চ যদি আমরা আমদানির দিকে দৃষ্টি করি তবে দেখিতে পাই যে বাণিজ্য বিষয়ে এমত বৃদ্ধির তুলনা নাই যেহেতুক ১৭৯২ সালে এতদ্দেশে ১৬৫০

টাকার বিলাতী কাপড় আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকার কাপড় এদেশে আমদানি হয়। এই উভয় একত্র করিলে দেখা যায় যে এদেশের এমত রপ্তানির ন্যূন হইয়াছে যে বারো ভাগের এক ভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে এবং আমদানির অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এই আমদানির বৃদ্ধি হওয়াতে যে তাঁতিরদের ব্যবসায় একেবারে লুপ্ত হইল ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই। ১৭৯২ সালে তের লক্ষ টাকার তাম্র এদেশে আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে একেবারে ত্রিশ লক্ষ টাকার তাম্র আইসে। পাতি লোহার আমদানিরও অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৭৯২ সালে দুই লক্ষ সত্তরি হাজার টাকার লোহার আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে পোনর লক্ষ টাকার লোহা আইসে। ঘড়ী ও রূপ্যময় বাসনের আমদানিরও অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৭৯২ সালে পঞ্চাশ হাজার টাকার এই সকল দ্রব্য আমদানি হইয়াছে। পশমী কাপড়েরও আমদানি বাড়িয়াছে। ১৭৯২ সালে এগার লক্ষ টাকার কাপড় আসিয়াছিল পরে ১৮২২ সালে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার পশমী কাপড়ের আমদানি হয়।"[৩৪]

১৮১৩ সালের আইনে অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার সীমাবদ্ধভাবে স্বীকৃত হওয়ায় "বাণিজ্যের গোটা চরিত্রই বদলে যায়। ১৮১৩ সাল পর্যন্ত ভারত ছিল প্রধানত রপ্তানিকারী দেশ আর এখন সে হয়ে দাঁড়াল আমদানিকারক এবং এমন দ্রুতগতিতে যে, ১৮২৩ সালেই যে-বিনিময় হার ছিল সাধারণত টাকায় ২শি: ৬পে: তা নেমে গেল ২ শিলিঙে। অবিস্মরণীয় কাল থেকে দুনিয়ার সূতী মালের বৃহৎ কারখানা ভারতবর্ষ এবার ভেসে গেল ইংরেজী টুইস্ট ও সূতীবস্ত্রে। ভারতের নিজস্ব উৎপন্নকে ইংলণ্ড থেকে বহিষ্কৃত করা বা কেবল অতি কঠোর শর্তে প্রবেশানু-মতি দেবার পর ব্রিটিশ কারখানার মাল অল্প এবং নামমাত্র শুল্কে প্লাবিত হতে থাকল ভারতে যার ফলে তার একদা অতো বিখ্যাত দেশীয় সূতীবস্ত্রের ধ্বংস হল।"—ব্রিটেনের ভারত-লুণ্ঠনের চেহারা দেখে এই মন্তব্য করেছেন ভারতবন্ধু কার্লমার্কস। এদেশ-দোহনের চিত্র সমসাময়িক সংবাদপত্রে উদ্ভাসিত হওয়া সত্ত্বেও রাজা রামমোহন ইউরোপীয়দের অবাধ-বাণিজ্যের আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদে কোম্পানির ভারত-বাণিজ্যের অধিকার সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নেওয়া হয়নি; তবে কিছুটা সীমাবদ্ধ হওয়ায় কোম্পানির ব্যবসা ক্রমাগত কমে যাচ্ছিল। ১৮১৩ সালের পরবর্তী ১৬ বছরের মধ্যে কোম্পানির বাণিজ্য-মূল্যের বাৎসরিক গড় ছিল ১৮,৮২,৭১৮ পাউণ্ড এবং ব্যক্তিগত বাণিজ্য-মূল্যের বাৎসরিক গড় ছিল ৫৪,৫১,৪৫২ পাউণ্ড। কোম্পানির ব্যবসার তুলনায় ব্যক্তিগত ব্যবসা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৩৫] কিন্তু ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় সনদ পুনর্নবীকরণের সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিলেন ব্রিটিশ-শিল্পপতিরা। সেজন্য তাঁরা কোম্পানির বাণিজ্য করার অধিকার সম্পূর্ণরূপে কেড়ে নেবার পক্ষে ইংলণ্ডে

প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এবং তাঁদের প্রতিনিধিরা ভারতবর্ষে তাঁদের দাবি আদায় করার জন্য ভারতবাসীর সাহায্য নিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যাধিকারকে তীব্র আক্রমণ করে "A View of the Present State and Future Prospects of the Free Trade and Colonisation" নামে একটি পুস্তিকা ১৮২৯ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকাটি অবাধ বাণিজ্যওয়ালাদের কাছে ধর্মগ্রন্থের ন্যায় আদরণীয় ছিল। কোম্পানির বাণিজ্যের অপকারিতা দেখিয়ে পুস্তিকা-লেখক বলেছেন, "একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমরা আগেকার পৃষ্ঠায় যে-সব দোষের কথা বলেছি তাদের প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন ইউরোপীয়দের বসতি অথবা আরো খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে বলা যেতে পারে যে, তাদের প্রতিকারের জন্য চাই ইউরোপীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠা এবং ইউরোপীয় কর্মনিপুণতা, ইউরোপীয় শিল্পকর্ম-প্রচেষ্টা এবং ইউরোপীয় মূলধনের প্রবর্তন এই দেশে।"[৩৭]

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বরের টাউন হলের জনসভায় ও পার্লামেণ্টের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে পূর্বোক্ত পুস্তিকা-লেখকের বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। দেশী-বিদেশী ধনিক-বণিকদের সেই সভায় রাজা রামমোহনের মতো প্রিন্স দ্বারকানাথও একই কথা বলেছেন, "যদি মাত্র একটি জিনিস তৈরি করতে ইউরোপীয়দের যে কর্মকুশলতা ও উৎপাদন-নৈপুণ্য আছে তার ব্যবহারে এতো উপকার সাধিত হয়ে থাকে, তাহলে আরো যে-সব জিনিস এদেশে উৎপন্ন হতে পারে সেইসব জিনিসের উৎপাদনে ইংরেজদের কর্মনৈপুণ্যের, মূলধনের ও পরিশ্রমের অবাধ ব্যবহারে আমরা আরো কত না উন্নতি করতে পারি।"[৩৮]

পূর্বোক্ত জনসভার দু'দিন পরে কলকাতার ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও দেশীয় ধনিক ব্যক্তিরা একত্রে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কাছে অবাধ-বাণিজ্যাধিকারের দাবির সমর্থনে স্মারকলিপি পাঠালেন। এতে তাঁরা বললেন, "আপনার নিকট আবেদনকারীরা — কলকাতার ব্রিটিশ এবং দেশীয় অধিবাসীরা ভারতের বাণিজ্যিক ও চাষের সম্পদে ব্রিটিশ উৎপাদন-নিপুণতা, মূলধন ও যন্ত্রশিল্প প্রয়োগের আইনগত সব বাধা অপসারিত করে যে স্বার্থে ও প্রীতিতে দুই দেশকে সংযুক্ত করেছে তা নিকটতর ও বর্ধিত করবার জন্য ব্যগ্র।"[৩৯]

রাজা কেবলমাত্র উক্ত জনসভায় নয়, অন্যত্রও তিনি বলেছেন, "চরিত্রবান ও ধনসম্পদের অধিকারী ইউরোপীয়দের এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি দিলে …এদেশের সম্পদ বিশেষভাবে বাড়বে। উন্নততর কৃষি-পদ্ধতি প্রদর্শন এবং মজুর ও নির্ভরশীলদের সঙ্গে সুষ্ঠু ব্যবহারের ফলে এদেশীয় অধিবাসীদের অবস্থারও উন্নতি ঘটবে।"[৪০]

অবাধ-বাণিজ্যের দাবিদারেরা কি ভারতে ইউরোপীয় মূলধন ও যন্ত্রশিল্প আনার অভিপ্রায়ে অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার দাবি করেছিলেন? ব্রিটিশ-শিল্পপতিরা যে-সমস্ত স্মারকলিপি পার্লামেণ্টকে দিয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে এই

মহৎ অভিপ্রায় কোথাও ব্যক্ত হয়নি ; বরং তাঁরা কোম্পানির স্থান দখল করে এবং কোম্পানিকে কোনো ভাগ না দিয়ে ভারত-বাণিজ্যে নিজেদের সম্পূর্ণ অধিকার কায়েম করতে চেয়েছেন। ১৮২৯ সালের ২৮ এপ্রিলে প্লিমথ্, ১ মে গ্লস্টার, ৪ মে সান্‌ডারল্যাণ্ড, ৭ মে বার্মিংহাম, ৮ মে, লীড্‌স্ এবং ওয়েকফিল্ড, ১২ মে ম্যানচেস্টার, ব্রিস্টল ও লিভারপুল, ১৪ মে গ্লাস্‌গো, ২১ মে ল্যাংকাস্টার, ২৭ মে ডাবলিন, ১২ জুন হ্যালামশায়ার প্রভৃতি অঞ্চলের ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, জাহাজী-ব্যবসায়ী, পশমীবস্ত্রের কারখানা ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পের মালিকেরা ব্রিটিশ-সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছেন। এই সমস্ত স্মারকলিপিতে ভারত-শোষণের বিনিময়ে ইংলণ্ডের শিল্পসমূহের বিকাশ-সাধনের জন্য তাঁদের গোপন অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে এবং সেজন্যই তাঁরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিমত জ্ঞাপন করেছেন।

ওয়েকফিল্ডের কারখানার মালিকেরা স্মারকলিপিতে লিখেছেন, "ভারতে ও চীনে অবাধ বাণিজ্যের পথ খুলে দিলে দেশের কৃষি, ব্যবসায়িক ও শৈল্পিক স্বার্থ প্রভূত পরিমাণে চরিতার্থতা লাভ করবে। পশম-ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে এবং লীড্‌স্ ও তার আশেপাশের জায়গা পূর্ববৎ সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। এখন যে পশম-বস্ত্রের চাহিদা নেই, তার চাহিদা বৃদ্ধিতে কৃষকেরা উপকৃত হবে। তারা এই প্রার্থনা জানাচ্ছে যে, বাণিজ্যে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার বন্ধ হোক এবং ব্রিটিশ-বণিকদের সঙ্গে ভারত ও চীনের লেনদেনের পথ খোলা হোক।"[৪১]

ম্যানচেস্টারের ব্যবসায়ীদের স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে যে, ইউরোপীয়দের ভারতে বসতি স্থাপন ও অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার দিলে "ইউরোপের শিল্পকলা, সভ্যতা ও সাহিত্য বিস্তৃতি লাভ করবে এবং যেখানে খৃষ্টধর্মের নামও শোনা যায়নি সে-সব অঞ্চলে শান্তিপূর্ণভাবে তাঁর আশীর্বাদ গিয়ে পৌছুবে।"[৪২]

ব্রিস্টলের মালিকেরা স্মারকলিপিতে বলেছেন, "বর্তমানকালের বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ-বিধিগুলি অপসারিত করলে ব্রিটিশ-দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে, আমাদের শিল্প ও কৃষিকে উৎসাহ দেওয়া হবে, জাহাজ-পরিবহন উৎসাহিত হবে এবং জাতীয় আয় বাড়বে।"[৪৩]

সুতরাং ভারতে ব্রিটিশ-মূলধন নিয়োগ কিংবা শিল্প-স্থাপনের কোনো অভিপ্রায় গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পপতিদের ছিল না। এমন কি ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে-তদন্ত কমিটি গঠন করেন, সেই তদন্ত কমিটিও ভারতে আধুনিক শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা সম্পর্কে কোনো তদন্ত করেননি ; পক্ষান্তরে তাঁরা ভারতে ব্রিটিশ-পণ্যের চাহিদা ও ব্রিটিশ-শিল্পের ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত করেছিলেন। এই তদন্ত কমিটি 'সেই সকল শিল্পের মধ্যেই তাঁদের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, যে-শিল্পগুলিতে ব্রিটিশ পুঁজি লগ্নি করা হয়েছিল বা লাভজনকভাবে লগ্নি করা যেত।'[৪৪] ভারতবর্ষকে তাঁরা কাঁচা মালের জোগানদারে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। নীল ইত্যাদি চাষের কাজে তাঁরা যে মূলধন নিয়োগ করেছিলেন, সেই

লগ্নিকৃত অর্থও ব্রিটেনের ছিল না, তা ছিল ভারতের। তাঁরা ভারতের টাকায় ভারতে ব্যবসা করতেন এবং ব্যবসার মুনাফা ব্রিটেনে পাঠাতেন। 'ভারতে বৃটিশ-পুঁজি রপ্তানি শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। এই সময় থেকে বৃটিশ-পুঁজিপতিরা ভারতে কল-কারখানায় আর খনিতে টাকা খাটাতে আরম্ভ করেছিল।'[৪৫]

এ দেশকে দোহন করার কাছে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল 'এজেন্সী হাউস'গুলি। হাউসগুলির মূলধন তৈরি হয়েছিল কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন ও ভারতীয়দের টাকায়। 'হাউসগুলির প্রতিষ্ঠার সময় অংশীদারদের নিজেদের কোনো মূলধন ছিল না।'[৪৬] এজেন্সী হাউসগুলির উৎপত্তি ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে টমাস ব্রাকেন হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির কাছে বলেছেন, "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন উচ্চপদস্থ সিভিল ও মিলিটারী কর্মচারীরা চাকরি ছেড়ে ক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা দেখলেন যে, কোম্পানির দাসত্ব করার চাইতে এই বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বন করলে বেশি লাভবান হওয়া যাবে। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে তাঁরা টাকা গচ্ছিত পেলেন এবং মূলধন হিসাবে সেই টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে প্রচুর মুনাফা সঞ্চয় করলেন। এইভাবে তাঁরা এক-একজন বেশ মোটা পুঁজি নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরলেন।"[৪৭]

আঠারো শতকের শেষার্ধে এজেন্সী হাউসগুলি কলকাতাতেই গড়ে উঠেছিল। ১৭৯৭ সালের মধ্যে ১৯টি হাউস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমশ তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হাউসগুলির সংখ্যা হল ৬২। এদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১১টি ব্যাঙ্ক। নীল, পাট, তুলা, রেশম, জাহাজ, ব্যাঙ্কিং, বীমা ইত্যাদি বেসরকারি ব্যবসা-বাণিজ্যে হাউসগুলি অর্থ বিনিয়োগ করতেন —তাঁরা শতকরা ১৮% থেকে ২০% পর্যন্ত সুদে ব্যবসায়ীদের ও কোম্পানি-সরকারকে টাকা ধার দিয়েছেন। ইংরেজ-সরকার টাকা ধার করে এই সমস্ত এজেন্সী হাউসের উপরে এমনভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল যে রাজনৈতিক সংকটের সময়ে তাঁরা সরকারের গলা টিপে ধরতেন।[৪৮] এজেন্সী হাউসগুলি তাদের অংশী-দারদের যে-লভ্যাংশ বিলেতে পাঠাত, ত থেকে তাঁদের লুণ্ঠন-স্পৃহা উপলব্ধি করা যায়। কয়েকটি হাউসের লভ্যাংশের হিসাব[৪৯] নিচে দেওয়া হল :

পামার অ্যাণ্ড কোং	...	৩০%
জি. ম্যাকক্লিপ অ্যাণ্ড কোং	...	২৬%
আলেকজাণ্ডার অ্যাণ্ড কোং	...	৬%
ফার্গুসন অ্যাণ্ড কোং	.	৩৬৷৷০%
ম্যাকিনটস অ্যাণ্ড কোং	...	১৪%
কলভিন অ্যাণ্ড কোং	...	২৪৷৷০%

গভর্ণর হ্যারি ভেরেলস্টের কথায় 'প্রত্যেকটি ইউরোপীয় কোম্পানি এদেশের টাকায় তাদের বাৎসরিক ইনভেস্টমেণ্টের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়েছে, কিন্তু তাতে

এদেশের সম্পদ একেবারেই বাড়েনি।'[৫০]

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত এসম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, "ভারত হইতে বার্ষিক অর্থশোষণ বিগত ৪০ বৎসরে ২ কোটি টাকা হইতে ২৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ টাকার অধিকাংশ দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবির উপার্জন। এ টাকা কোনো আকারে আর তাহাদের ব্যবসায় বা পারিশ্রামিক বৃদ্ধি করিতে ফিরিয়া যায় না। বৎসর বৎসর ইংলণ্ডের আয় ও মূলধনের পরিমাণই বৃদ্ধি করিতেছে।"[৫১]

একজন ইংরেজ-লেখক বলেছেন, "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কলকাতার এজেন্সী হাউসগুলিতে অনেক টাকা জমেছিল। এই টাকার বেশির ভাগই ছিল কোম্পানির সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের জমানো টাকা। সরকারও প্রতি বৎসর প্রচুর টাকার নীল কিনত এবং এই নীল ইংলণ্ডে বিক্রীত হয়ে সেখানে যে টাকার প্রয়োজন হত তা জোগাত।"[৫২] ইংলণ্ড থেকে ভারতে মূলধন আসার পরিবর্তে ভারত থেকে ইংলণ্ডে উক্ত পদ্ধতিতে মূলধন চালান দেওয়া হয়েছিল এবং ভারতের টাকা ইংলণ্ডের শিল্পে লগ্নি করে ইংলণ্ড শিল্প-সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তারফলে, এন. কে. সিংহের ভাষায়, 'ভারতে ব্রিটিশ-পণ্যের আমদানি আরম্ভ হল, কিন্তু ব্রিটিশ-পুঁজির আমদানি ঘটল না।'[৫৩]

তাসত্ত্বেও বামপন্থী অধ্যাপক রবীন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, "কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসার আমল এবং নীলকুঠির আমলকে পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়ের কাল বলা যায়।"[৫৪] সঞ্চয় কোথায়? প্রায় সব টাকাই তো ইংরেজদের লেলিহান ক্ষুধা মেটাতে চলে যাচ্ছিল। আর, বাকি যে অর্থ দেশীয়-ধনিকদের হাতে থাকছিল, তার একটি বৃহদংশ জমিদারি কিনতে ব্যয় করা হল এবং বাকি অংশ ব্যক্তিগত বিলাসিতায়, বিবাহে শ্রাদ্ধে, ধর্মে-কর্মে, দয়া-দাক্ষিণ্যে ইত্যাদি ক্ষেত্রে অপচয় করা হল। ভারতের শিল্প-বিকাশের জন্য কিছুই থাকল না। সংস্কারমুক্ত-তথ্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক-অর্থনীতিবিদ সকলেই এদেশ থেকে ইংলণ্ডে অর্থ চলে যাওয়ার কথা বলেছেন, কেউই প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের কথা বলেননি। খ্যাতনামা সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ র. আ. উলিয়ানভস্কি একই অভিমত পোষণ করেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, "আঠারো শতকের শেষের দিকে বঙ্গদেশে স্বাধীন শিল্পোদ্যোগ সীমাবদ্ধই ছিল, কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় নাগাদ সেটা এইভাবে সঙ্কুচিত হয়ে মোট পরিমাণের বিচারে এবং আপেক্ষিকভাবেও নগণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাজেই, ঐ সময়ে বঙ্গদেশের শিল্পে কোন জাতীয় পুঁজিতান্ত্রিক গঠন সৃষ্টি হবার কোন কথাই ওঠে না।"[৫৫] তাঁর কথার সমর্থন পাওয়া যায় সেকালের নথিপত্রে, দলিল-দস্তাবেজে।

১৮৩২ সালের ৩০ মার্চ-এ পার্লামেণ্টারী কমিটির কাছে সাক্ষ্যদানকালে ডেভিড হিল (কোম্পানির উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী) নিজের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যা বলেছিলেন তার সত্যতা ও গুরুত্ব আজও এতটুকু ম্লান হয়নি।

তিনি বলেছেন, "ভারতে ইংরেজদের বসবাসের উপকারিতা সম্বন্ধে অদ্ভুতভাবে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে ; ব্রিটিশ-মূলধন ও কারিগরী জ্ঞান কোনোকালে ভারতবর্ষে গিয়ে পৌছুবে কিনা সে-বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে —যখন সব থেকে মস্ত বড় সুযোগ ছিল তখনো যায়নি ; কারণ আমাদের সাম্রাজ্য এত সুদূরে অবস্থিত, তার অবস্থা এতই অনিশ্চিত এবং তার অস্থায়িত্ব সম্পর্কে জনরব এত প্রবল যে তার ফলে ব্রিটিশ-মূলধনের মালিকেরা তাদের মূলধন ভারতে পাঠাতে সাহস করে না। কর্মকুশলতা সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে এমন কোনো বিশেষ ক্ষেত্র নেই যেখানে ভারতীয়রা আমাদের চাইতে কম কর্মকুশলী। আমাদের দেশের কারিগরদের পক্ষে ভারতের মত একটা গরম দেশে গিয়ে ভালভাবে কাজ করতে অনেক মুশকিল হবে। ভারতীয় চাষীরা ইউরোপীয় উপনিবেশকারীদের চাইতে অনেক ভালো চাষী হবে এবং এই কথা কারিগরদের সম্বন্ধেও খাটে। যে পথটা এখন খোলা থাকল, সেটা হচ্ছে ভারতীয়দের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া ও তাকে চালনা করা। ··যদি শুধুমাত্র ভাল চরিত্রের লোকরাই বসবাস করতে যায় তাহলে ভারতীয়দের তারা কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না, তাতে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে ; সুতরাং উপনিবেশকারীরা যারা যাবার সময় ভাল চরিত্র সঙ্গে নিয়ে যাবে, ধীরে ধীরে তারা তা বিসর্জন দেবে। তাছাড়া এমন সব খারাপ লোকও যাবে, যারা ভারতের কোনো উপকারই করতে পারবে না, উপরন্তু তাদের শাসন-কার্য চালনা করাও মুশকিল হয়ে পড়বে।"[৫৬]

ডেভিড হিলকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় —ভারতের নীল-চাষের মূলধন কোথা থেকে আসে ; তার জবাবে তিনি বলেছিলেন যে, তা সম্পূর্ণরূপে ভারতেই জমে।[৫৭] আর একজন সাক্ষী, ম্যাকান বলেছিলেন, "মূলধন কখনোই ইংলণ্ড থেকে ভারতে যায় না, তা ভারতেই জমে এবং তা বিলেতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।"[৫৮]

ভারতীয় কারিগরদের শিল্প-কুশলতা সম্পর্কে জি. ক্যাম্পবেল বলেছেন, "ভারতের বিপুল জনগণের মধ্যে প্রভূত শিল্প-ক্ষমতা বর্তমান, পুঁজি-সঞ্চয়ের মত যোগ্যতা তাঁদের বেশ আছে, গাণিতিকভাবে তাঁদের মাথা পরিচ্ছন্ন এবং গণনা ও গাণিতিক বিজ্ঞানাদিতে তাঁদের প্রতিভা অতি উল্লেখযোগ্য। এঁদের মেধা চমৎকার।"[৫৯]

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদে প্রদত্ত সীমাবদ্ধ সুযোগ গ্রহণ করে যে-সকল ইংরেজ এদেশে এসেছিলেন কিংবা কোম্পানির কর্মচারী-রূপে এদেশে এসে কোম্পানির চাকরি ত্যাগ করে নীল, লবণ ইত্যাদির ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের চরিত্র সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংস বলেছেন, "ভারতস্থ ইংরেজদের চরিত্রই আলাদা। ইংরেজ নামের অর্থই হল ঐ ব্যক্তির নিরাপত্তা এবং সেই সমস্ত অন্যায় কাজের অনুমোদন, যে কাজগুলি স্বদেশে করতে সে সাহস পেত না।"[৬০] এবিষয়ে আরো কঠিন মন্তব্য করেছেন টমাস সিডেনহাম। তিনি বলেছেন, "আমি সব সময়ই লক্ষ্য করেছি যে, অন্য যে কোনো জাতি অপেক্ষা ইংরেজরা বিদেশে

হিংসাত্মক কার্যে বেশি পারদর্শী এবং আমি বিশ্বাস করি, ভারতে এটাই ঘটেছে।”৬১

রাজা রামমোহনের বন্ধুস্থানীয় জেমস সিল্ক বাকিংহাম ছিলেন ‘ক্যালকাটা জার্নাল’ পত্রিকার সম্পাদক। রামমোহন-দ্বারকানাথ এদেশে ইংরেজ-কর্মচারী ও বণিকদের আচরণ-ব্যবহার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও বাকিংহামের মন্তব্য ছিল কঠোর। তিনি লিখেছেন, “ইংলণ্ডের সমাজে যিনি বুদ্ধিমান, বিবেচক ও পাঁচজনের হিতসাধক-রূপে সম্মানিত হন, এদেশে তাঁকে বলে ভবঘুরে, উড়নচণ্ডী ও প্রায়-আহাম্মক আপদ বিশেষ। ইংলণ্ডে যাঁকে স্বাধীনচেতা বলা হয়, এদেশে তাঁকে মনে করা হয় দাম্ভিক, দুঃসাহসিক ও উদ্ধত প্রকৃতির মানুষ।”৬২

এদেশীয়দের প্রতি ‘দাম্ভিক’ ও ‘উদ্ধত প্রকৃতির’ ইংরেজদের ব্যবহারের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগ্নি মিস এমিলি ইডেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুন তারিখের একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, “প্রতি দিন জর্জ-এর মনে হয় এ-দেশ আমরা সপ্তাহ-কালের বেশি ধরে রাখতে পারব না। সূর্যোদয়ের সময় আমি যখন বারান্দায় এসে বসে থাকি, বেশ কয়েকদিন দেখেছি একটি প্রকাণ্ড বুলডগ নেটিভদের তাড়া করছে। নেটিভদের তো জুতো মোজার বালাই নেই — একেবারে নাঙ্গা পা, তাই তারা কুকুর পিছু নিয়েছে দেখলেই ভীষণ ভয় পায়। সেদিন ডা: — আমায় বললেন একদিন সকালে তিনিও দেখেছেন বুলডগটা ভিস্তিকে খুব জ্বালাতন করছে। তিনি লাঠি ঘোরাতেই কুকুরটা চলে গেল। খানিক বাদে তিনি দেখলেন কুকুর ছুটছে তার মনিবের পিছু পিছু। মনিব ইংরেজ ছোকরা, রোজ সকালে ঘোড়া চেপে বেড়াতে বেরোয়। ছোকরাটিকে ডা: চেনেন না, তৎসত্ত্বেও তিনি ঘোড়া থামাতে বলে জানালেন — বুলডগটা কিভাবে ভিস্তিকে তাড়া করেছিল এবং তিনি যদি লাঠি না ঘোরাতেন তা হলে ভিস্তি বেচারার কী দশা হতে পারত। ছোকরাটি হাসতে হাসতে বলল, ‘ও তাই না কি? আপনিই তাহলে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন আমার কুকুরকে? আমি কেবল একটা নয় দুটো বুলডগ নিয়ে রোজ সকালে নেটিভদের শিকার করি, আজ সকালে একটু আগে একটিকে তো ধরাশায়ী করেছি। কী ছোটাটাই ছুটিয়েছি তাকে।”৬৩

সুতরাং রাজা ও প্রিন্সের দাবীকে ইতিহাস সমর্থন করে না, রামমোহনের একালের সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের প্রতি ইতিহাস বড়ো নিষ্করুণ-নির্মম; ইতিহাসের কঠিন আঘাতে কল্পনায় অঙ্কিত রাজার জনহিতৈষী মূর্তির সমস্ত রঙ ধূসর-বিবর্ণ হয়ে যায়। ১৮৫৩ সালে কার্ল মার্কস ‘অবাধ বাণিজ্যের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত ভারতের ছবি’৬৪ দেখতে পেলেও একালের রামমোহনের গোঁড়া সমর্থকেরা তা দেখতে পাননি। তাঁরা এই সত্য উপলব্ধি করতে পারেননি যে, যাঁরা ভারতে বাণিজ্য করতে এসেছিলেন ও ভারত-বাণিজ্যে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার দাবি করেছিলেন, তাঁরা কেউই ‘শিক্ষিত চরিত্রবান ও মূলধন-সম্পন্ন ব্যক্তি’ ছিলেন না এবং

এদেশে ইউরোপীয় 'কর্মনৈপুণ্যের, মূলধনের ও পরিশ্রমের অবাধ ব্যবহারে'র কোনো অভিপ্রায়ও তাঁদের ছিল না। রাজা রামমোহন 'ইতিহাস-লিখন যথার্থ উপলব্ধি' করতে পারেননি ; বরং হিন্দু কলেজের 'একজন. ছাত্র' এবং ডেভিড হিল 'কলোনাইজেসন' সম্পর্কে সঠিক কথা বলেছিলেন। শিল্প-বিপ্লব তো দূরের কথা, বাংলাদেশের গ্রামীণ শিল্পসমূহের পুনরুজ্জীবনের কোনো প্রচেষ্টা ইংরেজদের ছিল না। ভারতীয় শিল্পসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে ব্রিটিশ-পণ্যের দ্বারা ভারতকে প্লাবিত করাই ছিল অবাধ-বাণিজ্যের দাবিদারদের প্রধান উদ্দেশ্য। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী বাণিজ্য-ইতিহাস তাঁদের প্রকৃত চরিত্র ও উদ্দেশ্যকে উদ্ঘাটিত করেছে ; অবাধ-বাণিজ্যান্দোলনের গূঢ় অভিসন্ধিকে প্রকাশ করে দিয়েছে ১৮৩৩ সালের পরবর্তী বাণিজ্য-ইতিহাস।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনদে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারত-বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নেওয়া হল এবং ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের অবাধ-বাণিজ্যের নামে অবাধ শোষণের অধিকার দেওয়া হল। তারফলে কেবল শিল্পপ্রধান শহর ও গ্রাম-কেন্দ্র-গুলিই ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়নি, সর্বোপরি প্রাচীন গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি-মূল অর্থাৎ কৃষির সঙ্গে কুটীর-শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রচণ্ড আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শহর ও গ্রামাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ সর্বস্বান্ত কারিগর ও হস্তশিল্পী, কাটুনি, তন্তুবায়, কুম্ভকার, চর্মকার, কর্মকার কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করা ব্যতীত জীবিকার অন্য কোনো উপায় খুঁজে পায়নি। এভাবে কৃষি ও হস্তশিল্পের দেশ ভারতবর্ষকে বলপূর্বক যন্ত্রশিল্পের দ্বারা পণ্যোৎপাদনকারী ব্রিটিশ-ধনতন্ত্রের কৃষি-উপনিবেশে পরিণত করা হয়। 'প্রাক্-বৃটিশ-যুগের কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যে ভারসাম্য ছিল সেই প্রাচীন ব্যবস্থা ভাঙিয়া গিয়া ভারতবর্ষ হইয়া দাঁড়াইল সাম্রাজ্য-বাদের এক কৃষিসম্বল লেজুড়।'[৬৫] এই সত্য স্বীকার করে স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ান ১৮৪০ সালে কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটির কাছে বলেছিলেন, "আমরা তাহাদের শিল্প নষ্ট করিয়া দিয়াছি; জমির উৎপাদন ছাড়া আর কোন উৎপাদনের উপর তাহারা আর নির্ভর করিতে পারে না।"[৬৬]

ভারতের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য কি ফলাফল হয়েছিল তা দুর্ভিক্ষের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাগুলির দিকে তাকালেই স্পষ্ট বুঝা যায় : উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হয় ৭টি দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু-সংখ্যা ১৫ লক্ষ ; দ্বিতীয়ার্ধে হয় ২৪ টি দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর-সংখ্যা ২ কোটি। তাই রামমোহন-দ্বারকানাথের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ডা: মণ্টগোমেরি মার্টিন ইণ্ডিয়া হাউস-এর এক সভায় ব্রিটিশ-শোষণের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বলেছেন, "আমাদের সরকার তো নামে মাত্র খ্রীস্টান, কার্যত এ-সরকার মুসলমান সরকারের চেয়ে নিকৃষ্ট।...আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা ভারত থেকে শোষণ করি, বিনিময়ে আমরা কী দিই তাদের? দুর্ভিক্ষ আর মহামারী। মহামারী আর দুর্ভিক্ষ। হাজার হাজার গলিত পচিত শব ভেসে যায় নদীতে, দূষিত বাষ্পে বাতাস বিষাক্ত, জল পান করলে বমি পায়। চল্লিশ হাজার বর্গমাইল পরিমাণ অঞ্চলের

লোকজন উজাড়।"[৬৭] এই অঞ্চলগুলি জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল।

সুতরাং অবাধ-বাণিজ্যাধিকারের দাবি সমর্থন করে রাজা রামমোহন যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক ছিল না। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী ত্রিশ বছরের ভারত-লুণ্ঠনের ইতিহাসই তা প্রমাণ করেছে। ব্রিটিশ-বুর্জোয়াশ্রেণীর নিজের দেশে যে প্রগতিশীল ভূমিকা সেইসঙ্গে ঔপনিবেশিক দেশে তার যে ভূমিকা —এই দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য রাজা রামমোহন দেখতে পাননি। তাঁর দৃষ্টিতে ব্রিটিশ-ধনতন্ত্রের এই দু'টি ভূমিকা সমার্থক ছিল। যে ব্রিটিশ-বুর্জোয়ারা ইংলণ্ডে এত প্রগতিশীল, তাঁরাই যে তাঁদের শ্রেণীস্বার্থে ভারতে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে, 'স্বদেশে যা ভদ্ররূপ নেয় এবং উপনিবেশে গেলেই যা নগ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে সেই বুর্জোয়া-সভ্যতার প্রগাঢ় কপটতা এবং অঙ্গাঙ্গী বর্বরতা'[৬৮] উপলব্ধি করতে রামমোহন ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁর এই ব্যর্থতার মূলে ছিল কলকাতার নয়া ভূস্বামীশ্রেণীর উভয় গোষ্ঠীর (রামমোহন-দ্বারকানাথের 'আত্মীয়সভা' এবং রাধাকান্ত-ভবানীচরণের 'ধর্মসভা') জনস্বার্থ-বিরোধী শ্রেণী-সহযোগিতামূলক নীতি —যাঁরা ব্রিটিশ-শিল্পপতিদের সঙ্গে বাণিজ্য-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদের ঔরসে এবং সামন্ততন্ত্রের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন বাংলাদেশের মুৎসুদ্দি-বুর্জোয়াশ্রেণী ; তাঁরা বিদেশী-শক্তি-নির্ভর দেশীয় সামন্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে শিল্পে পুঁজি-নিয়োগের কোনো চেষ্টা করেননি। ইউরোপে যেমন বাণিজ্যপতিরা শিল্পে পুঁজি নিয়োগ করে শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে শিল্পপতি হয়েছেন, আমাদের দেশে তেমন ঘটেনি। এদেশে বাণিজ্যপতিরা (যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামদুলাল দে, মতিলাল শীল প্রমুখ) জমিতে পুঁজি নিয়োগ করে জমিদার হয়েছেন, শিল্পপতি হননি। ভূস্বামীশ্রেণীর অধিকার-রক্ষাকল্পে তাঁরা সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করেছেন, 'ভূম্যধিকারী সভা' (Zamindary Association —২১ মার্চ, ১৮৩৮ খ্রী:) গঠন করেছেন ; কিন্তু এদেশে আধুনিক যন্ত্রশিল্প-স্থাপনের জন্য তাঁরা কোনো আন্দোলন করেননি, এমন কি কোনো দাবিও পেশ করেননি। তাঁদের চরিত্রে সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক মনোভাবের বিচিত্র ও বিসদৃশ মিলন ঘটেছিল বলেই তাঁদের চিন্তাধারায় শিল্পচেতনা অনুপস্থিত। উগ্র আত্মস্বার্থ-চিন্তার জন্যই তাঁরা কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ-বণিকদের সঙ্গে মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন ; জাতির সামগ্রিক কল্যাণ ও দেশের সার্বিক মঙ্গলের কথা চিন্তা করতে পারেননি বলেই তাঁরা দেশীয় শিল্প-স্থাপনে প্রয়াসী হননি।[৬৯] তাঁদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিদেশী-বণিকদের সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল ছিল বলে ইউরোপীয় বণিক ও দেশীয় বণিক-জমিদারদের উদ্যোগে এদেশে Commercial and Patriotic Association (প্রতিষ্ঠাকাল —১৮২৮ খ্রী:) স্থাপিত হয়েছিল এবং এই সমিতির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইংলণ্ডে ভারতীয় অর্থ পাচারে প্রধান ভূমিকা

নিয়েছিল এজেন্সী হাউসগুলি। এই হাউসগুলির মধ্যে 'ম্যাকিনটস অ্যাণ্ড কোং'-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য হাউসের মত এই হাউসের মূলধনও গড়ে উঠেছিল কোম্পানির কর্মচারী ও দেশীয় ধনিকদের টাকায়। এই হাউসে ভারতীয় অংশীদারদের ১,০৯,৬৩,০০০্ টাকা এবং ইউরোপীয় অংশীদারদের ৯৫,২৪,৭০০্ টাকা ছিল।[৭০] এই কোম্পানির সঙ্গেও রাজা রামমোহন জড়িত ছিলেন। এ বিষয়ে অরবিন্দ পোদ্দার মন্তব্য করেছেন, "কলকাতায় অবাধ বাণিজ্যের দাবিতে সোচ্চার ইউরোপীয়দের সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। বিভিন্ন এজেন্সী হাউস যারা নীলকর ও অন্যান্য সমগোত্রীয় বণিকদের অর্থ দাদন করত, তাদের ব্যবসায়ে তিনি অর্থ লগ্নী করতেন; এদের মধ্যে ম্যাকিনটোশ কোম্পানী যে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি তদারক করার ভারপ্রাপ্ত এজেন্ট ছিল তা তাঁর বিলেতে অবস্থানকালীন কোর্ট অব ডাইরেক্টর্সদের নিকট লিখিত একটি পত্র থেকে জানা যায়। ...এই সম্পর্ক থেকে তাঁর সামাজিক অবস্থানের কেন্দ্রবিন্দুব বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা সহজ।"[৭১]

রাজা রামমোহন ছিলেন শিক্ষিত ও উদারনৈতিক মুৎসুদ্দী-সামন্ত-বুর্জোয়াদের নেতা। এঁদের সম্পর্কে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'বাংলার ইতিহাস' (৩য় ভাগ) গ্রন্থে লিখেছেন, "ইউরোপীয় ও মার্কিন বণিকবর্গের মুৎসুদ্দি হইয়া ঐ সময়ে কলিকাতার অনেকে বিষয়াপন্ন হইয়াছিলেন। সেই সকল লোকের উপর ইংরাজ-দিগের যৎপরোনাস্তি প্রভাব ছিল। তদ্ভিন্ন এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হয় নাই। আর যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে সম্ভুক্ত হন নাই—তাঁহারাও তৎকালে শ্রীবৃদ্ধিকারী ইউরোপীয়দিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ছিলেন।"[৭২] শিল্প-প্রতিষ্ঠা নয়, ভূমি-স্বার্থ রক্ষার জন্য 'ইউরোপীয়দের পক্ষ অবলম্বন' করাই ছিল উনিশ শতকের 'নবজাগরণে'র নায়কদের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই তাঁরা অবাধ-বাণিজ্যান্দোলনে ইউরোপীয়দের সঙ্গে শামিল হয়েছিলেন। শ্রেণীস্বার্থে এদেশে ইউরোপীয়দের অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজার আন্দোলনের ফলশ্রুতি সম্পর্কে কার্ল মার্কসের ভাষায় বলা যায়: "ইংলণ্ড ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামোটাই ভেঙ্গে দিয়েছে, পুনর্গঠনের কোনো লক্ষণ এখনো অদৃশ্য। পুরনো জগতের অপহৃতি অথচ নতুন কোনো জগতের এই অপ্রাপ্তির ফলে হিন্দুদের বর্তমান দুর্দশার উপর এক অদ্ভুত রকমেব শোকের আবির্ভাব ঘটে।"[৭৩]

১

বঙ্গদেশের লবণ-শিল্প

নীল, রেশম, আফিম ইত্যাদির মত লবণও ছিল বাংলাদেশের প্রাচীনতম কৃষি-শিল্প। এই লবণ-শিল্পের সমগ্র ইতিহাসের পটভূমিকায় বাংলার লবণ-শিল্প সম্পর্কে রাজা রামমোহনের বক্তব্যকে বিশ্লেষণ না করে কেউ কেউ দাবি করেছেন, "রামমোহনের আন্দোলনের ফলে নুনের একচেটিয়া ব্যবসা কোম্পানির হাত থেকে চলে যায়। নুন সস্তা হয়, ভালো নুন পাওয়া সুগম হয় ও লক্ষাধিক লোক ক্রীতদাসের অবস্থা থেকে রেহাই পায়।"[১] কিন্তু ইতিহাস কি তাঁদের এই দাবি সমর্থন করে? লবণ-বিষয়ে রাজার ভূমিকা কি লবণ-কারিগরদের (অর্থাৎ মালঙ্গীদের) পক্ষে সহায়ক হয়েছিল? তারা কি ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন? লবণের মূল্য কি হ্রাস হয়েছিল? এইসব প্রশ্নের তথ্যনির্ভর ও যুক্তিসম্মত উত্তর পেতে এবং এসম্পর্কে রামমোহনের ভূমিকার যথার্থ ও সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে দেশীয় লবণ-শিল্পের সমগ্র ইতিহাসকে স্মরণে রাখতে হবে।

বাংলাদেশে লবণ তৈরির সর্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল মেদিনীপুরের হিজলী ও তমলুক, চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চল, খুলনা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলার সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ। বস্ত্র, রেশম, নীল ইত্যাদির মত লবণ-শিল্পও ছিল কৃষকদের শিল্প। কৃষকেরা অবসর সময়ে লবণ প্রস্তুত করতেন এবং খাজনা হিসাবে ফসল বা অর্থের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ জমিদারদের দিতেন বলে এই শিল্প কৃষির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল।

মোগল-যুগে লবণকে রাজস্বের একটি বিশেষ উৎস-রূপে গণ্য করা হত বলে মোগল-শাসকেরা ইজারাদারদের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে লবণ তৈরি করার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ইজারাদারেরা লবণের ব্যবসায়ে একচেটিয়া

অধিকার ভোগ করলেও তাঁদের একচেটিয়া অধিকারকে উৎপাদকগণের ও জনসাধারণের উপরে উৎপীড়ন করার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেননি ; বরং লবণের উৎপাদক কৃষক ও ব্যবসায়ীদেরকে তাঁরা যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দিতেন।[২] কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল, যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে বিনা শুল্কে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অধিকার দাবি করল।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বাংলাদেশের যে-সকল শিল্প ইংরেজ-বণিকদের মুনাফার শিকারে পরিণত হয়েছিল, তার মধ্যে লবণ-শিল্প অন্যতম। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর মোগল সম্রাটের কাছ থেকে বিদেশে রপ্তানি ও বিদেশ থেকে এদেশে আমদানির ক্ষেত্রে বিনা শুল্কে অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার আদায় করেছিলেন। কিন্তু পলাশীর প্রান্তরে অভিনীত প্রহসনের পর থেকে বাংলাদেশে কোম্পানির কর্মচারীরা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানির 'দস্তক' ব্যবহার করে বিনা শুল্কে অন্যান্য পণ্যের ব্যবসায়ের মত লবণের ব্যবসাও ব্যক্তিগতভাবে শুরু করেছিলেন। নবাব মীরকাশেম তাঁদের এই বেআইনি 'অধিকার'-এ হস্তক্ষেপ করেছিলেন বলে নবাবের বিরুদ্ধে কোম্পানি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর লর্ড ক্লাইভ কোম্পানির প্রধান কর্মচারীদের নিয়ে 'ব্যবসায়ী সঙ্ঘ' (Exclusive Society) গঠন করেন। সুপারি, লবণ, তামাক ইত্যাদি পণ্যের ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার তাঁদের দেওয়া হয়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে 'ব্যবসায়ী সঙ্ঘ কেবলমাত্র ব্যবসায়ে পরিপূর্ণ একচেটিয়া আধিপত্যই প্রতিষ্ঠা করেনি, পরন্তু যেটা নতুন সেটা হল এই যে, এই সঙ্ঘ উৎপাদনের উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল।'[৩]

পূর্বোক্ত দ্রব্যসমূহের উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায়ী সঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার জন্য সঙ্ঘের সদস্যগণ শাসন-যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন। মোগল শাসনাধীনে দেশীয় ব্যবসায়ীরা লবণ-কারিগরদের (অর্থাৎ মেদিনীপুরের 'মালঙ্গী' ও খুলনার 'মাহিন্দার') টাকা দাদন দিয়ে চুক্তি করতেন এবং তাঁদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ সংগ্রহ করে তাঁরা সমগ্র দেশে লবণ সরবরাহ করতেন। কিন্তু 'ব্যবসায়ী সঙ্ঘের ক্রয়-বিক্রয়ের ঠিকাদার হিসাবে কাজ করা ছাড়া কাউকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই পণ্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত হতে এই সঙ্ঘ দিতেন না।'[৪] জমিদারদের কাছ থেকে সেজন্য মুচলেকা নেওয়া হল যে তাঁদের জমিদারির মধ্যে উৎপন্ন লবণ কোম্পানির কাছে বিক্রি করতে হবে, অন্য কারোর কাছে বিক্রি করা চলবে না। ফলে দেশীয় ব্যবসায়ীরা লবণের ব্যবসা থেকে সরে আসতে বাধ্য হন এবং মালঙ্গী ও মাহিন্দারেরা শ্বেতাঙ্গ-বণিকদের একচেটিয়া শোষণের শিকারে পরিণত হন। মাত্র দু'বছরে পূর্বোক্ত ব্যবসায়ী সঙ্ঘের ৬০ জন সদস্য লবণের একচেটিয়া ব্যবসায়ে ৭০ লক্ষ টাকা মুনাফা করেছেন।

এই সব লবণ-ব্যবসায়ীদের লবণ-ব্যবসার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে আর্ল অব অ্যালবেমার্ল বলেছেন, "গোটা দেশের আভ্যন্তরীণ উপভোগের লবণের বিপুল

একটা অংশ কোম্পানির কাছ থেকে পাইকারী ব্যবসায়ীরা কিনে নেয় চার টাকা মনেরও কম দরে ; তারা এর সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ বালি মেশায়, এ বালি আসে ঢাকার কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে এবং এই মিশেলটা তারা দ্বিতীয় এক-চেটিয়া, অথবা সরকারকে প্রথম ধরলে তৃতীয় একচেটিয়ার কাছে বিক্রি করে পাঁচ ছয় টাকা দরে। এই ব্যবসায়ীও আরো মাটি বা ছাই যোগ করে এবং এইভাবে হাত-ফেরতা হয়ে শহর থেকে গাঁয়ে যেতে যেতে দাম বেড়ে যায় আট দশ টাকায় আর ভেজালের অনুপাত ওঠে শতকরা ২৫ থেকে ৪০ ভাগ। তাই দাঁড়াচ্ছে যে, লোকে নুনের জন্য দাম দেয় ২১ পা: ১৭ শি: ২ পে: থেকে ২৭ পা: ৬ শি: ২ পে: অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের ধনী ব্যক্তিরা যা খরচ করে তার ৩০ থেকে ৩৬ গুণ বেশি।"[৫]

প্রবীণ কর্মচারীদের এভাবে ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার-দানের জন্য কোম্পানির যে-সকল কর্মচারী ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তাঁরা বিক্ষুব্ধ হন। তাঁদের প্রবল বিরোধিতার ফলে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবসায়ী সঙ্ঘের একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটে এবং সকলকে লবণ, সুপারি, তামাক ইত্যাদি পণ্যের ব্যক্তিগত ব্যবসার অধিকার দেওয়া হয়। ১৭৭২ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। কিন্তু এই সুযোগে কোম্পানি লবণের ব্যবসার উপরে শতকরা ৩০ টাকা হারে কর ধার্য করে। এই নতুন ব্যবস্থায় কোম্পানির ইংরেজ-কর্মচারীরা লাভবান হলেও দেশীয় ব্যবসায়ীরা সুযোগ-লাভে বঞ্চিত হয় ; কারণ 'কোম্পানির ইংরেজ-কর্মচারীরাই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী-রূপে দেখা দেয় এবং কৃষ্ণকায় দেশীয় গোমস্তাদের মাধ্যমে লবণের ব্যবসা চালাতে থাকে।'[৬] ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায়, কোম্পানির প্রবীণতম কর্মচারী লুসিংটন, বারওয়েল, লরেল এবং গ্রাহাম লবণের ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁরা দেশীয় ব্যবসায়ীদের মারফতে লবণের ব্যবসা করতেন। দেশীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্বাধিক কুখ্যাত কামালউদ্দীন (ইনি মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী ছিলেন) বারওয়েলের 'নেটিভ এজেন্ট' ছিলেন।[৭]

কেবলমাত্র কামালউদ্দীন নয়। সেকালে হঠাৎ-রাজাদের মধ্যে অনেকেই নিমক-মহলের দেওয়ান-রূপে প্রভূত ধনোপার্জন করে সমাজে রাজা-মহারাজা রূপে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছেন। এঁদের সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছেন, "কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁসি হবার কিছু পূর্ব্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন। সেকালে নিমকীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল ; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান —সেই অবধি বাবুরা বনেদি বড় মানুষ হয়ে পড়েন।"[৮] শিবনাথ শাস্ত্রীও একই মন্তব্য করেছেন, "তখন নিমক মহলের দেওয়ানী লইলেই লোকে দুই দিনে ধনী হইয়া উঠিত।"[৯]

কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতিপূর্ণ আচরণের জন্য কর-আদায় ব্যবস্থা ব্যর্থতায়

পর্যবসিত হওয়ায় ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস লবণের ব্যবসাকে সম্পূর্ণভাবে সরকারি-নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। তাতেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। লবণের ব্যবসায়ে পূর্বের মতই দুর্নীতি চলতে থাকে। ইংরেজ-কর্মচারীরা লবণের ইজারাগুলি বেনামীতে নিজেরাই হস্তগত করতেন; অথচ 'ডাইরেক্টর বোর্ডের নির্দেশ-অনুসারে ইংরেজদের পক্ষে স্বনামে ও বেনামীতে লবণের ইজারা নেওয়া অথবা লবণের কারখানা স্থাপন করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু অদম্য ব্যক্তিগত লোভের জন্য বেনামী লেনদেন নিয়মিতভাবেই চলত।'[১০]

এই অবস্থায় হেস্টিংস রাজস্বের আয় বৃদ্ধির জন্য ১৭৮০ সালে আর-একটি নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থানুসারে একজন উচ্চপদস্থ হিসাব-রক্ষকের ('Comptroller') তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের লবণ-অঞ্চলগুলিকে স্থাপন করে প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য একজন করে 'এজেন্ট' নিযুক্ত করা হয়। 'মালঙ্গী অথবা লবণ-শ্রমিকদের 'এজেন্ট'দের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয় যাঁদের কাছ থেকে তাঁরা দাদন গ্রহণ করতেন। তাঁরা অন্য কারোর কাছে লবণ-বিক্রয় করতে পারতেন না। এজেন্টরা লবণ জমিয়ে রাখতেন এবং পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছে প্রতি বৎসরই সরকার-নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করতেন। মালঙ্গীদের জন্য নির্ধারিত মূল্যের সঙ্গে লবণ-ব্যবসায়ী-প্রদত্ত পাইকারী মূল্যের যে ব্যবধান ঘটত, তা লবণের উপর শুল্ক হিসাবে ধরা হত। এইভাবেই সরকার লবণের উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপর সুদৃঢ় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।'[১১] এই নতুন ব্যবস্থায় কোম্পানির রাজস্ব প্রথম কয়েক বছরে বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তী বছরগুলিতে তা আবার হ্রাস পেতে থাকে। তাই ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চপদস্থ হিসাব-রক্ষকের অফিস তুলে দিয়ে এই অফিসের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব 'Board of Trade'-এর হাতে দেওয়া হয়।

কোম্পানি-সরকার লবণের উৎপাদন ও বিক্রির উপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করার ফলে বাংলাদেশে লবণের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কিছুদিনের মধ্যে তা জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে চলে যায়। উইলিয়ম বোল্টস্-এর মতে নবাব আলিবর্দী খাঁর শাসনকালে প্রতি শত মণ লবণের মূল্য ৪০৲ টাকা থেকে ৬০৲ টাকা ছিল।[১২] কিন্তু ইংরেজ-কর্মচারীদের লবণের ব্যবসায়ী-রূপে আবির্ভাবের ফলে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লবণের দাম বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় প্রতি শত মনের মূল্য ১২৫৲ টাকা। 'ব্যবসায়ী সঙ্ঘ' গঠনের পর থেকে ইংরেজ-কর্মচারীদের শোষণ ও লুণ্ঠন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৭৬৬ সনে প্রতি শত মন লবণের মূল্য ২৪৭৲ টাকা ও ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩১৲ টাকা হয়। কিন্তু ১৭৬৮ সালে যখন 'ব্যবসায়ী সঙ্ঘ'কে ভেঙে দিয়ে লবণের ব্যবসাকে 'অবাধ ও উন্মুক্ত' করা হয়, তখন লবণের মূল্য-হ্রাস ঘটে—প্রতি একশত মন লবণের মূল্য হয় ১৪৮৲ টাকা।[১৩] পুনরায় ১৭৭২ সালে রাজস্বের আয় বৃদ্ধির জন্য লবণের ব্যবসার উপরে সরকারি নিয়ন্ত্রন বিধিবদ্ধ হওয়ায় লবণের দাম ক্রমাগতই বাড়তে থাকে। অন্যান্য পণ্যের

ব্যবসায়ের মত লবণের ব্যবসাও কোম্পানি-সরকারের মুনাফার শিকারে পরিণত হয়েছিল এবং লবণের মূল্য উর্ধ্বমুখী হয়ে গরীব জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে চলে গিয়েছিল, তা নিম্নের তালিকা[১৪] দেখলেই বুঝা যাবে :

১৭৭৩ খৃ:	১৭০ ̖	টাকা	প্রতি	১০০	মন লবণের	মূল্য	
১৭৭৮ "	৩১২ ̖	"	"	"	"	"	(ঢাকা শহরে)
১৭৯০ "	৩১৪ ̖	"	"	"	"	"	
১৭৯৬-৯৭ "	৩০৮ ̖	"	"	"	"	"	
১৭৯৮ "	৬৮০ ̖	"	"	"	"	"	
১৮০৩-০৪ "	৩৪২ ̖	"	"	"	"	"	

লবণের উৎপাদন ও ব্যবসায়ের উপরে সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ-স্থাপনের পশ্চাতে ওয়ারেন হেস্টিংসের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব-বৃদ্ধি। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের নতুন ব্যবস্থার ফলে রাজস্বের পরিমাণ ২,২৯, ৯২ পাউণ্ড থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৫৫, ৬৪৬ পাউণ্ডে পরিণত হয়।[১৫] রাজস্বের বৃদ্ধিই লবণের মূল্য-বৃদ্ধির প্রধান কারণ। লবণের অকল্পনীয় মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষক-সাধারণের পক্ষে তাঁদের নিজেদের জন্য, এমন কি তাঁদের গৃহপালিত পশুগুলির জন্য লবণ ক্রয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। কোম্পানি-সরকারের এই শোষণ-দোহনের স্বীকৃতি রয়েছে সরকারি-পত্রে : — "এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই বিপুল পরিমাণ রাজস্ব-বৃদ্ধি জনসাধারণের অশেষ কষ্টের কারণ হয়েছিল। এর ফলে পশুগুলিকে লবণ খাওয়ানো অসম্ভব হয়ে উঠে। চালের মূল্য অপেক্ষা লবণের মূল্য অন্তত বারো গুণ বৃদ্ধি পায়। লবণ-করের বৃদ্ধিই লবণের এই মূল্য-বৃদ্ধির একমাত্র কারণ।"[১৬] ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারী কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে হোল্ট ম্যাকেঞ্জী বলেছেন, "ব্যবসার উদ্দেশ্যে নয়, রাজস্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই আফিম ও লবণের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয়।"[১৭] কারণ কোম্পানি-সরকারের কাছে লবণ ছিল, 'রাজস্ব-আদায়ের মূল্যবান উৎসস্থল।'[১৮] এ-বিষয়ে কার্ল মার্কস মন্তব্য করেছেন, "ভূমি-করের সঙ্গে সঙ্গে লবণ-করও বিবেচ্য। এ অতি জানা কথা যে কোম্পানি এ বস্তুটার একচেটিয়া বজায় রেখেছে, তা তারা বিক্রি করে তার বাণিজ্য মূল্যের তিন গুণ দরে —এবং যে দেশে করে সেখানে এ লবণ মেলে তার সমুদ্র, হ্রদ, পাহাড়-পর্বত এমন কি খাস জমি থেকে।"[১৯]

তাই 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা দুঃখপ্রকাশ করে লিখেছেন (৩০.১১.১২৫৯ বঙ্গাব্দ), "লবণ বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া রাজপুরুষেরা বিপুলার্থ রাজকোষে গ্রহণ করিতেছেন। ...লবণ ব্যতীত আহারীয় দ্রব্যাদি হইতে পারে না, কিন্তু কি চমৎকার! রাজপুরুষেরা ধনলোভ বশত: তাহাও একচেটিয়া করিয়াছেন, কোন প্রজা গবর্ণমেণ্টের গোলার লবণ না লইয়া লবণ প্রস্তুত করিলে তাহার সর্ব্বনাশ হয়।"[২০]

উচ্চপদস্থ ইংরেজ-কর্মচারীরা রাজস্ব-বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য বৈধ-

অবৈধ সমস্ত রকমের পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু লবণ-শিল্প উন্নয়নের জন্য কিংবা শোষণ-পীড়ন থেকে লবণ-শিল্পের কারিগরদের রক্ষা করার জন্য কোম্পানি-সরকার কোনো চেষ্টাই করেননি। সে-যুগের বাংলাদেশের অন্যান্য শিল্পের কারিগরদের মতো মালঙ্গীরা (অর্থাৎ লবণ-শিল্পের কারিগরেরা) ছিল দেশী-বিদেশী বণিকদের অসহায় শিকার। ১৭৮০ সালে লবণ-শিল্পে বণিক-সরকারের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও মালঙ্গীদের উপরে অত্যাচার-উৎপীড়ন কিছুমাত্র লাঘব না হয়ে তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এমন কি 'হেস্টিংসের শাসন-কালের পরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত মালঙ্গীদের উপরে এই উৎপীড়ন অব্যাহত ছিল।'[২১]

হেনরী বিভারিজ তাঁর গ্রন্থে বাখরগঞ্জের মালঙ্গীদের উপরে নিষ্ঠুর দমন-পীড়নের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন," ...লবণ উৎপাদনের জন্য এমন ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন চলেছিল যে, তা সহ্য করতে না পেরে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩৫০টি মালঙ্গী-পরিবার বাড়িঘর প্রভৃতি সর্বস্ব ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করেছিল।"[২২] খুলনা জেলার 'গেজেটিয়ার'-এ বলা হয়েছে যে, মাহিন্দারদের (লবণ-কারিগরদের) উপরে "লবণ-কর্মচারীদের ভয়াবহ উৎপীড়ন সকল সময়েই চলত। জোর-জুলুম করে মাহিন্দারদের যে দাদন নিতে বাধ্য করা হত, সেই দাদনের প্রতি কুড়ি টাকায় চার টাকা তাঁদের কাছ থেকে আদায় করা হত।"[২৩] 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা লিখেছেন (৩০.৩ ১২৬১ বঙ্গাব্দ), "লবণ-সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারে জমীদার ও সাধারণ প্রজাগণ অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন এবং জিলার খোদাবন্দ জজ সাহেবেরা সেই অত্যাচারী লবণের কর্ম্মচারীদিগের প্রতিই সাহায্য করিতেছেন।"[২৪] স্যার জন স্ট্র্যাচীও মালঙ্গী-মাহিন্দারদের উপরে উৎপীড়ন-নিপীড়নের কথা অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি বলেছেন, "লবণ-বিভাগে শঠতা ও হৃদয়হীনতার একটা নির্লজ্জ ব্যবস্থা চালু ছিল। বহু হাজার লোককে কাজ করতে বাধ্য করা হত, আর তাঁদের দেওয়া হত বেঁচে থাকার মত খুবই সামান্য খাবার। কয়েক শ' লোককে জোর করে এই চাকরি নিতে বাধ্য করা হত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের হাত-পা বেঁধে সুন্দরবনের সর্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলে পাঠানো হত কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের লবণ-উৎপাদনের জন্য।"[২৫]

সেকালের বাংলাদেশে লবণ-উৎপাদনের বৃহত্তম কেন্দ্র ছিল মেদিনীপুরের তমলুক ও হিজলী অঞ্চলে। এই অঞ্চলে গ্রাণ্ট সাহেবের হিসাব অনুসারে প্রায় ৬০,০০০ হাজার কারিগর লবণ-কারিগরদের কাজে নিযুক্ত ছিল।[২৬] তাঁরা প্রত্যেক বৎসরে ২৮ লক্ষ মন লবণ উৎপাদন করতেন। মেদিনীপুরে এই লবণ-কারিগরদের 'মালঙ্গী' নামে অভিহিত করা হত। মালঙ্গীরা দু'ভাগে বিভক্ত ছিল—(১) আজুরা মালঙ্গী, (২) ঠিকা মালঙ্গী। এঁরা ছাড়া কুলি, মাঝি, গাড়োয়ান, ওজনদার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে লবণের উৎপাদন ও ব্যবসায়ে নিয়োগ করা হত। মালঙ্গীদের দৈনিক মজুরী এত অল্প ছিল যে, তা দিয়ে তাঁরা কোনোরকমে

একবেলার আহার্য-দ্রব্য সংগ্রহ করতেন; সেজন্য তাঁরা জমিদারদের জমিতে দিনমজুর হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হতেন। ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ-পার্লামেন্টে প্রদত্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে মি: ব্রাইট বলেছিলেন, "ইংলণ্ডে এক দিনের শ্রম কিনতে যেটুকু সোনা বা রূপো খরচ হয়, তাই দিয়ে ভারতে বারো দিনের শ্রম কেনা সম্ভব।"[২৭] অর্থাৎ ভারতীয় শ্রমিকের দৈনিক শ্রম-মূল্য হল ব্রিটিশ-শ্রমিকের শ্রম-মূল্যের তুলনায় বারো ভাগের এক ভাগ মাত্র।

ভারতের করমণ্ডল উপকূলে উৎপন্ন 'কর্কচ' লবণ বাংলায় আমদানি করে বাংলার লবণ-শিল্পে সর্বপ্রথম সঙ্কট সৃষ্টি করা হয় এবং তা করা হয়েছিল ইউরোপীয় বণিকদের জাহাজ-শিল্পের স্বার্থে। সামুদ্রিক কর্কচ লবণ বাংলার সিদ্ধ লবণের তুলনায় দরে সস্তা ছিল এবং ভিজাগাপট্টম, রাজামুণ্ড্রী, নেল্লোর, কভেলঙ্গ ও তাঞ্জোর থেকে কর্কচ লবণ জাহাজ-যোগে বাংলাদেশে আমদানি করা হত। অষ্টাদশ শতকের সত্তর দশকে বাংলাদেশে লবণ-আমদানির কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে লবণ-আমদানি শুরু হয় এবং কয়েক বছরের মধ্যে তার পরিমাণ বেড়ে যায়। ১৭৮৫ সালে ভারতের সমুদ্রোপকূল থেকে ৪,২০,০০০ মন কর্কচ লবণ বাংলায় আমদানি করা হয় এবং ১৭৮৯ সনের একটি বিজ্ঞাপনে ছয় লক্ষ মন লবণ-আমদানির সংবাদ পাওয়া যায়।[২৮]

কোম্পানি-সরকার বাংলায় লবণ-আমদানির প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেবার জন্য ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের গৃহীত নীতিকে ("বাংলাদেশে আমদানি করা হলে সমস্ত বিদেশী লবণের উপরে শুল্ক দিতে হবে এবং বাংলাদেশে লবণ-উৎপাদনে উৎসাহ দেবার জন্য প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হবে।"[২৯]) বাতিল করেছিল। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য লবণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং অনুন্নত লবণ-শিল্পের জন্য স্যার জন শোর বাংলায় লবণ-আমদানির সুপারিশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে এটা আমরা ধরে নিতে পারি যে, বাংলাদেশের লবণ-উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে সম্প্রসারণক্ষম নয় এবং বিগত কয়েক বৎসরে লোকসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই অনুপাতে যদি চাহিদা বৃদ্ধি পায়, আর যা খুবই সম্ভব, তাহলে এই পণ্যের চাহিদার জন্য অতিরিক্ত জোগানের প্রয়োজন হবে।"[৩০]

কিন্তু জনসংখ্যা-বৃদ্ধির কথা বলা যে একটা অজুহাত মাত্র, তা এন. কে. সিংহ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে বাংলা, বিহার, আসাম ও নেপালের মোট জনসংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভবপর হবে। এই অঞ্চলে গড়পড়তা বার্ষিক মোট লবণের ব্যবহার প্রায় ৩২ লক্ষ মন —এর মধ্যে ২৮ লক্ষ মন বাংলার লবণ আর ৪ লক্ষ মন সমুদ্রোপকূলের লবণ (টু কোর্ট, ৮ ডিসেম্বর, ১৮২৯ খ্রী:)। অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানতত্ত্ববিদ-দের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে, গড়পরতা বার্ষিক মাথাপিছু লবণের ব্যবহার হয় ৭ পাউণ্ড। এই হিসাবের ভিত্তিতে এই অঞ্চলের জনসংখ্যা নিশ্চয়ই ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ হয়ে থাকবে। এখানের মানুষ ২০ লক্ষ মন লবণ ব্যবহার করে

এটা ধরে নিলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা (ভাগলপুর, পূর্ণিয়া ও সিলেট সহ)" নিশ্চয়ই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে ২২ কোটি ছিল।"৩১

বাংলাদেশের লবণ-আমদানির পশ্চাতে জন-হিতৈষণার পরিবর্তে ব্রিটিশ-জাহাজের মালিকদের অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিটাই যে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তা জানা যায় ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'বোর্ড অব ট্রেড'-এর একটি চিঠিতে: "যখন দেশ বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি জনবহুল বলে বিবেচিত হত এবং সমুদ্রোপকূলের লবণের আমদানি আদৌ ছিল না, তখন দেশের অভ্যন্তরে বহু বাণিজ্য-কেন্দ্রে দেশী-লবণ এখনকার অর্ধেক দামে বিক্রয় হত। ...বিদেশী লবণ-আমদানি তাঁদের দ্বারাই বেড়ে যায়, যাঁদের স্বার্থ এই লবণ-আমদানিতে উৎসাহদানের সঙ্গে জড়িত ছিল এবং তা হল এই, যে-সকল জাহাজ এদেশে বিদেশী লবণ আমদানি করত, তারা ফিরে যাবার সময়ে এদেশ থেকে চাল ভর্তি করে নিয়ে যেত।"৩২ এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের 'বোর্ড অব রেভিনিউ'-এর লিখিত পত্রে: "ফোর্ট সেণ্ট জর্জের সরকার কর্তৃক বাংলাদেশে লবণ-রপ্তানি বাবদ সংগৃহীত রাজস্ব খুবই সামান্য ছিল, কিন্তু এই ব্যবসা জাহাজ-মালিকদের কার্যত সাহায্য করেছে বলে কেবলমাত্র শেষোক্ত কারণেই রাজস্ব-বোর্ড এই ব্যবসায়ের অবলুপ্তিতে দু:খিত হবে।"৩৩

বাংলার লবণ-শিল্পের বিনিময়ে জাহাজের ব্যবসা থেকে আরো মুনাফা লুটবার জন্যই ইংরেজদের স্বার্থে করমণ্ডল উপকূলে লবণ-শিল্প গড়ে তোলা হয়েছিল এবং সেজন্যই লর্ড কর্নওয়ালিস সামুদ্রিক লবণ-আমদানিতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। '১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ইউরোপীয় জাহাজী-কোম্পানির ব্যবসায়ের লাভ প্রচলিত টাকার অঙ্কে বার্ষিক প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে। এই জাহাজী-ব্যবসাকে উৎসাহিত করার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস ভিজাগাপট্টম, রাজামুণ্ড্রী, নেল্লোর, কডেলঙ্ক ও তাঞ্জোর থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সামুদ্রিক লবণ আমদানি করার অনুমতি দিয়েছিলেন।'৩৪

তাই এন. কে. সিংহ বলেছেন, "সামুদ্রিক লবণ বলে যা পরিচিত, তা ১৭৮০ ও ১৭৯০-এর দশকে করমণ্ডল উপকূল থেকে যথেষ্ট পরিমাণে বাংলাদেশে আমদানি করা শুরু হল। কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি হল। বৃথা প্রতিবাদের কণ্ঠ তোলা হল। বাংলাদেশ তার নিজের ও প্রতিবেশী অঞ্চলের ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে লবণ উৎপাদন করত। সস্তা দরে সমুদ্রোপকূলের লবণ-আমদানি বাংলাদেশের লবণ-শিল্পের টিঁকে থাকার পক্ষে প্রথম বিপদ-রূপে দেখা দিল। বাংলাদেশে আমদানিকৃত সামুদ্রিক লবণ থেকে যে-রাজস্ব ফোর্ট সেণ্ট জর্জের সরকার পেতেন, তা ছিল যৎসামান্য। কিন্তু মাদ্রাজের রাজস্ব-বোর্ড লিখলেন, "ব্যবসাটি জাহাজী-মালিকদের কাছে বাস্তবোচিত সহায়ক হওয়ায় রাজস্ব-বোর্ড এই শেষোক্ত কারণেই এর অবলুপ্তিতে দু:খিত হবে।"৩৫ করমণ্ডল উপকূলে লবণ-উৎপাদন ব্রিটিশ জাহাজ- মালিকদের স্বার্থেই গড়ে উঠেছিল, যদিও তা বাংলাদেশের লবণ-শিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লবণ-বাণিজ্যের ইতিহাস হল দুর্নীতি ও প্রবঞ্চনার ইতিহাস, নিষ্ঠুর শোষণ ও ভয়াবহ লুণ্ঠনের ইতিহাস। ব্রিটিশ-বণিকদের সীমাহীন শোষণ-লুণ্ঠন থেকে বাংলার লবণ-শিল্পকে রক্ষা করার জন্য ইংলণ্ডের ব্রিটিশ-সরকার এগিয়ে আসেননি। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে পুনরায় সনদ দেবার পূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তদন্তের জন্য যে-কমিটি গঠন করেছিলেন, সেই কমিটি 'সেই সকল শিল্পের মধ্যেই তাঁদের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ রেখেছিল, যে-শিল্প-গুলিতে ব্রিটিশ-পুঁজি লগ্নি করা হয়েছিল কিংবা লাভজনকভাবে লগ্নি করা যেত।'[৩৬] সেজন্য তাঁরা হোল্ট ম্যাকেঞ্জীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ব্রিটিশ-পণ্যের ব্যবহার সম্পর্কে ভারতবাসীদের মনোভাব কিরূপ? উত্তরে হোল্ট ম্যাকেঞ্জী বলেছেন, "আমি মনে করি যে, কলকাতাকে ধরে বিচার করলে দেখা যায় যে বিলিতি বিলাস-সামগ্রীর দিকে অধিবাসীদের একটা নির্দিষ্ট ঝোঁক রয়েছে। আধুনিক আসবাবপত্রে সজ্জিত তাঁদের গৃহ, অনেকেই হাতঘড়ি ব্যবহার করছেন, তাঁরা জুরি-গাড়ির ভক্ত হয়ে উঠেছেন ও মদ্যপানে অভ্যস্ত বলে জানা যায়।"[৩৭] তাই রমেশচন্দ্র দত্ত মন্তব্য করেছেন, "ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তৃতি সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণ পেয়ে ইংলণ্ডের কমন্স সভার রাশভারী ও শ্রদ্ধেয় সদস্যদের মুখমণ্ডলে নিশ্চয়ই গুরুগম্ভীর সন্তুষ্টির হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল।"[৩৮]

কমন্স কমিটির কাছে প্রদত্ত রাজা রামমোহনের সাক্ষ্য সম্পর্কেও রমেশচন্দ্র দত্তের পূর্বোক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য। কারণ ইউরোপীয় মদ্য-পানে ভারতীয়দের আসক্তির কথা তিনিও বলেছেন। সস্তা দরে বিলিতি লবণ ভারতে আমদানি করা হলে ভারতীয়রা সেই লবণ ব্যবহার করবেন কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরে রাম-মোহন বাংলাদেশে বিলিতি লবণ-আমদানি বন্ধের কোনো দাবি উত্থাপন করেননি কিংবা বাংলার লবণের মূল্য-হ্রাসের কোনো দাবি করেননি; পক্ষান্তরে তিনি বলেছেন, "এতে কোনো সন্দেহই নেই যে, বিলিতি লবণ আমদানি করা হলে খুব অল্প সংখ্যক পেশাদার ব্রাহ্মণ ছাড়া ভারতীয়রা তা খুব আনন্দের সঙ্গেই কিনবেন। বেশির ভাগ লোক দেশী ও আমদানিকৃত লবণের মধ্যে কোনো পার্থক্যই করবেন না। আমার মনে হয়, কলকাতায় ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রস্তুত ⅔ সোডা-জল (⅓ অংশ নাই বা যদি হয়) কলকাতায় ও শহরাঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয়রা ব্যবহার করে থাকেন; ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত মদেরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁরা ব্যবহার করে থাকেন।"[৩৯]

কেবলমাত্র মদ নয়, বিলিতি বিলাস-সামগ্রীর প্রতি উনিশ শতকের হঠাৎ-রাজাদের তীব্র অনুরাগ ছিল। হোল্ট ম্যাকেঞ্জীর বক্তব্যকে সমর্থন করে ডঃ গ্যাডগিল বলেছেন, "নয়া সৃষ্ট ভারতীয় 'বুর্জোয়াশ্রেণী' গত শতকে ইউরোপে প্রস্তুত পণ্য-সামগ্রী ব্যবহারে আত্যন্তিক আগ্রহ ও স্বদেশে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি ঘৃণার মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন। ·· পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার অনুকরণ করা তাঁদের কাছে আলোকপ্রাপ্তির মানদণ্ড বলে মনে হয়েছিল।"[৪০]

অবাধ-বাণিজ্য নীতির সমর্থক রাজা রামমোহন ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন এবং লণ্ডনে গিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনাকালে লবণ ইত্যাদি ব্যবসায়ে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্ট-এর 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়: "১৮৩১ সালের ১২ আপ্রিলের লিবরপুল নগরের পত্রে লেখে যে…নগরস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমিটির কএকজন সাহেব বাবু রামমোহন রায়ের আগমনজন্য সন্তোষ জ্ঞাপনার্থ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে কোম্পানির বিরুদ্ধে আপনি আমার-দিগের যে অনেক প্রকার সাহায্য করিবেন এমত আমারদের ভরসা। তাহাতে বাবু উত্তর করিলেন যে আমার যে২ অভিপ্রেত তাহা বিরোধের দ্বারা নিষ্পত্তি না হইয়া সলাদ্বারা যে নিষ্পত্তি হয় এমত বাঞ্ছা। আদালত-সম্পর্কীয় কোনো২ সুনিয়ম করিতে এবং স্বীয় বাণিজ্য রহিত করিতে এবং দেশ মধ্যে লবণাদির এক-চেটিয়ারূপে ব্যবসায় ত্যাগ করিতে এবং ইউরোপীয়েরদিগকে স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আগমন ও বসবাসার্থ অনুমতি দিতে এবং মোকদ্দমাব্যতিরেকে তাঁহারদিগকে স্বদেশবহির্ভূত করিতে যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত করিতে ইত্যাদি বিষয়ে যদ্যপি কোম্পানি বাহাদুর স্বীকৃত হন তবে তাঁহারা যে পুনর্ব্বার চার্টর পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ না করিয়া বরং সপক্ষ হইব।"[৪১] অর্থাৎ রাজার আন্দোলন শোষক-পরিবর্তনে সাহায্য করেছিল, শোষণ-বন্ধে নয়। কারণ কোম্পানির এক-চেটিয়া শোষণের অবসানে ব্রিটিশ শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা ভারত-শোষণের অধিকার লাভ করেছিলেন। ব্রিটেনের 'অভিজাতশ্রেণী চেয়েছিল জয় করতে, ধনপতিরা চেয়েছিল লুণ্ঠন, এবং মিল-তন্ত্রীরা চেয়েছিল শস্তায় বেচে বাজার দখল।'[৪২] ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল। ভারতের শিল্পের বিনিময়ে তাঁরা নিজেদের দেশে উন্নত শিল্প গড়ে তুলেছিলেন; আর ভারতের শিল্পগুলি অবলুপ্তির পথে দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিল। বাংলার অন্যান্য শিল্পের মতো লবণ-শিল্পও রক্ষা পায়নি; লবণ-কারিগরেরাও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি পাননি; তাঁরা অনাহার আর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

কমন্স কমিটি রামমোহনকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, বিলিতি-লবণ সস্তা দরে বাংলাদেশে আমদানি করা হলে কাজের অভাবে মালঙ্গীরা প্রচণ্ড দুর্দশার সম্মুখীন হবেন কিনা। উত্তরে রাজা বলেছেন, "মালঙ্গীদের এখনো অধিক সংখ্যায় সরকার কর্তৃক (যদি সরকারকে ভবিষ্যতে একচেটিয়া লবণ-ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হয়) লবণের কারখানায় অথবা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কিছু ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত লবণ-শিল্পে নিযুক্ত করা যেতে পারে এবং অবশিষ্টদের কৃষি এবং বাগানের মালী, গৃহভৃত্য ও দিনমজুরের কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। বাঙ্গালীদের মধ্যে সাধারণ শ্রমিক যেমন বাগানের মালী ইত্যাদি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর থাকায় অধিক সংখ্যায় ওড়িশাবাসীদের এই সমস্ত কাজে অংশগ্রহণের জন্য বাংলায়

আসতে উৎসাহিত করা হত।"[৪৩] কিন্তু রামমোহনের বক্তব্য তথ্যসম্মত নয় এবং তা ছিল মালঙ্গীদের স্বার্থ-বিরোধী। তাঁর বক্তব্যে উৎসাহিত হয়েছিলেন ইউরোপীয় বণিকেরা ও শিল্পপতিরা, আর মালঙ্গীরা আতঙ্কিত হয়েছিলেন; তাঁরা দেখেছিলেন অনাহার আর মৃত্যুর ছবি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মালঙ্গীদের মত কুলী, মাঝি, গাড়োয়ান, ওজনদার এবং আরো অনেকে লবণ-উৎপাদন ও ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের দৈনিক মজুরী এত অল্প ছিল যে, তা দিয়ে অতি কষ্টে তাঁদের জীবন-নির্বাহ করতে হত। রামমোহনের জবাব থেকেও এঁদের মজুরীর হার অনুমান করা যায়। কারিগর ও শ্রমিকদের মজুরী সম্পর্কে রামমোহন বলেছেন, "কলকাতা শহরে কামার, ছুতোর ইত্যাদি কর্মীরা, যদি দক্ষ কর্মী হন, তা হলে (আমার যদি ঠিক মনে থাকে) মাসে দশ থেকে বারো টাকা (অর্থাৎ ২০ থেকে ২৪ শিলিং) পান। সাধারণ কাজের লোক, যাঁরা নিম্নমানের সাদামাটা কাজ করেন, তাঁরা পান ৫/৬ টাকা (প্রায় ১০/১২ শিলিং)। রাজমিস্ত্রী পান মাসে ৫ থেকে ৭ টাকা (১০ থেকে ১৪ শিলিং)। সাধারণ শ্রমিক পান প্রায় ৩॥০ থেকে ৪ টাকা। মালী কিংবা চাষীরা মাসে পান প্রায় ৪ টাকা। পাল্কী-বেহারারাও একই হারে মজুরী পান। ছোট ছোট শহরে এই হার কিছু কম। **কিন্তু গ্রামে আরো কম।**"[৪৪] (বড় হরফ লেখকের)।

অর্থাৎ নীল, ইক্ষু, রেশম, লবণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিযুক্ত গ্রামীণ কারিগর-শ্রমিকেরা কোনোরকমে বেঁচে থাকার মত মজুরী পান। এঁদের অন্য কোনো কৃষি-শিল্পে নিয়োগ করার মতো চিনি, নীল ইত্যাদি বৃহৎ শিল্প মেদিনীপুরে ছিল না এবং তাঁদের মধ্যে ওড়িশা থেকে আগত ব্যক্তিদের সংখ্যা খুব সামান্যই ছিল। এই বিষয়ে এন. কে. সিংহ বলেছেন, "আমরা মেদিনীপুরে কোনো বড় ধরনের চিনি বা নীল-চাষ দেখতে পাইনি এবং লবণ-উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের অধিকাংশ অন্য স্থান থেকে আগত নয়। যখন সমগ্র লবণ-বাণিজ্য অকল্পনীয়ভাবে অবাধ ও স্বাধীন হয়ে পড়ল, তখন কোনোরকমের বিকল্প চাকরির অবর্তমানে তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা নিশ্চয়ই খুব সাংঘাতিক রূপে দেখা দিয়েছিল। তাঁদের দুর্ভোগ-যন্ত্রণার মধ্যে সমগ্র মানবজাতির সীমাহীন বেদনার প্রকাশ ঘটেছিল।"[৪৫]

সুতরাং বিলেত থেকে লবণ আমদানি করে বাংলার লবণ-শিল্পের চূড়ান্ত সর্বনাশ ডেকে আনা হল। অথচ বাংলাদেশের লবণ-শিল্পকে রক্ষা করার জন্য শিল্প-সংরক্ষণ নীতি দাবি করা, বিলেতে ও ভারতের করমণ্ডল উপকূলে উৎপন্ন লবণ-আমদানি বন্ধ করা, দেশের অভ্যন্তরে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারকে বাতিল করা, কর্মচারীদের শোষণ-উৎপীড়ন ও দুর্নীতিকে বন্ধ করা, দেশীয় ব্যবসায়ীদের অধিকতর সুযোগ দেওয়া, উন্নত যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে এদেশে চাহিদা-অনুসারে লবণ উৎপন্ন করা ও বাজারে সস্তা দরে জোগান দেওয়া, মালঙ্গী-দের বাঁচার মত মজুরী ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করার সুযোগ দেওয়া প্রভৃতি

দাবি উত্থাপনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রাজা রামমোহন শ্রেণীস্বার্থে (শ্বেতাঙ্গ বণিকদের মুচ্ছুদ্দিগিরি করে অগাধ ধন-সম্পদের মালিক হওয়াই ছিল সেকালের দেশীয় বণিক-ভূস্বামীশ্রেণীর প্রধান স্বার্থ এবং তাঁরা অনেকেই নিমক-মহলের দেওয়ানি করে কিংবা লবণ-ব্যবসায়ে অর্থ লগ্নি করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন) কমন্স কমিটির সামনে যে-বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন, তা ছিল দেশের কৃষিজীবীশ্রেণীর স্বার্থ-বিরোধী। এদেশে ইউরোপীয়দের স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার ও তাঁদের অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার-প্রদানের জন্য তাঁর আন্দোলন বাংলার লবণ-শিল্পকে কোনো আঘাত করবে না—এটা আশা করা অসঙ্গত। এন. কে. সিংহ-র ভাষায় বলা যায় : "যখন অবাধ-বাণিজ্যের উত্তপ্ত তাপপ্রবাহের সামনে ভারতে ও চীনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অদৃশ্য হয়ে গেল তখন ব্রিটিশ-লবণশিল্প ও জাহাজী-ব্যবসায়ের স্বার্থে যে বাংলাদেশের লবণ-আইনের উপরেও আক্রমণ নেমে আসবে না এটা ভাবা খুব বেশি আশা করা হত।"[৪৬]

ইতোপূর্বে বাংলা ও বিহার থেকে লুণ্ঠিত অর্থে ইংলণ্ডে বিভিন্ন শিল্পের মতো লবণ-শিল্পও নতুনভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল। অবাধ-বাণিজ্যের সুযোগে ব্রিটেনের শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা উন্নত যন্ত্রে উৎপন্ন লবণ প্রচুর পরিমাণে সস্তা দরে আমদানি করে বাংলার লবণকে হটিয়ে বাংলাদেশের বাজার দখল করে। ফলে বাংলার বিভিন্ন স্থানের লবণের কারখানাগুলি একে একে বন্ধ হয়ে যায়। 'বাংলা-দেশের বস্ত্রশিল্প যেমন বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবে বাংলাদেশের লবণ-শিল্পও একদিন বাংলাদেশ থেকে বিদায় গ্রহণ করে।'[৪৭]

ইউরোপীয় শিল্পপতি-বণিকদের অবাধ-বাণিজ্যের আক্রমণে এবং রাজা রামমোহনের নেতৃত্বে দেশীয় বণিক-জমিদারদের অবাধ সমর্থনে ও অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এই কৃষি-শিল্পটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং তারফলে সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় ছয় লক্ষ লবণ-কারিগর কর্মচ্যুত হয়ে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল।[৪৮] কেবলমাত্র লবণ-শিল্প নয়, অন্যান্য কৃষি-শিল্পও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল না। উনিশ শতকের ব্রিটিশ-শক্তি-নির্ভর 'আলোকপ্রাপ্ত' ভূস্বামীগোষ্ঠী দেখতে পাননি যে, ভারত নামক 'স্বর্ণখনি' লুণ্ঠনের অধিকার নিয়ে ইউরোপীয় শিল্পপতি-বণিকদের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ বেঁধেছিল এবং এটা ছিল তাঁদের শ্রেণীস্বার্থের বিরোধ। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনদ-দানের পূর্বে 'একদিকে শিল্প-স্বার্থ এবং অন্যদিকে টাকা-ওয়ালা ও চক্রতন্ত্রের দ্বন্দ্বে ভারত পরিণত হল রণক্ষেত্রে।'[৪৯] কিন্তু এই দ্বন্দ্বে জয়লাভ করেছিল শিল্পপতিরা — উক্ত সনদে কোম্পানির বাণিজ্যাধিকারের অবসান ঘোষিত হল। "কোম্পানির পরিবর্তে ব্রিটিশ-শিল্পপতিরা লুণ্ঠন-কার্যে এগিয়ে এলেন —ইউরোপীয় পণ্যের দ্বারা সমগ্র দেশকে প্লাবিত করলেন ; ব্রিটিশ-মূলধন এদেশে লগ্নির পরিবর্তে ভারত থেকে লুণ্ঠিত অর্থ গ্রেট ব্রিটেনের শিল্প-বিকাশে লগ্নি করা হল। 'বৈদেশিক পণ্যদ্রব্য

আমদানি করার ফলে তার বিক্রিতে দালালদের ভূমিকা বেড়ে গেল —দেশীয় শিল্পোদ্যোগের উপরে তার ক্রিয়াফল হয়েছিল দ্বিবিধ। একদিকে বেনিয়া-দালাল (অর্থাৎ এদেশীয় ব্যক্তিরা —লেখক) ভোগ্যপণ্য বিক্রি করে স্থানীয় কারিগরদের ক্ষতি করতে এবং অনেক সময়ে তাঁদের সর্বনাশ করতে থাকল। আর অন্যদিকে, শিল্পের মালমশলা বিক্রি করে সে কোন কোন শিল্পে সর্বনাশ করল।'[৫০]

ইংলণ্ডের এই মিল-তন্ত্রীরাই শ্রেণীস্বার্থে এদেশের মুৎসুদ্দি-বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল এবং মিত্রতা-স্থাপনে দেশীয় বণিক-জমিদারদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রামমোহন-দ্বারকানাথ-রাধাকান্ত প্রমুখ সেকালের সামন্তশ্রেণী থেকে আগত বিশিষ্ট নেতারা। তাঁরা ব্রিটিশ-শাসনের দেশীয় সহযোগী-রূপে ব্রিটিশ-বুর্জোয়াদের 'উদার নীতি'র প্রতিধ্বনি করেছেন। 'বঙ্গদেশে বেনিয়া আর ব্যাঙ্কিং পুঁজি ব্রিটিশ-কারবারি এবং দেশীয় জমিদারদের স্বার্থের খিদমতগারি করার বাইরে যাবার বিশেষ কোন আগ্রহ দেখায়নি।'[৫১] এই সময়ে ইউরোপীয় শিল্পপতিরা এদেশে শিল্প-স্থাপনে আগ্রহী হননি এবং দেশীয় বণিক-জমিদারেরা সাধারণভাবে শ্বেতাঙ্গ শিল্পপতি-বণিকদের সঙ্গে কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন ; শিল্প-প্রতিষ্ঠায় তাঁদের কোনো প্রয়াস ছিল না।[৫২] ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় কিছু পরিমাণে কেবলমাত্র দ্বারকানাথের ক্ষেত্রে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত চলেছিল ব্রিটিশ-লুণ্ঠনের এই প্রক্রিয়া ; পরিণতিতে ভারত হারাল তার ক্রয়-ক্ষমতা —ইউরোপীয় পণ্য বিক্রির বাজার হল সঙ্কুচিত। রামমোহনের সমকালীন যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে মার্কস লিখেছেন, "যে টাকাওয়ালারা ভারতকে তার ভূসম্পত্তিতে পরিণত করেছে, যে চক্রতন্ত্র তাকে জয় করেছে তার সৈন্য দিয়ে আর যে কলওয়ালারা তাকে প্লাবিত করেছে তার বস্ত্রে, তাদের স্বার্থ ততদিন পর্যন্ত হাতে হাত দিয়েই চলেছে। কিন্তু শিল্প-স্বার্থ যতই ভারতীয় বাজারের ওপর নির্ভরশীল হতে থাকে, ততই ভারতের দেশীয় শিল্প ধ্বংস করার পর ভারতে নতুন উৎপাদনী শক্তি সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করতে শুরু করে। তৈরি মাল দিয়ে একটা দেশকে ক্রমাগত প্লাবিত করে চলা যায় না, যদি না পরিবর্তে কিছু উৎপন্ন বিনিময় করার সামর্থ্য সে-দেশকে দেওয়া যায়। শিল্প-স্বার্থ দেখল, বাড়ার বদলে বাণিজ্য তাদের কমছে।"[৫৩]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ-শিল্পপতিরা অবস্থার চাপে নীতি ও কৌশল পরিবর্তনে বাধ্য হলেন। 'মিল-তন্ত্রীরা আবিষ্কার করেছে যে উৎপাদনশীল দেশ-রূপে ভারতের রূপান্তর তাদের কাছে একান্ত জরুরী।'[৫৪] সুতরাং তাঁরা ভারতকে কৃষি-উপনিবেশ-রূপে গড়ে তোলার নীতি গ্রহণ করেছেন। এই নীতির মর্মকথা হল যে, —(১) ঔপনিবেশিক দেশগুলিকে ব্রিটিশ-শিল্পজাত পণ্যের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করা ; (২) কাঁচামালের প্রধান উৎপাদন-কেন্দ্রে পরিণত করা ; (৩) রপ্তানি ও আমদানি দু'রকমেরই বাজার-রূপে গড়ে তোলা। এই-

ভাবে ভারতবর্ষকেও ব্রিটিশ-শাসকেরা তাঁদের শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি-আমদানির বাজার এবং কাঁচামালের উৎপাদন-কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। এবং সেজন্যই তাঁরা সর্বপ্রথমে ভারতের তুলা উৎপাদন-কেন্দ্রের নিকটতম অঞ্চলে বোম্বাইতে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ২০ মাইল রেলপথ প্রতিষ্ঠা করেছেন।[৫৫] পরবর্তী বছরে রাণী-গঞ্জের কয়লা খনিগুলির জন্য বাংলাদেশে রেলপথের বিস্তার ঘটেছে। ১৮৫৭ সালের মধ্যে সারা ভারতে রেলপথ স্থাপিত হয়েছে ২৮৮ মাইল। কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য চালান দেবার অভিপ্রায়েই ব্রিটিশ-শাসকগোষ্ঠী সমগ্র ভারত জুড়ে রেলপথের প্রসার ঘটিয়েছেন।[৫৬]

লুণ্ঠন-শোষণের অভিপ্রায়ে ভারতে রেলপথ প্রবর্তিত হলেও এদেশের পক্ষে তার পরোক্ষ ফল হল শুভ। এ সম্পর্কে ১৮৫৩ সালে মার্কস লিখেছেন, "ইংরেজ মিল-তন্ত্রীরা ভারতকে রেলপথ বিভূষিত করতে ইচ্ছুক শুধু এই লক্ষ্য নিয়ে যাতে তাদের কল-কারখানার জন্যে কম দামে তুলা ও অন্যান্য কাঁচামাল নিষ্কাশিত করা যায়। কিন্তু যে দেশটায় লোহা আর কয়লা বর্তমান সে দেশের যাত্রায় (locomotion) যদি একবার যন্ত্রের প্রবর্তন করা যায় তাহলে সে যন্ত্র তৈরির ব্যবস্থা থেকে তাকে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। রেল চলাচলের আশু ও চলতি প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যা দরকার সে সব শিল্প-কারখানার ব্যবস্থা না করে বিপুল এক দেশের ওপর রেলপথের জাল বিস্তার চালু রাখা যাবে না এবং তার মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে শিল্পের এমন সব শাখায় যন্ত্রশিল্পের প্রয়োগ, রেল-পথের সঙ্গে যার আশু সম্পর্ক নেই। তাই এই রেলপথই হবে ভারতে সত্যকার আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত।"[৫৭]

মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হল। রেলপথ-স্থাপনের ফলে ব্যাপকভাবে গড়ে উঠল ব্রিটিশ-স্বার্থোপযোগী চা-কফি-রবারের বাগিচা, কয়লাখনি ও চটকল। চা-বাগান ১৮৫৩ সালে ছিল ১০টি, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে হল ২৯৫টি; চটকল ১৮৫৪ সনে ছিল ১টি, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে হল ২০টি; কোলিয়ারি ১৮৫৪ সালে ছিল ৩টি, ১৮৮০ সনে হল ৬০টি। এই সব শিল্প গড়ে উঠেছে ব্রিটিশ-মূলধনে (অবশ্য এই মূলধনের অধিকাংশই সংগৃহীত হয়েছে ভারত-শোষণ থেকে) এবং ইংরেজ-মালিকানায় পরিচালিত হয়েছে; কোনো ভারতীয় ব্যবসায়ীকে অংশীদার করা হয়নি।[৫৮]

তবুও বোম্বাই-এর তুলা-ব্যবসায়ীরা বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে বস্ত্রশিল্প স্থাপন করেছেন। ভারতীয় মূলধনে ১৮৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের প্রথম বস্ত্রশিল্প। ১৮৬৬ সনে বস্ত্রশিল্প ছিল ১৩টি, ১৮৭৯-৮০ সালে ৫৮টি এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে হল ১৯৩টি। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ভারতীয় শিল্পপতিদের আত্মবিকাশ ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে এবং সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তাঁদের আত্মপ্রসারে আতঙ্কিত হয়ে ব্রিটিশ-শিল্পপতিরা ভারতীয় শিল্পের বিকাশকে রুদ্ধ করার জন্য ভারত-সরকারের উপরে প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছেন। ফলে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সরকার বিলিতি

কাপড়ের উপর থেকে আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করেন এবং ১৮৭৪ সালে ভারতীয় বস্ত্রের উপরে নতুন কর আরোপ করে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প-সম্প্রসারণের সীমাবদ্ধ সুযোগকে আরো সঙ্কুচিত করেছিলেন।[৫৯]

এদেশে শিল্প-বিকাশের এই চিত্র হল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের; প্রথমার্ধের ছবি কেবলমাত্র ধ্বংস আর ধ্বংস। 'স্তূপাকৃতি ধ্বংসের মধ্য থেকে উজ্জীবনের ক্রিয়া লক্ষ্যেই প্রায় পড়ে না। তাসত্ত্বেও সে ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।'[৬০] সেই অর্থনৈতিক ক্রিয়ার প্রকাশ ঘটেছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে—রেলপথ স্থাপনের মধ্য দিয়ে, রামমোহনের সমকালে নয়। ইংলণ্ডের ধ্বংসাত্মক ভূমিকা লক্ষ্য করে মার্কস মন্তব্য করেছেন, "একথা সত্য যে, ইংলণ্ড হিন্দুস্তানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে, এবং সে স্বার্থসাধনে তার আচরণ ছিল নির্বোধের মতো। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল: এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে ইংলণ্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংলণ্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।"[৬১] ব্রিটিশ-শিল্পপতি-বণিকদের এদেশীয় কৃষি-শিল্পের ধ্বংস-সাধনে সহায়কের প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন রাজা রামমোহন ও তাঁর সহযোগীরা। কিন্তু তাঁদের ভূমিকা যত নিন্দাত্মক হোক না কেন, শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার্থে তাঁদের প্রচেষ্টা যত ক্ষতিকর হোক না কেন, পরোক্ষ ফল হিসাবে সমাজের পক্ষে তা হয়েছিল শুভকর। 'রক্ত আর কাদা, দুর্দশা ও দীনতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবর্গ ও জাতিকে টেনে'[৬২] নিয়ে গিয়ে রামমোহন ও তাঁর গোষ্ঠী 'ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র'-রূপে কাজ করেছেন। কিন্তু এই সত্যটি ভুলে গিয়ে একালের রামমোহন-সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা রামমোহনকে 'উদীয়মান ধনতন্ত্রী যুগের স্বাধীন ব্যক্তি'[৬৩]-রূপে অভিহিত করেছেন।

১০

বাংলাদেশে গোলাম-ব্যবসা

রাজা রামমোহন কলকাতায় বসবাসকালে (১৮১৪ খ্রী:-১৮৩০ খ্রী:) সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন-সহ আন্দোলন করেছেন; কিন্তু সমাজের যাঁরা বৃহত্তম অংশ, যাঁরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, যাঁরা শোষণের জাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট এবং বেঁচে থাকার জন্য যাঁরা আত্মবিক্রয়ে কিংবা সন্তান-সন্ততিদের বিক্রয়ে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের সম্পর্কে রাজা আশ্চর্যজনকভাবে নীরব থেকেছেন। তাঁর চিন্তাধারা ও সমস্ত আন্দোলনের লক্ষ্য সমাজের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ। তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মপ্রয়াস শহর ও শহরাঞ্চল কেন্দ্রিক। সমাজের উপরের অংশের স্বার্থে সমাজ-ধর্ম-শিক্ষা ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর বুর্জোয়া-চেতনার প্রকাশ ঘটলেও অর্থনৈতিক বিষয়ে তাঁর শিল্প-চেতনার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। সেখানে তিনি সামন্তশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। অথচ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির জোয়াল থেকে গ্রামীণ মানুষকে মুক্ত না করলে গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার ঘটে না —সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব হয় না। সামন্ত-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটানো যায় না এবং ধনতন্ত্রের উদ্ভব না ঘটলে সামন্ত-সমাজের মৌলিক সংস্কার-সাধন সম্ভব নয় কিংবা তথাকথিত সংস্কার-সাধনের দ্বারা জন-সাধারণের বৃহত্তম অংশ অর্থাৎ কৃষকসমাজের উপরে অর্থনৈতিক-সামাজিক পীড়ন-শোষণ বন্ধ করা যায় না। কিন্তু মধ্যযুগীয় শোষণ-ব্যবস্থাকে আঘাত করতে হলে যে নিজের শ্রেণীর বিরুদ্ধে আঘাত হানতে হয়, তা করা ভূস্বামীশ্রেণীর কোনো গোষ্ঠীর (রামমোহনের 'আত্মীয়সভা' কিংবা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের 'ধর্মসভা') পক্ষেই সম্ভব ছিল না। তাই তাঁরা একদিকে যেমন কৃষক-বিদ্রোহ-দমনে ব্রিটিশ-শক্তির সঙ্গে

সহায়তা করেছেন এবং কৃষক-শোষণ সম্পর্কে উদাসীন থেকেছেন, অন্যদিকে তেমনি কলকাতার দাস-ব্যবসা ও গোলাম-পীড়ন সম্পর্কে নীরব রয়েছেন।

রামমোহন যখন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এলেন, তখন কলকাতা শহরে গোলাম-ব্যবসা পুরোদমে চলত—'কলকাতা শহর গোলাম কেনাবেচার একটা বড় আড়ত'[১] ছিল। গ্রাম-বাংলার ভূমিহারা কৃষকেরা, শিল্পচ্যুত বেকার কারিগরেরা, তাঁদের ঘরের ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েরা, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গ্রামের মানুষেরা এবং সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলকাতা-গ্রামের বাস্তুহারারা বাঁচবার আশায় ভীড় করেছেন নতুন বাণিজ্য-নগরী কলকাতার দাস-ব্যবসা কেন্দ্রে। তাঁরা গোলামের সংখ্যা বাড়িয়েছেন, দাস-ব্যবসা তেজী করে তুলেছেন। ক্রেতারা যাতে পছন্দমত গোলাম কিনতে পারেন, সেজন্য প্রকাশ্য স্থানে খুঁটির সঙ্গে শিকলে বেঁধে দাস-দাসীদের রাখা হত। এমন কি সংবাদপত্রেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হত। দেশীয় সমৃদ্ধশালী বাঙ্গালীরা গোলাম কিনে উচ্চপদস্থ ইংরেজ-কর্মচারীদের উপহার দিতেন। তাছাড়া ইংরেজরা দাস কিনতেন। বিভিন্ন গৃহকর্মে এইসব দাসদের নিযুক্ত করা হত। গোলামদের সঙ্গে পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হত, জীবন-ধারণের জন্য ন্যূনতম আহার্য দেওয়া হত। অনেক ক্রীতদাসকে খাঁচায় রাত্রি-যাপন করতে হত। সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতিতে চাবুক দিয়ে তাঁদের প্রহার করা হত। তাঁদের কোনোরকমের স্বাধীনতা ছিল না। দাস-মালিকদের মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকারী সম্পত্তির সঙ্গে গোলামদেরও মালিক হতেন। দাস-নির্যাতন সম্পর্কে একজন ওলন্দাজ মহিলা লিখেছেন যে, ক্রীত দাসদাসীদেরকে প্রহারে জর্জরিত করা হত এবং শীতকালে পরিবারস্থ লোক ও অন্যান্য দাসদাসীর সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ করে তাঁদের গায়ে ঘড়া ঘড়া ঠাণ্ডা জল ঢালা হত।[২]

১৭৯২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর-এর 'Calcutta Chronicle' পত্রিকার একটি সংবাদে জানা যায়, 'জনৈকা অল্পবয়স্কা বালিকা-দাসীকে অসুস্থ বলে কসাইতলার (বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট) একটি বাড়ি থেকে মালিকরা তাড়িয়ে দেন। পাশের স্যাঁতসেঁতে একটি ঘোড়ার আস্তাবলে তাকে থাকতে দেওয়া হয়। বাড়ির মালিকরা এবং আশপাশের প্রতিবেশীরা মধ্যে মধ্যে আস্তাবলে গিয়ে মেয়েটিকে কিছু খাবার দিয়ে আসতেন। কিছু দিনের মধ্যে অসুস্থ বালিকাটি মারা যায়।'[৩]

সেকালের পত্র-পত্রিকায় পণ্যদ্রব্যের ন্যায় দাস বেচা-কেনার বিজ্ঞপ্তি, দেশী-বিদেশী গোলাম-প্রভুদের দাস-নির্যাতনের কাহিনী, অসহায় গোলামদের পলায়নের সংবাদ, অভাব-অনটনের জ্বালায় গ্রামীণ মানুষের সামান্য মূল্যে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বিক্রয় ইত্যাদি দাস-সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের সংবাদ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন ও কৃষি-শিল্পের ধ্বংস-সাধনের ফলে 'মানুষ বিক্রি করা প্রায় স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দারিদ্র্যের চাপে মানুষ নিজের ছেলেমেয়ে, এমন কি স্ত্রী পর্যন্ত ধনিকদের কাছে বিক্রি করে দিত গোলামির জন্য।'[৪] মানুষ বেচা-কেনার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় :

(১) ১৮ জুন, ১৮২৫। 'কন্যা বিক্রয় —বর্দ্ধমানের এক দরিদ্র বৈষ্ণবী 'শ্রীযুত রাজা কিষণচাঁদ রায় বাহাদুরের নিকট যাইয়া ঐ কন্যাকে ১৫০ দেড় শত টাকায় আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া দেশে প্রস্থান করিয়াছে।'[৫]

২) ১১ অক্টোবর, ১৮২৮। 'ভার্য্যা বিক্রয় —শ্রী আনন্দ চন্দ্র নন্দীর প্রমুখাৎ আমরা অবগত হইলাম যে, জিলা বর্দ্ধমানের মধ্যে এক ব্যক্তি কলু অনেক দিবসাবধি বাস করিত সংপ্রতি বর্ত্তমান বৎসরে তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া মনে[২] মন্ত্রণা করিয়া আপন স্ত্রীকে বিক্রয় করিবার কারণ তত্রস্থ কোন স্থানে লইয়া গেল তাহাতে তত্রস্থ এক যুবা ব্যক্তি আসিয়া কএক টাকাতে তাহাকে ক্রয় করিল ঐ স্ত্রী দর্শনে বড় কুরূপা নহে এবং তাহার বয়ঃক্রম অনুমান বিংশতি বৎসর হইবে যাহা হউক সেই কলুপো কএক টাকা পাইয়া ভার্য্যা দিয়া অনায়াসে গৃহে প্রস্থান করিল।'[৬]

(৩) ১১ জানুয়ারি, ১৮৪০। গোলাম ক্রয় —'আমরা শুনিলাম যে কলিকাতার একজন জমীদার বারাণস হইতে স্বগৃহে আগমন কালীন ভগলপুরের বাজারে ৪০ টাকা মূল্যে এক গোলাম ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। এবং তিনি কহিলেন যে তদ্দিবসে সেই বাজারে দাসদাসী প্রায় ২০/২৫ জন বিক্রিয় হইয়াছিল।'[৭]

গোলাম কেনা-বেচার কোনো নির্দিষ্ট মূল্য ছিল না। স্বাস্থ্য, বয়স ও কর্মক্ষমতা অনুসারে মূল্য নির্ধারিত হত। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা লিখেছেন (১৮.১.১৮২৩), "ইহারদের মূল্য কিছু নিশ্চয় নাই স্থানভেদে মূল্য বিভিন্ন বালকের মূল্য চারি টাকা অবধি ১৫ টাকা পর্য্যন্ত স্ত্রী লোকের ১৬ টাকা অবধি ২৪ টাকা পর্য্যন্ত। পুরুষের মূল্য ২৪ টাকা অবধি এক শত ষাটি পর্য্যন্ত। এইরূপ দাসত্বগ্রস্ত অনেক লোক অতি কষ্টে কালক্ষেপ করিতেছে।"[৮] এই ব্যবসার মুনাফা কোম্পানির আমলে বেশ লোভনীয় ছিল। স্বীয় স্বার্থে, 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গোলামি প্রথাকে কায়েম করারই চেষ্টা করেছিলেন এবং কোর্ট-হাউসে জনপ্রতি চার টাকা চার আনা 'ডিউটি' দিয়ে গোলামদের রেজিস্ট্রী করাবারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।'[৯]

ক্রীতদাসের জীবন প্রভুর মর্জি-মাফিক নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বাধীনতা শব্দটি তাঁর কাছে মিথ্যা-মরীচিকা মাত্র। নীরন্ধ্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন তাঁর জীবন। আগামী দিনগুলি তাঁর কাছে আশার আলো বহন করে আনে না —প্রত্যেকটি দিন তাঁর কাছে দুঃস্বপ্নের-আতঙ্কের। চাবুকের আঘাতে তাঁদের দেহ রক্তাক্ত-ক্ষতবিক্ষত হয়; প্রহারে আর অনাহারে তাঁদের দিন অতিবাহিত হয়। তাই প্রভুর নৃশংস অত্যাচার, নিষ্ঠুর উৎপীড়ন থেকে বাঁচবার আশায় গোলাম পালানোর চেষ্টা করেন। তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য দাস-প্রভু সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন। তৎকালীন সংবাদপত্রে এরকম বহু বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে[১০]:

(১) 'পলাতক —চীনা বাজারের মিঃ রবার্ট ডানকানের বাড়ি থেকে ইন্দো

নামে ২২ বছরের একটি কাফ্রি ছেলে গত বৃহস্পতিবার পলাতক হয়েছে। কেউ যদি ছেলেটিকে ফিরিয়ে দিতে পারেন তাহলে তাকে সোনার মোহর পুরস্কার দেওয়া হবে।'

(২) 'পলাতক দু'টি ক্রীতদাস —গত ১৫ অক্টোবর শ্যাম ও টম নামে দু'টি ১১ বছর বয়সের দাস বালক, প্রায় একরকম দেখতে, বাড়ি থেকে অনেক প্লেট ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে পালিয়ে গেছে। যদি কোনো ভদ্রলোকের কাছে তারা চাকরি করতে যায়, তাহলে তিনি তাদের আটকে রেখে যেন মালিককে খবর দেন। তাদের খোঁজখবর দিলে অথবা ধরে দিতে পারলে মালিক ১০০ টাকা পুরস্কার দেবেন।'

(৩) 'গত সোমবার ১৪ বছরের একটি দাস বালক, খিদমতগারের পোষাক পরে, অনেক জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। ৫১ নং কসাইতলায়, মিঃ পার্কিসকে এই ছেলেটি সম্বন্ধে যিনি খবর দেবেন, তাঁকে তিনি ভালভাবে পুরস্কৃত করবেন।'

(৪) 'গত ২ (জুলাই, ১৭৯২) তারিখ থেকে দীন-দারা নামে ১৫ বছরের একটি দাস ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। তার পিঠে ও হাতে অনেকগুলি আগুনে পোড়ার দাগ আছে, পায়ে আছে একটা লোহার বেড়ি। যদি বেড়িটা সে খুলেও ফেলে দেয়, তাহলেও তার পায়ে একটা গোলাকার কালো দাগ থাকবে। চলাফেরায় খুব ঢিলে, কিন্তু তাতেও যদি তাকে না চেনা যায়, তাহলে তার তোৎলা কথা থেকে নিশ্চয়ই তাকে চেনা যাবে। এ অঞ্চলে সে একেবারে অপরিচিত। তার কাছে টাকাকড়ি কিছু নেই, সুতরাং শীঘ্রই তাকে চাকরি খুঁজতে হবে। এই সময় যদি কোনো ব্যক্তি তাকে ধরতে পারেন এবং ১নং পার্কিন্স লেনে মালিকের কাছে তাকে পৌঁছে দেন, তাহলে তিনি ৫০ টাকা পুরস্কার পাবেন।'

গোলামদের উপরে যে কী ভয়াবহ অত্যাচার করা হত, তার পরিচয় ৪ নং বিজ্ঞাপনটি বহন করছে। গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা, পায়ে লোহার বেড়ি ইত্যাদি ছিল গোলামদের অঙ্গের ভূষণ। এই সমস্ত বিজ্ঞাপন এবং প্রকাশ্যে কলকাতা শহরের দাস-ব্যবসা দেখেও সেদিন কেউই বিচলিত হননি। এমন কি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়ম জোন্সের তীব্র ধিক্কার সত্ত্বেও এদেশের কেউই গোলামদের মুক্তির জন্য এগিয়ে আসেননি। দাস-বাণিজ্য সম্পর্কে একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে ১৭৮৫ সালে স্যার জোন্স বলেছিলেন, "আমাদের এখানে গোলামদের দুরবস্থার কথা আমি কিছু কিছু জানি, এবং তা এত মর্মান্তিক যে বলতে সংকোচ হয়। গোলামদের উপর প্রতিদিন এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হয়, বিশেষ করে বালক ও স্ত্রীলোকদের উপর, যে মর্যাদার দিক থেকে আমি তার কোনো দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে রাজি নই।...এই বিরাট জনবহুল কলকাতা শহরে এমন একজনও পুরুষ বা স্ত্রীলোক নেই, যাঁর অন্তত একটি গোলাম ছেলে বা মেয়ে নেই। তিনি খুব সামান্য মূল্যেই গোলামটি কিনেছেন, এবং খোঁজ করলে দেখা যাবে,

হয়ত অন্নাভাবের কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য এই যাবজ্জীবন দুঃখের বোঝা গোলামটি অনিচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে। আপনারা অনেকেই জানেন নিশ্চয়ই যে, নদীর উপর দিয়ে নৌকা-বোঝাই গোলাম এখানে নিয়ে আসা হয় কলকাতার বাজারে বিক্রি করার জন্য। আপনারা এও জানেন যে, এইসব গোলাম ছেলে-মেয়েদের অধিকাংশকেই তাদের বাপ-মা'র কাছ থেকে চুরি করে আনা হয়, অথবা দুর্ভিক্ষের সময় তাদের গোলামির জন্য সামান্য মূল্যে বেচে দেওয়া হয়।"[১] গোলাম-ব্যবসার বিরুদ্ধে জোন্সের তীব্র মন্তব্য সত্ত্বেও দেশীয় অভিজাত-সমাজে তার কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি এবং দাস-বাণিজ্য বন্ধ হয়নি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বড় বড় শহরে দাস-ব্যবসা পুরোদমে চলেছে।

অথচ গোলামের ব্যবসা যখন কলকাতা শহরে নির্বিবাদে চলেছে, তখন রাজা রামমোহন কলকাতায় বসবাস শুরু করেছেন (১৮১৪ খ্রী:), 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করেছেন (১৮১৫ খ্রী:) এবং হিন্দুধর্ম-সংস্কারে ব্রতী হয়েছেন, কলকাতায় পাশ্চাত্য বিদ্যা-শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত হয়েছে (১৮১৭ খ্রী:), সতীদাহ-সহমরণের বিরুদ্ধে রামমোহন দু'টি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন (১৮১৮-১৯ খ্রী:), রামমোহন ও অন্যান্যদের উদ্যোগে আয়র্লণ্ডের দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য সাহায্য-তহবিল খোলা হয়েছে (১৮২১-২২ খ্রী:), অস্ট্রিয়ার স্বৈরাচারী রাজসেনাদের কাছে স্বাধীনতাকামী নেপ্‌লসের পরাজয়ের সংবাদে রামমোহন গভীর দু:খপ্রকাশ করে 'ক্যালকাটা জার্নাল' পত্রিকার সম্পাদক জেমস সিল্ক বাকিংহামকে চিঠি দিয়েছেন (১৮২১ খ্রী:), এদেশে ইংরেজিভাষায় ইউরোপীয় শিক্ষাদানের দাবি জানিয়ে রামমোহন লর্ড আমহার্স্টের কাছে চিঠি লিখেছেন (১৮২৩ খ্রী:), সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে রাম-মোহন ও তাঁর সহযোগীরা স্মারকলিপি দিয়েছেন (১৮২৩ খ্রী:), স্পেনে নিয়ম-তান্ত্রিক সরকার-প্রতিষ্ঠার সংবাদে উল্লসিত হয়ে রামমোহন টাউন হলে ভোজ দিয়েছেন (১৮২৩ খ্রী:), 'ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (১৮২৮ খ্রী:), জমিদার-দের স্বার্থে লাখেরাজ জমির উপরে কর-ধার্যের প্রতিবাদে রামমোহন আন্দোলন করেছেন (১৮২৮ খ্রী:), সতীদাহ-নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে (১৮২৯ খ্রী:), দ্বিতীয় ফরাসী-বিপ্লবকে তিনি সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়েছেন (১৮৩০ খ্রী:), হিন্দু-ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করার জন্য রাধাকান্ত দেব 'ধর্মসভা' স্থাপন করেছেন (১৮৩০ খ্রী:), সতীদাহ-নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলের কাছে আবেদন করার জন্য রাধাকান্ত-গোষ্ঠী অর্থ সংগ্রহ করে বিলেতে ব্যারিস্টার পাঠিয়েছেন (১৮৩১ খ্রী:)।

কিন্তু হায়! গোলামদের সমর্থনে কথা বলার কেউ নেই; দাস-রক্ষাকর্তা-রূপে ধর্মসংস্কারক কিংবা ধর্মরক্ষাকারী কেউই আবির্ভূত হলেন না। 'গোলাম কেনা-বেচার একটা বড় আড়ত' কলকাতা শহরে ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন হলেও গোলাম-ব্যবসার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ, কোনো সভা কিংবা কোনো

আন্দোলন কিছুই হয়নি। তাঁদের জন্য কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেননি। 'প্রগতিশীল' রাজা রামমোহনও নন। সুদীর্ঘ ১৬ বছর তিনি কলকাতায় থেকে নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন, দেশীয় জমিদার ও বিদেশী বণিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি সক্রিয় ও সোচ্চার হয়ে আন্দোলন করেছিলেন; কিন্তু গোলাম-ব্যবসা সম্পর্কে তিনি একটি কথাও বলেননি, নীরব থেকেছেন। তাই প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্ বিমানবিহারী মজুমদার গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, "হিন্দুসমাজ থেকে 'সতীদাহ' বিলোপের দাবি থাকলেও দাসপ্রথা বিলোপের জন্য কোনো দাবিই ছিল না।"[১২]

কিন্তু ধর্মসংস্কারক কিংবা ধর্মরক্ষাকারী এবিষয়ে নিশ্চুপ থাকলেও বিদ্রোহী ডিরোজিওর কবি-কণ্ঠ নীরব থাকেনি। সেই নি:সীম-অন্ধকারের মাঝে দাস-জীবনের রক্ত-ঝরা বেদনা, বন্দী-জীবন থেকে মুক্তিলাভের গভীর আকুতি ধ্বনিত হল একক কবি-কণ্ঠে। শৃঙ্খলিত গোলামের গভীর মর্মবেদনা ও মুক্তি-কামনার প্রকাশ ঘটেছিল ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত মানবপ্রেমিক ডিরোজিওর 'ক্রীতদাসের মুক্তি'[১৩] (Freedom to the Slave) নামক কবিতায়:

> "পুণ্য হোক সেই হাত, যে হাত ছিঁড়েছে খান্ খান্
> শোষকের শিকলকে; ধন্য হোক সে আত্মপ্রসাদ,
> নিপীড়িত মানবাত্মা যার বলে হল বলীয়ান,
> যাতে ক্রীতদাস পেল অবশেষে মুক্তির আস্বাদ।"

১৮৪৩ সালে এদেশে দাস-ব্যবসা বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় রক্ষণশীল কিংবা উদারনৈতিক —কোনো গোষ্ঠীর পত্রিকা আনন্দ প্রকাশ করেননি, আকাশের তারা গোনাই শ্রেয় মনে করেছেন; কিন্তু নিশ্চুপ থাকেননি ডিরোজিওর শিষ্যরা। তাঁদের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকা দাস-প্রথা রহিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করে লিখেছেন (১.৫ ১৮৪৩ খ্রী:), "আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে, বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্চম আইন দ্বারা ভারতবর্ষের দাসক্রয়ের রীতি রহিত হইল এবং এই ব্যবস্থা এতদ্দেশস্থ বহুতর দাসত্বকারদিগের পক্ষে শুভদায়ক প্রযুক্ত আমরা অতি সম্মানপূর্ব্বক গ্রাহ্য করিলাম।" এই আইনের সুফল যাতে গোলামেরা ভোগ করতে পারেন এবং ক্রীতদাসত্ব থেকে যাতে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হন, সেজন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' উক্ত নিবন্ধে আরো লিখেছেন, "কিন্তু যত্যবধি দাসত্ব মোচনের এই আইন গোলামেরদের উত্তমরূপে বোধগম্য না হইবেক তদবধি তাহারা এই ব্যবস্থার উপকার ভোগ করিতে পারিবেক না; এক্ষণে সকল দাসরক্ষকেরা গোলামদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেন এবং তাহাদিগের দ্বারা পূর্ব্ববৎ অন্যায় কর্ম্ম করিয়া লইয়া তাহার ফলভোগ করিবেন, অতএব আমাদের প্রার্থনা এই যে উক্ত আইন যাহাতে ফল-দায়ক হয় সাবধানপূর্ব্বক তাহার উপায় স্পষ্ট হউক যেন গোলামদিগের অনভিজ্ঞতায় বা তাহাদের স্বামিদিগের অন্যায় দ্বারা ইহার কর্ম্ম নষ্ট হয় না, আর সকল প্রদেশে

ইহা উত্তমরূপে প্রকাশিত হউক এবং যাহারা উল্লঙ্ঘন করিবেন তাহাদিগের প্রতি যথোচিত দণ্ডাজ্ঞা হউক।"[১৬]

ক্রীতদাস-ব্যবসার অনাবৃত কুৎসিত রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন যেমন আঠারো বছরের তরুণ ডিরোজিও, তেমনি দেখেছেন পূর্ণ বয়স্ক রামমোহন-দ্বারকানাথ-প্রসন্নকুমার প্রমুখ সংস্কার-আন্দোলনের নায়কেরা। মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অবমাননা-লাঞ্ছনার কোনো প্রতিবাদ তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি। তাঁদের এই আশ্চর্যজনক ঔদাসীন্য ও নীরবতার কারণ কি? একালের রামমোহন-সমর্থক বুদ্ধিজীবীরাই বা কেন এই বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করছেন না? রায় দিতে গিয়ে স্যার জোন্স যে-কথা বলেছেন ("এই বিরাট জনবহুল কলকাতা শহরে এমন একজনও পুরুষ বা স্ত্রীলোক নেই, যাঁর অন্তত একটি গোলাম ছেলে বা মেয়ে নেই।"), সেজন্যই কি সংস্কার-আন্দোলনের নায়ক জমিদার-রাজা-মহারাজারা কোনো কথা বলেননি? তাঁদের গৃহে কি গোলাম ছিল? সেকারণেই কি গোলাম-ব্যবসা নিষিদ্ধকরণের দাবি তাঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়নি?

সামন্ত-শোষণের বীভৎসতম অঙ্গ হল হল দাসপ্রথা ও গোলাম-ব্যবসা। সুতরাং ধনতন্ত্র বিকাশের স্বার্থে দাসপ্রথা-অবলুপ্তির জন্য সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটাতে হয়। দাস-শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গ্রামীণ সমাজকে মুক্তি দিয়েছিল ধনতান্ত্রিক ইউরোপ। কিন্তু বাংলাদেশে উনিশ শতকের প্রথম পর্বে ধনতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেনি বলেই সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কৃষক-বিদ্রোহে ও দাসপ্রথা উচ্ছেদে উভয় গোষ্ঠীর ভূস্বামী-নায়কেরা কোনো নেতৃত্ব দেননি। তাঁদের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রে বাঁধা ছিল। তাই সংস্কার-আন্দোলনের ভূস্বামী নায়কেরা বুর্জোয়া-শিক্ষা ততটুকুই গ্রহণ করেছিলেন, যতটুকু গ্রহণ করলে তাঁদের ভূসম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় না, অথচ সমাজেব নেতৃত্ব লাভ করা যায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলার কৃষক

কেবলমাত্র গোলামদের সম্পর্কে নয়, রায়ত-কৃষকদের সম্পর্কেও রাজা রামমোহন কলকাতায় বসবাসকালে কোনো মন্তব্য প্রকাশ্যে করেননি কিংবা তাঁদের প্রতি তাঁর কোনো সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেনি। যদিও উভয় গোষ্ঠীর ভূস্বামীদের স্বার্থে রামমোহন 'লাখেরাজ' (অর্থাৎ নিষ্কর) জমির উপরে কর-আরোপের প্রতিবাদে আন্দোলন করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা স্থিরীকৃত ভূসম্পত্তির উপরে ব্যক্তিগত অধিকারকে খর্ব করার কোনো রকম প্রয়াসের তীব্র বিরোধী ছিলেন রাজা রামমোহন। কিন্তু কোম্পানি-সরকার যখন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'লাখেরাজ' জমি অধিগ্রহণ-পূর্বক কর-ধার্যের জন্য আইন বিধিবদ্ধ করলেন, তখন 'নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করার প্রয়াসে রক্ষণশীল সকল ব্যক্তিরই কিছু না কিছু স্বার্থহানি ঘটল।'[১] ফলে, জমিদারদের উভয় গোষ্ঠী (আত্মীয়সভা ও ধর্মসভা) অর্থনৈতিক স্বার্থে ধর্মবিষয়ক মতবিরোধ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে উক্ত আইনের বিরোধিতা করেছেন; বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারদের নিয়ে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। 'লাখেরাজ' জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে রাজা ও তাঁর সহযোগীরা বেন্টিঙ্কের কাছে আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন। 'কি স্বদেশে, কি ইংলণ্ড-বাসকালে উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে তিনি কোথাও ক্ষান্ত হন নাই।'[২]

উইলিয়ম অ্যাডাম তাঁর 'A Lecture on the Life and Labours of Rammohun Roy' গ্রন্থে এই আইন-প্রসঙ্গে লিখেছেন, "তৎক্ষণাৎ রামমোহন রায় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারদের মুখপত্র-রূপে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের কাছে প্রতিকার করার জন্য আবেদনসহ দরখাস্ত দিয়ে এই অবিচার ও অত্যাচারমূলক পন্থার প্রতিবাদ করেন। তাঁর আবেদন ব্যর্থ হয়। বিলেতে

গিয়ে তিনি পুনরায় আবেদন করেন, কিন্তু সেখানেও তাঁর আবেদন নামঞ্জুর হয়। ...তাঁর স্বদেশবাসীদের (অর্থাৎ জমিদারদের —লেখক) পক্ষ থেকে, যাঁদের তিনি ভালবাসতেন এবং ব্রিটিশ-সরকারের পক্ষ থেকে যাঁদের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের যোগ ছিল, রামমোহন রায় ভারতে ও বিলেতে সোচ্চার হয়েছিলেন।"[৩] ভূস্বামী-শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার্থে রাজার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ধর্ম-সংস্কারক ও ধর্মরক্ষক উভয় গোষ্ঠীর জমিদারেরা মিলিতভাবে Landholders' Society গঠন করেন (২১ মার্চ, ১৮৩৮ খ্রী:)।

কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত জমিদারদের বিশাল সমাবেশে গঠিত এই সমিতির সভাপতি হলেন রাধাকান্ত দেব, যুগ্ম-সম্পাদক প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও William Cold Hurry ('Englishman' পত্রিকার সম্পাদক) এবং সদস্য হলেন থিয়োডোর ডিকেন্স, জর্জ প্রিন্সেপ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ রায়, রাজা কালীকৃষ্ণ, রামকমল সেন, আশুতোষ দেব, রামরত্ন রায়, মুন্সী আমীর।[৪] তবে 'দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন ল্যাণ্ড হোলডার্স সোসাইটির প্রাণস্বরূপ।'[৫] তাঁদের উদ্দেশ্য হল : 'প্রথম —রাজস্বমুক্ত ভূমিস্বত্বের (অর্থাৎ লাখেরাজ জমির—লেখক) পুনর্গ্রহণে বাধা দেওয়া। দ্বিতীয় —সমস্ত ব্রিটিশ-ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা অনুরূপ কোন কার্যক্রমের প্রসার।'[৬] লাখেরাজ জমির পুনর্গ্রহণের বিরুদ্ধে এবং সমগ্র ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পক্ষে যে দাবি রাজা রামমোহন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করেছিলেন, সেই দাবিগুলিকে কার্যকরী করার জন্য 'জমিদার সভা' সচেষ্ট হলেন। দ্বারকানাথ লাখেরাজ-স্বত্ব পুনর্গ্রহণের বিরুদ্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন, "লাখেরাজ, রাজস্বমুক্ত বা অপর শ্রেণীর কোন সম্পত্তি নিয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে না।"[৭] ভবানীচরণ নিষ্কর জমিতে কর-ধার্যের বিরুদ্ধে বারেবারে আবেদন করেছেন।[৮] এইভাবে রামমোহনের সমাজ-সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গি জমিদারদের মধ্যে যে বিরোধ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল, রাজার শ্রেণী-সচেতন অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সেই বিরোধের অবসান ঘটিয়ে উভয় গোষ্ঠীর ভূস্বামীদের ঐক্যবদ্ধ করল।

কেবলমাত্র লাখেরাজ প্রশ্ন নয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-জনিত ভূস্বামী ও রায়ত-সমস্যার বিষয়ে রাজার চিন্তাধারায় ও কর্মকাণ্ডে ভূস্বামীশ্রেণীর স্বার্থ-রক্ষার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এ-বিষয়ে তাঁর চিন্তার অভিব্যক্তি ঘটেছে সুদূর বিলেতে। রামমোহন দিল্লীর বাদশাহের দূত-রূপে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হয়ে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ নভেম্বরে ব্রিটেন-অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ এপ্রিলে লিভারপুলে অবতরণ করে ১৮ এপ্রিলে লণ্ডনে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁর সঙ্গে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ ঘটে।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারি কমিটি ভারতের রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে রামমোহনকে ৫৪টি প্রশ্ন করেন। ১৯ আগস্ট-এ তিনি এই সমস্ত প্রশ্নের লিখিত উত্তর দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে পরিশিষ্টে একটি পৃথক স্মারকলিপি দিয়েছেন।

ভারতের ভূমি-ব্যবস্থা, ভূমি-রাজস্ব, জমিদার ও কৃষকের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে রাজা রামমোহনের সামগ্রিক চিন্তাধারার পরিচয় এতে পাওয়া যায়। সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্নে রাজার ভূমিকার সঠিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই উত্তরমালা ও স্মারকলিপি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অবশ্য দিলীপকুমার বিশ্বাস মনে করেন, বিলেতে যাওয়ার পূর্বে রামমোহন ভূমি-সমস্যা সম্পর্কিত তাঁর অভিমত জানিয়ে ১৮২৯ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্ককে এক[৮] স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। শ্রী বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে এতাবৎকাল পর্যন্ত অজ্ঞাত ভূমি-সমস্যা বিষয়ে রামমোহনের লিখিত একটি স্মারকলিপি[৯] পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছেন। এই স্মারকলিপিটি নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। শ্রী বিশ্বাস বলেছেন, "পাণ্ডুলিপির পিছনে পেন্‌সিলে পরিষ্কার লেখা" রয়েছে "5th Dec"।[১০] কোনো সালের উল্লেখ নেই। তাই এই তারিখটি কোন্ বছরের তা তিনি 'পরোক্ষ অভ্যন্তরীণ প্রমাণ' উপস্থিত করে বলেছেন, "রচনাটি শেষ হয়েছিল ১৮২৯ সালে ; পশ্চাদ্‌ভাগে দেওয়া ৫ ডিসেম্বর তারিখটি সরকারী দপ্তরে সেটি প্রাপ্তির তারিখ। সুতরাং ধরে নেওয়া চলে রামমোহন ৫ ডিসেম্বর, ১৮২৯ তারিখে স্মারকলিপিটি সরকারে দাখিল করেছিলেন।"[১১]

কিন্তু শ্রী বিশ্বাসের উক্ত দাবি কয়েকটি প্রশ্নের উদ্রেক করে : (১) স্মারকলিপিটির পিছনে রামমোহন কেন কোনো তারিখ ও খ্রীষ্টাব্দ উল্লেখ করেননি? অথচ হাউস অব কমন্স কর্তৃক নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটির কাছে ১৮৩১ সালে প্রদত্ত প্রত্যেকটি স্মারকলিপির শেষে তিনি সাল-তারিখ উল্লেখ করেছেন। (২) 'সরকারে দাখিল' করা স্মারকলিপিটির শেষে তারিখটি পেনসিলে লেখা কেন? কেন তাতে সরকারি শীলমোহর-সহ কালিতে লেখা তারিখ নেই? সে-সময়ে ব্রিটিশ-সরকার রামমোহনের কাছ থেকে যে-সমস্ত স্মারকলিপি পেয়েছিলেন, সেগুলির প্রাপ্তির তারিখ কি বছরের উল্লেখ না করে কেবলমাত্র মাস ও তারিখ পেন্‌সিলে লেখা হয়েছে? (৩) স্মারকলিপির শীর্ষে কাকে এই স্মারকলিপি দেওয়া হচ্ছে, তার কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু কেন নেই? স্মারকলিপি যখন কাউকে দেওয়া হয়, তখন তাঁকে সম্বোধন করে স্মারকলিপি লেখা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি এবং অধ্যাপক বিশ্বাসও বলেননি কাকে এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল? সম্বোধনবিহীন স্মারকলিপি কি কাউকে দেওয়া যায়? (৪) ১৮২৯ সালের ৫ ডিসেম্বর-এ রামমোহন যদি উক্ত 'স্মারকলিপিটি সরকারে দাখিল' করে থাকেন, তবে তিনি কেন সে-বিষয় দ্বারকানাথ-প্রসন্নকুমার প্রমুখদের বলেননি, যাঁরা তাঁর প্রত্যেকটি সংস্কারমূলক কাজের সহযোগী ও একান্ত অনুরাগী ছিলেন? (৫) অন্যান্য স্মারকলিপির নকল কলকাতায় রামমোহনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকলেও এই স্মারকলিপির নকল তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে নেই কেন? ধর্ম ও সমাজ-সম্পর্কিত বিষয়ে রামমোহন তাঁর অভিমত পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করলেও ভূমি-সমস্যা

বিষয়ক তাঁর অভিমত কেন মুদ্রিত করলেন না? (৬) রামমোহন ১৮৩১ সালে সিলেক্ট কমিটির কাছে যে-ভূমিরাজস্ব-সম্পর্কিত স্মারকলিপি দিয়েছিলেন, তাতে কোথাও তিনি উল্লেখ করেননি যে, এ-বিষয়ে তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইতোপূর্বে স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কেন তা উল্লেখ করলেন না?

এই সমস্ত প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত শ্রী বিশ্বাসের অভিমত গ্রহণ করা যায় না। তবে প্রশ্নটা থেকেই যায়, কবে রামমোহন এই স্মারকলিপি রচনা করেছিলেন? অধ্যাপক বিশ্বাস স্মারকলিপিটি ছেপে দিয়ে নিচে লিখেছেন, "দলিলের শেষ পৃষ্ঠার পশ্চাৎভাগে লিখিত :

Rammohun Roy

Ryut. Regus.

5 Dec.

(Manuscript old Welbeck number 1869)

এবং এটি পেন্‌সিলে লেখা। উপরের লেখা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অযৌক্তিক হবে না যে, রামমোহন ১৮৩১ সালে সিলেক্ট কমিটির কাছে স্মারকলিপি দেবার পূর্বে একটি খসড়া পাণ্ডুলিপি লিখেছিলেন এবং সেটি তাঁর কাছে রক্ষিত ছিল। খসড়া পাণ্ডুলিপিতে সাধারণত সাল-তারিখ ও সম্বোধিত ব্যক্তির নাম-পদের উল্লেখ থাকে না এবং সেকারণে এই পাণ্ডুলিপিতে রামমোহন কোনো কিছুই উল্লেখ করেননি। তাঁর মৃত্যুর পরে উক্ত খসড়া পাণ্ডুলিপি কোনো এক বছরের ৫ ডিসেম্বর তারিখে নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে জমা দেওয়া হয় এবং গ্রন্থাগারিক পেন্‌সিলে উক্ত তারিখটি লেখেন।" সুতরাং "১৮৩১ সালে হাউস অব কমন্‌সের আহ্বান পাওয়ার অনেক পূর্ব হতেই রামমোহন ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেছেন। ১৮২২ কি তারও পূর্বে তাঁর অর্থনীতিচর্চার আরম্ভ।"[১২] —অধ্যাপক বিশ্বাসের এই দাবি ভক্তিবিগলিত চিত্তে গ্রহণ করা যায়; যুক্তির বিচারে গ্রহণ করা যায় না।

শ্রী বিশ্বাস কর্তৃক উপস্থাপিত স্মারকলিপিটি রামমোহন ১৮২৯ সালে লিখেছেন কিংবা ১৮৩১ সনে রচনা করেছেন এই সমস্যার মীমাংসা পণ্ডিত-গবেষকেরা করুন; কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের কাছে মূল প্রশ্ন হল, এই স্মারকলিপিতে ভূমি ও রায়ত-সমস্যা সম্পর্কে রামমোহন যা বলেছেন, তার সঙ্গে কি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের উত্তরমালা ও স্মারকলিপিতে অভিব্যক্ত তাঁর চিন্তাধারার সাদৃশ্য রয়েছে? এই দুটি স্মারকলিপি ও উত্তরমালা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এগুলির মধ্যে একই চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে এবং শ্রী বিশ্বাস তা স্বীকার করে বলেছেন, "সিলেক্ট কমিটির সামনে তিনি পরজীবনে যা বলেছেন—সূত্রাকারে তার রাজস্ব-সংক্রান্ত অংশের সারমর্ম আলোচ্য লিপিতে আভাসিত।"[১৩] তারপরে উৎপীড়িত কৃষক-রায়তদের প্রতি রামমোহনের গভীর সহানুভূতি দেখানোর

জন্য শ্রী বিশ্বাস আলোচ্য স্মারকলিপির সারাংশ দিয়েছেন ; কিন্তু জমিদারদের জন্য রাজার যে সমপরিমাণে সহানুভূতি ও দুশ্চিন্তা ছিল, তা তিনি গোপন করেছেন। শ্রী বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত স্মারকলিপিতে রাজা বলেছেন, "এটাই বর্তমানে কাম্য যে, সরকারের এমন কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত যাতে জমিদারদের প্রাপ্য রাজস্ব, যা তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, তা থেকে তাঁদের বঞ্চিত না করেও (without depriving the zumeendars of those revenues) রায়তদের অধিকার ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হয়।"[১৪] অর্থাৎ ভূস্বামীদের স্বার্থ রক্ষা করেই রায়তদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। অধ্যাপক বিশ্বাস রাজাকে সমর্থন করতে গিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতিটির সারাংশ করতে ভুলে গিয়েছেন। অবশ্য তিনি একাই এই 'ভুল' করেননি, একালের রাজার সমর্থক পণ্ডিতব্যক্তিরা শ্রী বিশ্বাসের মতো কেবলমাত্র রামমোহনের রায়ত-প্রীতির কথা বলেছেন, রাজার ভূস্বামী-ভালোবাসার কথা বলতে ভুলে গিয়েছেন। অবশ্য এই ভুলে যাওয়ার রোগে কেবলমাত্র তিনিই আক্রান্ত হননি, একালের রামমোহন-সমর্থক পণ্ডিত-ব্যক্তিরাও এই সংক্রামক রোগে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে রামমোহনের রায়ত-দরদের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর রচনা থেকে সুবিধামত আংশিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তবে এঁদের কথা বলার পূর্বে সমকালীন ইতিহাসের প্রেক্ষিতে রামমোহনের রায়ত-সম্পর্কিত চিন্তাধারা বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

ইংলণ্ডে যাবার পূর্বে রামমোহন এদেশে দেখেছেন যে, গ্রামীণ মানুষের চেতনার ক্রমবিকাশের (সেকালের কৃষকদের ভূস্বামী-বিরোধী বিদ্রোহগুলি ক্রমেই শাসক-বিরোধী সংগ্রামে পরিণত হচ্ছে) সঙ্গে সঙ্গে শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-মনোভাবের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। ডিরোজিও এবং তাঁর তরুণ শিষ্যরা সেকালের তরুণ-সমাজের উপরে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন। তাঁদের বক্তৃতায় ও কার্যকলাপে সমাজে যে-আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল, সম্ভবত রামমোহন তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাছাড়া ইংলণ্ডে গিয়ে বুর্জোয়া-আদর্শে প্রভাবিত বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনার দ্বারা রামমোহনের বুর্জোয়া-চেতনা অধিকতর সমৃদ্ধ ও সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। তাই কলকাতায় বসবাস-কালে রায়তদের সম্পর্কে যে-কথা বলতে পারেননি, ইংলণ্ডে থাকাকালে রায়তদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সুলিখিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু রায়ত-জমিদার প্রশ্নে রাজার বক্তব্যে উদারনৈতিক চেতনার সঙ্গে সামন্ত-অর্থ নৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সামন্ততান্ত্রিক সত্ত্বা ও স্বার্থ ভূমি-ব্যবস্থার প্রশ্নে তাঁর বুর্জোয়া-দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করেছে। ভূমি-রাজস্ব-সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর যে উত্তর এবং যে সংযোজনী রামমোহন দিয়েছেন, তার মধ্যে এই স্ববিরোধিতা পরিস্ফুট।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার দেওয়ানি-লাভের পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করার জন্য তৎকালে প্রচলিত ভূমি-ব্যবস্থা পরিবর্তনের

জন্য উদ্যোগী হলেন এবং নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের শেষে তাঁরা ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করলেন। এই বন্দোবস্ত প্রথমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় এবং পরে উত্তর-মাদ্রাজের কোনো কোনো অংশে প্রবর্তিত হল। কোম্পানী-সরকার সর্বোচ্চ হারে কর-আরোপের ভিত্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে যাঁদেরকে জমির মালিক-রূপে স্বীকৃতি দিলেন, তাঁরা কেউই জমির মালিক ছিলেন না, যদিও বংশানুক্রমে তাঁদের অধিকার ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকত। তাঁরা 'জমিদার' নামে অভিহিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন ইজারাদার বা পূর্ববর্তী শাসকগণ কর্তৃক নিযুক্ত কর-সংগ্রাহক মাত্র। এই বন্দোবস্ত-অনুসারে সরকারকে দেয় রাজস্ব ভিন্ন জমির মালিক হিসাবে তাঁদের আর কোনো দায়-দায়িত্ব রইল না। 'জমিদারী তাঁদের মূলধনে পরিণত হল। আগে দেশীয় প্রথানুসারে খোদকস্ত প্রজাদের বংশানুক্রমে চাষের ও বাসের ভূমির উপর যে অধিকার ছিল তা নতুন ব্যবস্থার ফলে রইল না। জমিদাররা প্রজাদের উচ্ছেদ করা ও খাজনা-বৃদ্ধি করার পূর্ণ অধিকার পেলেন।'[১৫] এভাবে ভূমিস্বত্ববিহীন 'জমিদার'দের জমির মালিকানা দানের ফলে কৃষকেরা জমির স্বত্ব হারিয়ে জমিদারের রায়তে পরিণত হলেন।

এদেশের ধনসম্পদ লুণ্ঠনই ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য। একদিকে তাঁরা যেমন বাণিজ্যের নামে সীমাহীন লুণ্ঠনের দ্বারা দেশীয় শিল্পগুলিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছেন, অন্যদিকে তাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও অভাবনীয়ভাবে ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধির দ্বারা কৃষকের জীবনে ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ঘটিয়েছেন। ১৭৬৪-৬৫ সালে মোগল সম্রাটের প্রতিনিধিদের শাসনকালের শেষ বৎসরে অর্থাৎ কোম্পানির দেওয়ানি-লাভের পূর্ব বৎসরে বাংলার ভূমি-রাজস্বের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১ কোটী ২৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু কোম্পানি কর্তৃক অর্থনৈতিক শাসনের দায়িত্ব গ্রহণের পরে প্রথম বৎসরে (১৭৬৫-৬৬ খ্রী:) পূর্বোক্ত রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা হল এবং ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার পরে তার পরিমাণ দাঁড়াল ৪ কোটি ২ লক্ষ টাকা।[১৬]

যাঁরা কোম্পানির দেওয়ানি-বেনিয়ানি-মুচ্ছুদ্দিগিরি করে, হাটবাজারের ইজারা নিয়ে, লবণের ব্যবসার ইজারাদারি করে, নীলের ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকে প্রচুর ধন উপার্জন করেছিলেন, তাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে পুরোনো জমিদারের কাছ থেকে জমিদারি কিনে নিয়ে বাংলার গ্রাম-জীবনে নয়া জমিদার-রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কোম্পানির প্রয়োজন ছিল টাকার; তাই বাংলাদেশের মানুষের এবং প্রধানত কৃষক-সমাজের সম্পদ শোষণ করে যত বেশি সম্ভব অর্থ সংগ্রহ করার দিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল। তাছাড়া দেশের অনিশ্চিত ও অশান্ত অবস্থার মধ্যে মোটামুটি শান্তি স্থাপন করার এবং কোম্পানি-সরকারের পক্ষে সামাজিক সমর্থন পাবার জন্য তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। তাই তাঁরা বিদেশী-সরকারের শক্তিশালী সমর্থক

ও প্রভাবশালী সামাজিক সহায়ক হিসাবে এই নয়া জমিদারদের সৃষ্টি করলেন।[১৭] অতীতের ঐতিহ্যবাহী বনেদী জমিদারদের পরিবর্তে নয়া ভূমি-ব্যবস্থায় যাঁরা জমির মালিক-রূপে আবির্ভূত হলেন, কৃষক-সমাজের কাছে তাঁরা-রক্তশোষক-রূপে দেখা দিয়েছিলেন। তাঁরা কেউই গ্রামে বসবাস করতেন না; সকলেই ছিলেন শহরের অধিবাসী ও 'দাঁওবাজ' ব্যবসায়ী। নিজেদের অর্থতৃষ্ণা মেটাবার জন্য 'সংবাদ প্রভাকর'-এর ভাষায় তাঁরা 'প্রজার বক্ষের উপর বাঁশ দিয়া টাকা সংগ্রহ করেন।'[১৮]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক-বিহীন যে নতুন ভূস্বামীশ্রেণী সৃষ্টি করা হল, তাঁরা যাতে বল্গা-ছাড়া কৃষক-শোষণ করতে পারেন, সেজন্য কোম্পানি-সরকার শহরবাসী নতুন জমিদারদের সাহায্যকল্পে বিভিন্ন ধরনের উৎপীড়নমূলক আইন প্রণয়ন করেছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলি ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কুখ্যাত 'হফ্‌তম' (সপ্তম) আইন জারি করেন—'৭নং রেগুলেশনের মাধ্যমে জমিদার-রায়ত সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন আনা হয়। ১৭৯৩ সনের ১৭ নং রেগুলেশনে রায়ত সম্পর্কে যে-সব বিধিনিষেধ জমিদারদের উপর আরোপ করা হয় তা প্রত্যাহার করে জমিদারদের দেওয়া হয় স্বৈরতন্ত্রী কর্তৃত্ব। ১৭৯৯ সনের ৭নং রেগুলেশনের কয়েকটি ধারা:

১। জমিদার সরকারী অনুমতি ছাড়াই প্রজাকে বন্দী করতে পারবে। (ধারা ১৫, উপধারা ১)।

২। জমিদার বকেয়া খাজনা উদ্ধারকালে প্রজার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। এহেন বাজেয়াপ্ত সম্পর্কে প্রজা আদালতে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। (ধারা ১৫, উপধারা ৬)।

৩। বাকী খাজনা উদ্ধারকল্পে প্রয়োজন হলে প্রজাকে তার বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করতে পারবে। (ধারা ১৫, উপধারা ৭)।

৪। জমিদার প্রজাকে কাছারীতে ডেকে আনতে বাধ্য করতে পারবে। সেজন্য দৈহিক নির্যাতনের অভিযোগে প্রজা কোন ফৌজদারী মামলা রুজু করতে পারবে না। (ধারা ১৫, উপধারা ৮)।'[১৯]

এই আইনের বলে জমিদারেরা রায়তদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার স্বৈরাচারী ক্ষমতা লাভ করলেন। এই আইনানুযায়ী আদালতের সাহায্য ছাড়াই জমি-দারেরা যে শুধু বাকি খাজনার দায়ে প্রজাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারতেন তাই নয়, আদালতের সাহায্য নিয়ে বাকি খাজনা না দেওয়া পর্যন্ত জমিদারেরা প্রজাদের আটক করে রাখতে পারতেন। 'হফ্‌তম' আইনে আরো বলা হল, প্রজারা এক জমিদারের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় যেতে পারবেন না, অন্য জমি-দারের জমি চাষ করতে পারবেন না, চাষ করলে জমিদার তাঁদের আটক বা কয়েদ পর্যন্ত করতে পারবেন।[২০]

'হফ্‌তম' আইনের সাহায্যে জমিদার-মধ্যশ্রেণী প্রজাদের উপরে যে নারকীয়

পীড়ন-লুণ্ঠন করেছেন, তা তৎকালীন শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত ভূস্বামীদের অজানা ছিল না। সে-সময়ে সমস্ত জেলা-শাসকেরা জানিয়েছেন যে, 'হফতম' আইনের দ্বারা বলীয়ান হয়ে জমিদারেরা ও তাঁদের আমলারা সহায়-সম্বলহীন প্রজাদের উপরে নিষ্ঠুর অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছেন। যেমন দিনাজপুরের জেলা-শাসক ১৮১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর-এ বলেছেন, "আমি কেবলমাত্র এটুকু যোগ করতে চাই যে, এই জেলার কৃষকেরা জমিদারদের ও তাঁদের আমলাদের আবওয়াব আদায়, মাল ক্রোক করা ইত্যাদি নিপীড়নমূলক দমননীতির বিরুদ্ধে গভীর বেদনায় অভিভূত হয়ে উচ্চস্বরে অসংখ্য অভিযোগ করেছেন। বেআইনীভাবে আটক রাখা, আবওয়াব প্রদানে বাধ্য করার জন্য নানাবিধ অত্যাচার করা অথবা তাঁদের কাছ থেকে জামিন আদায় করা ইত্যাদির জন্য জমিদারদের ও আমলাদের বিরুদ্ধে রায়তেরা ফৌজদারি আদালতে যে-সমস্ত মামলা করেছেন, আমি জানি, তার সংখ্যা ফৌজদারি আদালতের মোট মামলার অর্ধেক। কিন্তু বর্তমানে তাঁদের অভিযোগগুলির ফয়সালা হওয়ার পূর্বেই তাঁরা আর্থিক দুর্দশার কারণে মামলাগুলি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।"[২১]

কিন্তু কৃষকেরা বিনা প্রতিবাদে 'হফ্তম' আইনকে স্বীকার করেননি। আইনের দ্বারা স্বীকৃত জমিদারের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে তাঁরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন, আর, কখনো-বা জমিদারের অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করেছেন। প্রজাদের নালিশ বন্ধ করার জন্য কোম্পানি-সরকার ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে 'পন্‌জম' (পঞ্চম) আইন জারি করলেন। এই আইনের দ্বারা ভূস্বামীর গোমস্তাদের বিরুদ্ধে কিংবা ভূস্বামীর বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হল এবং যে-কোনো হারে খাজনা ধার্য করার অধিকার জমিদারদের দেওয়া হল। এই আইনে 'কদিমি' প্রজা যাঁরা, দীর্ঘকাল ধরে যাঁরা একই নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিয়ে জমি ভোগ-দখল করে এসেছেন, তাঁদেরও খাজনার নিরিখ পরিবর্তন করবার, এমন কি তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করবার অধিকারও দেওয়া হল।[২২]

ব্রিটিশ-শাসকশ্রেণী একথা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এক সুবিশাল জনসমষ্টির উপরে মুষ্টিমেয় ইংরেজের প্রভুত্ব বজায় রাখতে হলে ভারতীয় সমাজের মধ্য থেকেই এমন এক নতুন শ্রেণী সৃষ্টি করতে হবে, লুটের মালের অংশীদার হয়ে যাঁদের স্বার্থ ব্রিটিশ-শাসন বজায় রাখার ব্যাপারে ব্রিটিশ-স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে যাবে।[২৩] সুতরাং তাঁরা একদিকে যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা নতুন ভূস্বামীশ্রেণী সৃষ্টি করলেন, অন্যদিকে তাঁরা ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম আইন জারি করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত মধ্যশ্রেণী বা মধ্যস্বত্বাধিকারীদের আইনগত স্বীকৃতি দিলেন। ১৮৭২-৭৩ সালের সরকারি হিসেব থেকে জানা যায়, দেড় লক্ষ জমিদারের নিচে নয় লক্ষ মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি হয়েছে। সর্বোচ্চ স্তরে জমিদার ও সর্বনিম্ন স্তরে কৃষক, মধ্যে নানা ধরনের স্বত্বাধিকারী —পিরামিড-সদৃশ ভূমি-ব্যবস্থার এই

চিত্রটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে নিম্নের দুটি সারণী[২৪] থেকে :

(ক)

জমির পরিমাণ	জমিদারের সংখ্যা
৬০,০০০ বিঘার উপরে	৫৩৩
৬০,০০০ থেকে ১৫০০ বিঘা	১৫,৭৪৭
১৫০০ বিঘার কম	১৩,৭৯,২০৩

(খ) কৃষক, জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা :

কৃষক	...	৬৩,৯১,০৭৪
জমিদার	...	৪২,৬১৮
ইৎমামদার	...	৫৮৬
ঠিকাদার	...	৩০৩
ইজারাদার	...	৩,৩৫৪
লাখেরাজদার	...	২৩,০৭০
জায়গীরদার	...	৩৬৫
ঘাটোয়াল	...	৬৬৮
আয়মাদার	...	২,০০৪
মকরারীদার	...	৯,৯৩৩
তালুকদার	...	৯৬,০৫০
পত্তনিদার	...	৩,৩৭২
খোদকস্ত প্রজা	...	৭,৫৫২
মহলদার	...	১,১২৮
জোতদার	...	১৯,৫৬৪
গাঁতিদার	...	৩,৮২৪
হাওলাদার	...	৯,৩৪৩

তাছাড়া ছিল জমিদারের দেওয়ান, নায়েব, এস্টেট-ম্যানেজার, গোমস্তা, পাইক, তহশীলদার, দফাদার, পাটোয়ারী, মণ্ডল, জমিদারের ভৃত্য প্রভৃতিদের সংখ্যা ছিল ৫৮,৭৪৯। এঁরাও ছিলেন কৃষক-শোষণের অংশীদার — গ্রাম্য মধ্য-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তখনি গড়ে এক একটি জমিদারি-এস্টেটের মধ্যে ছয়টি করে মধ্যস্বত্বের আর্বির্ভাব ঘটেছে।[২৫] এই মধ্যস্বত্বভোগী ব্যক্তিরা ছিলেন ব্রিটিশ-শাসকদের প্রধান সামাজিক ভিত্তি এবং শহরবাসী 'অনুপস্থিত' জমিদারদের প্রতিনিধি-রূপে এঁরা সামন্ত-শোষণের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন। এঁদের অকল্পনীয় শোষণ-লুণ্ঠনের ফলে বাংলার রায়তেরা ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হলেন। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা যে-নতুন কৃষি-কাঠামো গড়ে উঠেছিল, তা ছিল রায়তদের জীবনে অভিশাপ-স্বরূপ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইলবার্ট বলেছেন, "১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের আইনে রায়তের অধিকার অমীমাংসিত ও অনির্নীত অবস্থায় মুলতুবী রইল। এরকম রাখার উদ্দেশ্য ছিল তাকে আরো

ঘোলাটে করা, মুছে ফেলা এবং বহুক্ষেত্রে তা ধ্বংস করা।"[২৬]

সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও 'হফ্তম,' 'পন্জম', 'অষ্টম' ইত্যাদি আইনগুলি উচ্ছেদ না করে সামন্ত-শোষণ বন্ধ করা যায় না এবং ধনতন্ত্রের প্রসার ঘটে না। রায়তদের রক্ষা করার জন্য সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে জমিদারি-প্রথা ও শোষণমূলক আইনগুলির বিলুপ্তির দাবি করতে হবে।

মধ্যস্বত্বাধিকারী ব্যক্তিদের নৃশংস শোষণ-পীড়ন সম্পর্কে ব্রিটিশ-পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির এক প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন বলেছেন, "এরূপ মধ্যস্বত্বাধিকারীরা প্রায়ই নিযুক্ত হতেন এবং জমিদারদের চেয়ে এঁরা অধিকতর নির্দয় ছিলেন।"[২৭] তাই তিনি ভূস্বামী ও মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ-অত্যাচার থেকে রায়তদের রক্ষা-কল্পে প্রশাসনিক সংস্কারের পরামর্শ দিয়েছেন।[২৮] কিন্তু তিনি কোথাও জমিদারি-প্রথা অবসানের জন্য ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রত্যাহার কিংবা মধ্যস্বত্ব-ব্যবস্থা বিলুপ্তির জন্য ১৮১৯ সনের অষ্টম আইন ও উৎপীড়নমূলক 'হফ্তম', 'পন্জম' আইন অবসানের দাবি করেননি অথবা সমালোচনাও করেননি। যদিও সে-যুগের সংবাদপত্রগুলি এই সমস্ত রায়ত-পীড়ক আইনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা লিখেছেন (২০.৮.১৮৫৭), "জমিদার, পত্তনিয়াদার, তালুকদার, দরপত্তনিয়াদার ইত্যাদি ভূমির উৎপন্নভোগীর সংখ্যা রাজনিয়মবলে যত বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে ততই কৃষকের ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে।...গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি কৃষকের দুর্দ্দশা সমস্ত সন্দর্শনপূর্ব্বক যদ্যপি রাজনিয়মাদির সংশোধন করেন, তবে কৃষকের দু:খ অনেক মোচন হইতে পারে।"[২৯] কিন্তু এই সমস্ত আইনের সংশোধন কিংবা প্রত্যাহার-রহিত না হলে রায়তদের দু:খ-দুর্দশার অবসান যে ঘটবে না, তাও 'সংবাদ প্রভাকর' বলেছেন (১৮. ১১.১৮৯২), "ফলত: ঐ নিয়ম প্রচলিত থাকিলে কোন কালেই এই বঙ্গদেশের কৃষকদিগের অবস্থা সংশোধন হইবেক না। চিরকাল তাহাদিগকে পরিবার সহিত ঘোরতর যন্ত্রণারাশি সম্ভোগ করিতে হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই।"[৩০]

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা লিখেছেন (সেপ্টেম্বর, ১৮৬৩), "১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধান মতে পত্তনি দিবার যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, তাহা প্রজাগণের অধিকতর অনিষ্টের কারণ।"[৩১] 'পন্জম' আইন সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ' বলেছেন (সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪), "১৮১২ সালের ৫ আইনেরাপরগণার প্রচলিত নিরিখ অনুসারে ভূমির কর ধার্য্য হইবার ব্যবস্থা ছিল তদ্দ্বারা যে কত প্রজা এককালে উৎসন্ন হইয়াছিল, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না।"[৩২]

'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় জনৈক পাঠক লিখেছেন (১. ১১.১৮৪৩), "জমীদারদের দৌরাত্ম্যতেই প্রজাগণকে দু:খভোগ করিতে হয়, লার্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালীন জমীদারদিগকে ক্ষমতা প্রদান করাতেই তাহাদের রাইয়তদের উপর দৌরাত্ম্য করণের পন্থা হয়। ১৭৯৩ শালের ১৭ আইনের ২

প্রকরণ দ্বারা ভূম্যধিকারিরা যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তাহাতে জমীদারেরা রাইয়তদের উপর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন অতএব ঐ আইনের দ্বারা প্রজাগণের পক্ষে কেবল অহিত হইতেছে ...১৭৯৩ শালের ১৭ আইনের ২১ প্রকরণানুসারে খাজানা আদায়ের নিমিত্ত রাইয়তদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে প্যারিত না কিন্তু ১৭৯৯ শালের ৭ আইনের ১৮ ধারাতে তাহা রহিত হইয়া এই হুকুম হইয়াছে যে যদি কেহ অন্তঃপুরে মালামাল লুক্কাইয়া রাখে তবে পোলিসের একজন লোক সমভিব্যবহারে লইয়া অন্বেষণ করিতে যাইতে পারিবেক, পোলিসের লোকেরদের চরিত্র সকলেই জ্ঞাত আছেন, অতএব ঐ আইনে রাইয়তদিগের পক্ষে যে কি পর্য্যন্ত মন্দ হইয়াছে সকলে জানিতে পারিতেছেন।"৩৩

'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা লিখেছেন (১০.৫.১৮৩৩), "এরকম অবস্থা জেনেও জমিদারেরা তাঁদের পুরোনো অভ্যাস বজায় রেখেছেন। তাঁরা আইনানুগ আয়ে সন্তুষ্ট না থেকে তাঁদের হতভাগ্য প্রজাদের উপরে চাপ দিয়ে ও অত্যাচার করে নানাধরনের আদায় করতে থাকলে আত্মসমর্পণ ছাড়া কৃষকদের আর কোনো বিকল্প রইল না। কেন না আপত্তি জানালে তাঁরা ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবেন। তাই তাঁরা (আমরা বলব বুদ্ধি করে) দুটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মন্দটাই বেছে নিলেন।"৩৪

তাই রামমোহনের ভূমি-সম্পর্কিত বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে 'বেঙ্গল হরকরা' জিজ্ঞাসা করেছেন, "কি করে রামমোহন ১৭৯৯ সালের সাত নম্বর রেগুলেশন ভুলতে পারলেন? ...কি করে রামমোহন বলতে ভুলে গেলেন যে, ভয়াবহ ক্ষমতা প্রয়োগ করে (গ্রেফ্‌তার ও কয়েদ করা হয় এমন মামলায় যেখানে রায়তের ক্ষমতা যদি ১০০ টাকার মত হয় সেখানে জমিদারের ক্ষমতা লাখ টাকার) এবং অন্য কিছু না করেও খাজনা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কি করে ভুললেন যে, মৌরসী পাট্টা (বংশানুক্রমিক) বলপ্রয়োগ করে খুদকাস্ত রায়তদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং তার বদলে মেয়াদি পাট্টা (নির্দিষ্ট বৎসরের জন্য পাট্টা) তাঁদের দেওয়া হল। তাঁদের প্রজাস্বত্ব জমিদারের খেয়াল খুশী অনুযায়ী দেওয়া হল, এবং তা করা হল মূঢ় কর্ণওয়ালিস-সরকারের প্রশাসনের মাধ্যমে, যাঁরা ভেবেছিলেন যে, তাঁরা (অর্থাৎ জমিদার — লেখক) প্রজাদের কল্যাণ ও উন্নতি করবেন, যেখানে তাঁরা প্রজাদের শেষ টাকাটি পর্যন্ত গ্রাস করছেন।'৩৫

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা জমির মালিকানা থেকে কৃষকদের বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে রামমোহন বলেছেন, "১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির উপরে জমিদারদের অধিকার শর্তহীনভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জমির উপর কোনো রকমের স্বত্বাধিকার কৃষকদের দেওয়া হয়নি।"৩৬ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যে কেবলমাত্র ভূস্বামীশ্রেণী লাভবান হয়েছেন, তা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, "১৭৯৩ সালের আইনের ১নং ও ৮ নং রেগুলেশনের বলে এবং

পরবর্তী অন্যান্য রেগুলেশন দ্বারা জমিদারদের নতুনভাবে জমি বন্দোবস্ত ও খাজনা-বৃদ্ধির অধিকার দেওয়ায় প্রজাদের স্বার্থের বিনিময়ে, বরং বলা চলে তাঁদের ধ্বংস করে মুষ্টিমেয় জমিদার লাভবান হয়েছেন।"[৩৭]

কিন্তু এই অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবিধানকল্পে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান কিংবা কৃষকদের জমির স্বত্বাধিকার দেবার কোনো দাবি তিনি উত্থাপন করেননি। কারণ 'রাজা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন।'[৩৮] তাই তিনি সমগ্র ভারতে রায়তওয়ারী-ব্যবস্থার পরিবর্তে জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন।

ব্রিটিশ-ভারতে কোম্পানি-সরকার তিন ধরনের ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন :— (১) চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত —বাংলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার কিছু অংশ, মাদ্রাজের কিছু অংশ এবং যুক্তপ্রদেশের বেনারস এলাকায় চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। ব্রিটিশ-ভারতের মোট আয়তনের শতকরা ১৯ ভাগ এই ব্যবস্থার অধীন। (২) অস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত — পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশের অধিকাংশ অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, বাংলা ও বোম্বাইয়ের কিছু অংশে অস্থায়ী জমিদারি প্রথা জারি করা হয়। এই ব্যবস্থার অধীনে ছিল ব্রিটিশ-ভারতের ৩০ ভাগ। অর্থাৎ ব্রিটিশ-ভারতের শতকরা ৪৯ ভাগ অঞ্চলে চিরস্থায়ী ও অস্থায়ী জমিদারি প্রথা চালু করা হয়েছিল। (৩) রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত — মাদ্রাজ, বোম্বাই, বেরার, আসাম, সিন্ধু ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে রায়তওয়ারী ব্যবস্থা কায়েম করা হয়। ব্রিটিশ-ভারতের শতকরা ৫১ ভাগ এই ব্যবস্থার অধীনে ছিল।[৩৯] এই প্রথায় জমিদার কিংবা মধ্যস্বত্বাধিকারী ছিল না ; রায়ত ছিলেন আইনত জমির মালিক এবং তাঁরা সরাসরি রাজস্ব দিতেন সরকারকে। কর নির্ধারিত হল ভূমির ভিত্তিতে, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের ভিত্তিতে নয়। কিন্তু খাজনার হার ছিল চড়া, অধিকাংশ রায়তের ক্ষমতার অতিরিক্ত। সুতরাং খাজনা দেবার জন্য প্রায়ই তাঁরা মহাজনদের কাছে জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার করতেন। এইভাবে চাষীর জমি ক্রমশ মহাজনদের কবলস্থ হওয়ার ফলে বাস্তবক্ষেত্রে রায়তওয়ারী অঞ্চলগুলিতে দ্রুতগতিতে জমিদারি প্রথার প্রসার ঘটিয়েছে। হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, ব্রিটিশ-ভারতের 'মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ে শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশি জমি চাষীরা নিজের হাতে চাষ করে না।'[৪০] অর্থাৎ রায়তওয়ারী এলাকায় রায়তেরা রিক্ত-নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন এবং তাঁদের জমি হস্তগত করে অকৃষকেরা জমিদার হয়েছেন।

জমিদারি প্রথা ও রায়তওয়ারী প্রথার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহের রায়তদের অবস্থা সম্পর্কে রামমোহন বলেছেন, "উভয় প্রথার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহের রায়তেরা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। একটিতে তাঁরা ভূস্বামীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অর্থলালসার শিকারহয়েছেন, অন্যটিতে সরকারি জরিপ-বিভাগের কর্মচারীদের কিংবা রাজস্ব-আদায়কারী অফিসারদের হীন ষড়যন্ত্র ও বলপ্রয়োগের কাছে তাঁরা অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন। উভয় অংশের রায়তদের প্রতি আমার গভীর সহানুভূতি রয়েছে।[৪১]

তাসত্ত্বেও রাজা রামমোহন রায়তওয়ারী-ব্যবস্থার তুলনায় জমিদারি-ব্যবস্থাকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করেছেন এবং জমিদারি-ব্যবস্থার অধীনে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার যে উন্নতি ঘটেছে, তা তিনি বলেছেন। তাঁর মতে "রায়তেরা পূর্বেকার তুলনায় বর্তমানে ভালো অবস্থায় আছেন।"[৪২] কিন্তু রায়তদের সম্পর্কে রামমোহনের দাবি কি ইতিহাস-সম্মত? প্রকৃতই কি ব্রিটিশ-যুগের রায়তেরা ব্রিটিশ-পূর্ববর্তী-যুগের তুলনায় ভালো অবস্থায় ছিলেন? সে-যুগের ইতিহাস কিন্তু বিপরীত কথাই বলে। রামমোহনের বক্তব্যের সমর্থন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। রামমোহনের সমকালের ইতিহাস হল অসহায় কৃষকের রক্তক্ষরণের ইতিহাস; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা সৃষ্ট নয়া জমিদারদের শোষণ-নিপীড়নের নৃশংসতার পরিচয় পাওয়া যায় কোম্পানির কর্মচারীদের বিবৃতিতে ও সেকালের সংবাদপত্রে।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট কোম্পানিকে লিখেছেন, "ইংরেজমাত্রেরই ইহা মনে করিতে ক্লেশ হইবে যে, কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করিবার পর এই দেশের লোকের অবস্থা পূর্বের অপেক্ষা অনেক খারাপ হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে সত্য, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এই সুন্দর দেশে স্বেচ্ছাচারী রাজাদের অধীনেও স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ ছিল, কিন্তু যখন ইহার শাসনভার প্রধানত ইংরেজদের হাতে আসিল তখন হইতে ইহা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে।"[৪৩]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে ডাঃ ফ্রান্সিস বুকানন কর-আদায়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে ১৮০৭-১৪ সালে সমগ্র উত্তর ভারতে তদন্ত করেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে বাংলার দিনাজপুর জেলা সম্পর্কে লিখেছেন, "অধিবাসীরা এই মর্মে অভিযোগ জানাইয়াছে যে, মোগল-আমলের রাজকর্মচারীরা প্রায়শ: তাহাদের নিকট হইতে জোরজবরদস্তি করিয়া কর আদায় করিয়াছেন এবং তাহাদের সব সময়েই অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও তাহারা সেই অনাচারেরই পক্ষপাতী। কারণ বর্তমানে বকেয়া খাজনার দায়ে তাহাদের জোতজমি বেচিয়া দিবার যে-ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে তাহা অধিকতর অসহনীয় বোঝা। অধিকন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎকোচের অবাধ রাজত্ব। অধিবাসীরা আরও জানাইয়াছে, পূর্বে ঘুষ ইত্যাদি লইয়াও সর্বসাকুল্যে তাহাদের যে-পরিমাণ অর্থ দিতে হইত বর্তমানে তাহাদের তাহার দ্বিগুণ অর্থ দিতে হয়।"[৪৪]

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ হেবার লিখেছেন, "বর্তমানে যে-হারে কর ধার্য করা হইয়াছে তাহাতে দেশীয় বা ইউরোপীয় কোনো কৃষকের পক্ষেই চলা সম্ভব নয়। জমির উৎপাদনের অর্ধেকই গবর্ণমেন্টের পাওনা। ...হিন্দুস্থানের (উত্তর ভারত) সরকারি কর্মচারীমহলের সাধারণ অভিমত (কতকগুলি ঘটনার অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহাদের অভিমতের সহিত আমিও একমত) এই যে, দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাবর্গের তুলনায় কোম্পানি-শাসিত প্রদেশগুলির অবস্থা খারাপ; এইসব প্রদেশের কৃষকরা অধিকতর দরিদ্র, অধিকতর ভগ্নোদ্যম। ...আসল ব্যাপার এই যে, কোনো দেশীয় নৃপতিই আমাদের ন্যায় এত বেশী খাজনা দাবি করেন না।"[৪৫]

'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা মন্তব্য করেছেন (১০. ৫. ১৮৩৩), "দরিদ্র শ্রমজীবীর অধিকার এখনো পর্যন্ত তাঁদের উপরওয়ালাদের খেয়াল-খুশীর উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। ... এবং আমরা বিস্মিত নই যে, দরিদ্র কৃষক যেমন খারাপ অবস্থায় ছিল, তেমনি রইল।"[৪৬] এই পত্রিকা পুনরায় লিখেছেন, রায়তদের দারিদ্র্যের "প্রধান কারণ ছিল, বিনীত ভাবেই বলছি, জমির উৎপাদনের সর্বাধিক ভাগ নেবার জন্য সরকারের উদগ্র বাসনা। মাননীয় কোম্পানির সরকারের সমস্ত রকমের খাজনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। স্যার টমাস মনরোর রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের কথাই ধরা হোক কিংবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথাই ধরা হোক —এই দুই বন্দোবস্তের মূলে ছিল অত্যধিক রাজস্ব-নির্ধারণের নীতি। তাই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, বরং বুঝাই যায় যে, তাঁরা উভয় ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন। রায়তদের অবস্থার উন্নতি করা যদি ব্রিটিশ-সরকারের আন্তরিক ইচ্ছা (যে-কথা তাঁরা চিরকাল বলে এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও বলবেন) থাকত, তাহলে তাঁরা অন্যায়ের মূলে আঘাত করতেন —তাঁরা রায়তদের খাজনার বোঝা কমাতেন। যতক্ষণ তা না করা হচ্ছে, তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের সকল চেষ্টাই নিষ্ফল। এর কারণও পরিষ্কার। যখন সরকার জমির উৎপাদনের একটা বড় অংশ নিয়ে নেন, তখন রায়ত-পরিবারের জীবনধারণের জন্য ও পরের বছরের শস্য উৎপাদনের জন্য অল্পই ফসল অবশিষ্ট থাকে। এই অবস্থায় অসহায়তা ও দারিদ্র্য ছাড়া আর কি আমরা আশা করতে পারি? .. এটা সুস্পষ্ট যে, উৎপন্ন ফসলের উপরে অত্যধিক কর-ধার্যের জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়। কারণ তা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন-কে ব্যাহত করে এবং তার ফলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে সোজাসুজি আঘাত করে। ব্রিটিশ-সরকার ভারতবর্ষে এই ভ্রমাত্মক নীতিগুলির দ্বারা চালিত হচ্ছে। তাঁরা ফসলের উপরে যত বেশি সম্ভব কর আরোপ করছেন এবং দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উপরে অতীব ক্ষতিকর শুল্ক ধার্য করছেন। এই কাজের যা সম্ভাব্য ফল তাই ঘটেছে —অনশনরত জনসাধারণ ও দারিদ্রপূর্ণ দেশ।"[৪৭]

কার্ল মার্কস লিখেছেন, "হিন্দুস্থানের সমস্ত ঘটনা পরম্পরা যতই বিচিত্র রকমের জটিল, দ্রুত ও বিধ্বংসকারী বলে মনে হোক না কেন, এই সব কিছু গৃহযুদ্ধ, অভিযান, বিপ্লব, দিগ্বিজয় ও দুর্ভিক্ষ তার উপরিভাগের নীচে নামেনি। ... ভারতীয় অতীতের রাজনৈতিক চেহারাটা যতই পরিবর্তনশীল বলে মনে হোক না কেন, সুদূর পুরাকাল থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত তার সামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিত থেকেছে।"[৪৮] অর্থাৎ প্রাক্-ব্রিটিশ-যুগে রাষ্ট্রক্ষমতা নানাবিধ সংঘর্ষের মাধ্যমে হস্তান্তর ঘটলেও তার কোনো প্রতিক্রিয়া গ্রামীণ জীবনে ঘটেনি —কোনো সরকার এদেশের ভূমি-ব্যবস্থা পরিবর্তনে উদ্যোগী হননি। কিন্তু ব্রিটিশ-সরকার এমন এক ভূমি-নীতি গ্রহণ করেছেন যার ফলে রায়তের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। মার্কস অন্যত্র বলেছেন, "রায়ত হল ফরাসী চাষীর এক অদ্ভুত ধরণ —জমিতে তাদের নেই কোনো মৌরসী পাট্টা আর ফসলের সঙ্গে সঙ্গে

প্রতি বছর বদলাচ্ছে করভার। ...যেমন মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে তেমনি বাংলায়, যেমন রায়তওয়ারী প্রথায় তেমনি জমিদারিতে, রায়তেরা অসহ্য রকমের দুঃস্থ হয়ে পড়েছে।"[৪৯]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত সম্পর্কে রাজা রামমোহনের মনোভাবের পরিচয় দিতে গিয়ে রামমোহন-জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "রাজার মতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জমিদারী সকলে বাংলা দেশের ন্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক।"[৫০] অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায়তওয়ারী-ব্যবস্থার পরিবর্তে জমিদারি-প্রথাকে আদর্শ ভূমি-ব্যবস্থা বলে মনে করেছেন এবং সেকারণেই তিনি বাংলাদেশে জমিদারি-প্রথা অবসানের বিরোধিতা করেছেন।

রাজা বলেছেন, "বাংলা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উত্তর ভারতের প্রদেশগুলিতে ভূমধ্যকারীদের সঙ্গে এরূপ কোনো ভূমি-বন্দোবস্ত (অর্থাৎ জমিদারি প্রথা—লেখক) এখনো চালু হয়নি।"[৫১] তার ফলে রাজার মতে এই সমস্ত অঞ্চলের জমিদাররা প্রচণ্ড আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হয়ে ক্রমশ ধ্বংসের পথে চলেছেন। তিনি বলেছেন, সরকার যদি মাদ্রাজ-বিভাগের মতো দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জমিদারিগুলি দখল করে রায়তওয়ারী-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতেন, তবে "বাংলা-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত কোম্পানি-অধিকৃত অঞ্চলসমূহের ভূস্বামীদের মতো বাংলার জমিদাররা শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হতেন অথবা তাঁরা মাদ্রাজের বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদারদের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন এবং তার ফলে সকল শ্রেণীর মানুষকে একই রকমের দারিদ্র্যে নিক্ষেপ করা হত।"[৫২] সুতরাং রামমোহন মনে করেন, "রাজস্ব-আদায়ের ভিত্তি হিসাবে কালোপযোগী সংশোধনের দ্বারা পরি-মার্জিত সেই ব্যবস্থা (অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত —লেখক) এদেশে বহাল রাখা উচিত।"[৫৩]

রায়ত-প্রজাদের পরিবর্তে জমিদার-মধ্যশ্রেণীর প্রতি রাজার গভীর সহানুভূতি-পূর্ণ মনোভাব দেখে বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, "রাজা দেশে এক স্বচ্ছল মধ্যবিত্তশ্রেণী বজায় রাখার পক্ষে ছিলেন। সে-জন্য তিনি রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের পরিবর্তে জমিদারি বন্দোবস্ত চেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, এর ফলে জমিদারি-ব্যবস্থায় অন্তত একটি শ্রেণী স্বচ্ছল হবে, কিন্তু রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে সকলেই দরিদ্র থাকত।"[৫৪] অতএব, একথা বলা যায়, রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় জমিদার-মধ্যশ্রেণীর অর্থনৈতিক আধিপত্য অবলুপ্তির সম্ভাবনা থাকায় রাজা রামমোহন শ্রেণীস্বার্থে রায়তওয়ারীর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন এবং সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতে জমিদারি-প্রথা প্রবর্তনের পক্ষে জোর সওয়াল করেছেন।

ভূস্বামীশ্রেণী আইনগত অধিকারের সুযোগ নিয়ে নানান অজুহাতে রায়ত-প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি করে চলেছেন; তা সমালোচনা করে ৭ নং প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন বলেছেন, "১৭৯৩ সাল থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগ নিয়ে এবং

এই ভূমি-ব্যবস্থা থেকে লব্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভূম্যধিকারীরা খাজনা বাড়ানোর প্রতিটি পন্থা গ্রহণ করেছেন।"[৫৫] তিনি ১১নং প্রশ্নোত্তরে বলেছেন, "আইনে খাজনার হার নির্দিষ্ট করে দেওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে এমন কোনো নির্দিষ্ট হার নেই যা রায়ত-প্রজাদের নিশ্চিন্ত করতে পারে।"[৫৬] এবং "নানাভাবে প্রায়ই প্রজাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধি করা হয়।"[৫৭] সুতরাং জমিদারদের এই শোষণ-স্পৃহাকে দমন করার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসানের দাবি উত্থাপনের পরিবর্তে রামমোহন রায়তদের রক্ষার জন্য কেবলমাত্র তাঁদের খাজনা হ্রাস করার কথা বলেছেন। জমিদারি-প্রথা উচ্ছেদের দাবি 'সে-যুগে কালোপযোগী ছিল না। কিন্তু তাঁর মত একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত ও তেজোময় ব্যক্তি যিনি তাঁর যুগের চেয়েও অনেক বেশি দূরের চিন্তা করতেন, তাঁর পক্ষে এই কাজ (আমাদের কাছে) বিভ্রান্তিকর।"[৫৮]

কিন্তু রায়তদের খাজনা-হ্রাসের দরুণ ভূস্বামী শ্রেণীর আয়-হ্রাসের সম্ভাবনা থাকায় রাজা জমিদারদেরও সমানুপাতিক হারে রাজস্ব-হ্রাসের দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, "যেখানে খাজনা অত্যধিক, সেখানে ভূম্যধিকারীদের দেয় রাজস্বের আনুপাতিক হ্রাস ঘটিয়ে কোম্পানি-সরকার ভূম্যধকারীদিগকে কৃষকদের দেয় খাজনা হ্রাস করতে পারেন।"[৫৯] পার্লামেণ্টারি সিলেক্ট কমিটির কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে রাজা একই কথা বলেছেন, কোম্পানি সরকার "কৃষকদের দেয় খাজনার এবং ভূস্বামীদের দেয় রাজস্বের আনুপাতিক হ্রাস ঘটাতে পারেন।"[৬০] দিলীপকুমার বিশ্বাস কর্তৃক উপস্থাপিত স্মারকলিপিতেও রাজা অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন ("without depriving the zumeendars of those revenues."[৬১])।

'যাহারদিগকে উপর্য্যুপরি জমীদার পত্তনীদার ইজারাদার ও দরইজারাদার এই চারি প্রভুর লোভানলে আহুতি দান করিতে হয়, তাহারা যে কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করে, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না।'[৬২] কিন্তু রাজা রামমোহন রায়তদের রক্ষার জন্য কেবলমাত্র তাঁদের খাজনা-হ্রাসের দাবি জানিয়ে জমিদারদের দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করতে চান না। তাই মাদ্রাজ-বিভাগের জমিদাররা কোনো সুযোগ-সুবিধা লাভ না করায় তিনি রায়তওয়ারী-ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছেন, বাংলাদেশে জমিদারি-প্রথা অবসানের বিরোধিতা করেছেন এবং রায়তদের সঙ্গে সঙ্গে ভূম্যধিকারীদেরও খাজনা-হ্রাসের দাবি জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, "তিনি (রামমোহন) পুনরায় ভূস্বামীদের রাজস্ব-হ্রাসের জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছেন এবং আনুপাতিক হারে কৃষকদের খাজনা-হ্রাসের জন্য সরকারকে বলেছেন।"[৬৩]

অথচ রামমোহন-মূল্যায়ন করতে গিয়ে একালের একজন বুদ্ধিজীবী বলেছেন, "শুধু করবৃদ্ধি নিষিদ্ধকরণই দাবি করলেন না রামমোহন, দাবি করলেন কর কমিয়ে দেওয়া হোক। রায়তদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার এক প্রস্তাব

দিলেন, জমিদারর‍া যাতে জমির খাজনা বাড়িয়ে দরিদ্র চাষীদের বিব্রত করতে না পারে।"[৬৪] বিদগ্ধ ইতিহাসবিদ ডঃ. সুশোভন সরকার রামমোহনের রায়ত-প্রীতির পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর রচনা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি [৬৫] দিয়েছেন : "পুনরায় মাপজোক বা খাজনাবৃদ্ধি বা কোনো অজুহাত অনুমোদন করা হবে না" ; "আমি বলতে ব্যথিত যে, চাষীদের আইনগত রক্ষাকবচ একেবারেই আশানুরূপ নয়।" "এটাই প্রচলিত যে, চাষীদের খাজনার হার অথবা পরিমাণের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই যা তাঁদের নিরাপত্তা দিতে পারে ;" "যেখানে খাজনা খুব বেশী, সেখানে জমিদারের কাছে প্রজার দেয় খাজনা কমাতে হবে।" এই সমস্ত বক্তব্যের সমর্থনে একজন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী বলেছেন যে, রামমোহনের ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত "চিন্তাধারায় ফিউডাল পিছুটান তাঁর ছিল না।"[৬৬] এবং "হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির কাছে তিনি যে বক্তব্য পেশ করেন তাতে কোথাও সামন্তবাদী প্রবণতা বা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের তোষণনীতি ব্যক্ত হয়নি।"[৬৭]

এঁদের সকলের বক্তব্য এক ধাঁচের ; কিন্তু এঁরা কেউই রাজা রামমোহনের কৃষি-সম্পর্কিত সামগ্রিক চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেননি ; এঁরা ইতিহাসকে খণ্ডিত করেছেন, বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এঁরা রায়ত-কৃষকের জন্য রামমোহনের কর-হ্রাসের দাবির কথা সোচ্চারে বলেছেন, কিন্তু রাজা যে জমিদারদের জন্য সমানুপাতিক হারে রাজস্ব-হ্রাসের দাবি করেছিলেন, সে-কথা এঁরা উল্লেখ করেননি। নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে এঁরা সুবিধামত রামমোহনের রচনা থেকে বিচ্ছিন্ন-খণ্ডিত উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন, সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দেননি। ইতিহাস-নিষ্ঠার পরিবর্তে এঁরা কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়ে মনগড়া মন্তব্য করেছেন। তাই এঁদের মূল্যায়নে রামমোহনের রায়ত-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, রাজার জমিদার-দরদী মনোভাবের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অথচ রাজা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধী ছিলেন না, সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতে এই বন্দোবস্ত প্রবর্তনের দাবি করেছেন এবং দেশে সমৃদ্ধশীল জমিদার-মধ্যশ্রেণী প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত রাজার সামগ্রিক চিন্তাধারায় এই সত্যটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

রাজা উৎপীড়ক জমিদার ও উৎপীড়িত প্রজাদের সমদৃষ্টিতে বিচার করেছেন। তিনি ভূস্বামীদের রক্ষা করেই রায়তদের রক্ষা করতে চেয়েছেন। বর্ধিত হারে খাজনা আদায় ছাড়াও আবওয়াব ইত্যাদি আদায় করার জন্য ভূম্যধিকারীশ্রেণী প্রজাদের উপরে অমানুষিক নির্যাতন চালাতেন, সে-কথা রামমোহনও বলেছেন।[৬৮] কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের খাজনা ফাঁকি (?) দেবার প্রচেষ্টাকে উল্লেখ করতে রাজা ভোলেননি, "অন্যদিকে, মালিকদের পক্ষে কর্মরত ম্যানেজারদের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ায় রায়তেরা প্রায়ই রেহাই পেয়ে থাকেন।"[৬৯]

রায়ত-প্রজাদের অসহায় অবস্থার কথা উল্লেখ করে রামমোহন বলেছেন, "যখন

প্রচুর শস্য উৎপাদিত হয় এবং শস্যের দাম কমে যায়, তখন জমিদারদের পাওনা মেটাতে গিয়ে প্রজাদের সস্তা দরে সমস্ত শস্য বিক্রি করে দিতে হয়। ফলে বছরের বাকি সময়ে যখন শস্যের অভাব ঘটে, তখন চাষের বীজ ও নিজেদের খাওয়ার জন্য তাঁদের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।"[৭০] তাঁর মতে চাষীদের কাছ থেকে বকেয়া খাজনা আদায় করার জন্য তাঁদের গ্রেপ্তার করা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে বিক্রি করা প্রভৃতি নানাবিধ দমন-পীড়নের কাজে ভূস্বামীদের সঙ্গে সহযোগিতা করত পুলিশ-আদালত।[৭১] তাসত্ত্বেও রাজা শোষক ও শোষিতকে একই মানদণ্ডে বিচার করেছেন। তাই অর্থহীন হয়ে যায়, যখন তিনি বলেন, "এই হল কৃষিজীবীদের বেদনাদায়ক অবস্থা, যা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করাও আমার কাছে সবচেয়ে বেশি বেদনাদায়ক।"[৭২] এই বেদনা প্রকাশ করা সত্ত্বেও রাজা মনে করেছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে অক্ষুণ্ণ রেখে রায়ত-প্রজাদের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটাতে হবে।

নির্দিষ্ট হারে খাজনার ভিত্তিতে রায়তদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার প্রস্তাব দেবার সময়ে রাজা ভূস্বামীশ্রেণীর স্বার্থহানির সম্ভাবনার কথা ভুলেননি। তাই তিনি সেকালে প্রজাদের এক বৎসরের দেয় খাজনার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ হারে খাজনা ধার্য করার পরামর্শ দিয়েছেন।[৭৩] রামমোহন-জীবনীলেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "রাজার মতে ...জমিদার ও প্রজার মধ্যেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। কিন্তু প্রজারা জমিদারকে যে খাজনা দিবে, তাহার উচ্চতম হার স্থায়ী রূপে নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক।"[৭৪] অথচ নয়া চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় রামমোহনের সমকালে রায়তদের খাজনা কল্পনাতীত বৃদ্ধি ঘটেছিল এবং তা প্রজাদের কাছে রাতের দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। বর্ধমানের কালেক্টরের মতে "বর্তমান অবস্থায় যতটা বহন করা সম্ভব, এদেশের খাজনা সম্পূর্ণভাবে ততটাই বৃদ্ধি করা হয়েছিল।"[৭৫]

তাছাড়া 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের চিরস্থায়িত্বের জন্য রামমোহন প্রজাদের দেয় খাজনাকে চিরস্থায়ী করতে বলেছেন বলে মনে করা অযৌক্তিক হবে না। কারণ তিনি বলেছেন, "বাংলা প্রেসিডেন্সীর নিম্নভাগের প্রদেশগুলোতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হওয়ার পর থেকে জমিদারগণ বর্তমান সরকারের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হয়ে আছেন, এটা সুবিদিত। ...সুতরাং আমাদের পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হবে না যে যদি কৃষক, জোতদার এবং কৃষি-শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও দেশের প্রতিটি অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রসারিত হয় তা হলে তারাও সমভাবে সরকারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে, এবং গণফৌজ গঠন করেই হোক অথবা অন্য যে কোন প্রকারেই প্রয়োজন হোক না কেন, তারা সরকারের প্রতিরক্ষায় আত্মনিবেদন করতে প্রস্তুত থাকবে। সেক্ষেত্রে, বিদেশে এবং একটি সুদূর সাম্রাজ্যে বৃটিশ-শাসনকে আপদ মুক্ত রাখার জন্য —সে আপদ আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রই হোক বা বহিঃশত্রুর আক্রমণই হোক —এদের উপরেই নির্ভর করা যাবে, বিরাট অর্থ ব্যয়

করে সর্বক্ষণ এক বিপুল সেনাবাহিনী প্রস্তুত রাখার আর প্রয়োজন থাকবে না।" আলোচ্য প্রতিবেদনে প্রজাদের দুরবস্থায় তাঁর সহানুভূতি সন্দেহাতীত, কিন্তু বৃটিশ-শাসনের স্থায়িত্বের উদ্বেগও সমান গুরুত্বে উপস্থাপিত। শুধু তাই নয়, মনে হয় এই সমস্যাটিই অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে। আরও উল্লেখনীয় যে, প্রজাদের খাজনার হার স্থায়ীভাবে নির্ধারিত করার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের রাজস্বের পরিমাণও আনুপাতিক হারে হ্রাস করার প্রস্তাবও ঐ প্রতিবেদনে করা হয়েছে। সুতরাং প্রজাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পূর্ণ নি:স্বার্থ ছিল কিনা, এ-প্রশ্নটিও বিবেচ্য।'[৭৬] কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বামপন্থী অধ্যাপক মন্তব্য করেছেন, "জমিদারশ্রেণী সাধারণভাবে বৃটিশ-শাসনেরই অনুগত ধ্বজাবাহী। কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে —রামমোহন রায় তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।"[৭৭]

সাম্রাজ্য-স্বার্থে ব্রিটিশ-সরকার ভারতে নানা ধরণের ভূমি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। বাংলাদেশে জমিদারি-প্রথার পরিবর্তে রায়তওয়ারী প্রথা প্রবর্তন করলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাঁরা লাভবান হবেন কিনা সেদিকে লক্ষ্য রেখেই পার্লামেণ্টারি সিলেক্ট কমিটি রামমোহনকে নানাবিধ প্রশ্ন করেছিলেন। রাজা রায়তওয়ারী-প্রথাকে তীব্র নিন্দা করে জমিদারি-প্রথা বহাল রাখার অনুকূলে মত প্রকাশ করেছিলেন ; কারণ এদেশে সমৃদ্ধশালী জমিদার মধ্যশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ও তাঁদের শক্তিবৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন রাজা রামমোহন। তিনি বিভিন্ন যুক্তি ও তথ্য উপস্থিত করে দেখিয়েছেন যে, রায়তওয়ারী-ব্যবস্থায় ভূমি-রাজস্বের বৃদ্ধি ঘটলেও তা সাময়িক, স্থায়ী নয় ;[৭৮] কিন্তু জমিদারি-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পূর্ববর্তী বৎসরগুলির তুলনায় স্থায়ীভাবে ভূমি-রাজস্বের বৃদ্ধি ঘটেছে এবং ব্রিটিশ-সরকার ও দেশীয় জমিদারেরা লাভবান হয়েছেন।[৭৯]

ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধির কারণ হিসাবে রামমোহন বলেছেন যে, স্থায়ীভাবে রাজস্ব নির্দিষ্ট হওয়ায় ভূস্বামীশ্রেণী অনাবাদী জমিগুলিতে চাষের ব্যবস্থা করতে ও চাষের উন্নতি করতে উৎসাহিত হয়েছেন।[৮০] তাছাড়া প্রশ্নোত্তরেও তিনি একই কথা বলেছেন, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারির উন্নতির জন্য রাজস্ব-বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকায় তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে পতিত জমিগুলিতে চাষের ব্যবস্থা করেছেন।"[৮১]

কিন্তু রাজার পূর্বোক্ত বিবৃতি বাস্তব ও তথ্যভিত্তিক নয় ; কারণ আয়-বৃদ্ধির জন্য স্বীয় ব্যয়ে পতিত জমিগুলি চাষযোগ্য করা স্বাভাবিক হলেও বাস্তবে তা ঘটেনি। জমিদাররা চাষের উন্নতির জন্য ও অনাবাদী জমিকে আবাদী করার জন্য কোনো চেষ্টাই করেননি, বরং তাঁরা 'নেপোয় মারে দই' প্রবাদটিকে কার্যকরী করেছেন। চাষীরা বনজঙ্গল কেটে জমি আবাদ করেছেন, আর জমিদাররা ক্রমাগত তাঁদের খাজনা বৃদ্ধি করেছেন।

সেকালের সাক্ষীরা রাজার বিবৃতিকে সমর্থন করেননি। জাস্টিস্ জর্জ ক্যাম্বেল বলেছেন (১. ৬. ১৮৬৪), "বড় বড় জমিদাররা কদাচিৎ দুই একজন ছাড়া,

নিজেদের জমিদারির উন্নতির জন্য একটি কপর্দকও খরচ করেন না। তিনি নিজে চাষ তো করেনই না, চাষের উন্নতির জন্য কোনো নতুন উন্নত কলাকৌশলও প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হন না। ...তিনি শুধু চাষীদের নিজেদের খরচে চাষ করার অনুমতি দেন এবং খাজনা ও অন্যান্য যা কিছু তাঁর নিজের পাওনা তা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করেন, যতটা পারেন বেশী করে আদায় করার চেষ্টা করেন।"[৮২]

জাস্টিস্ সিটনকার বলেছেন (১৯.৬.১৮৬৫), "কৃষিকাজের উন্নতির জন্য জমিদাররা কোনরকম দায়িত্ব পালন করেননি। চাষীদের মূলধন বা বীজ দিয়ে সাহায্য করা, সেচের ব্যবস্থা করা, পথঘাটের উন্নতি করা, এসব কর্তব্য তাঁরা পালন করেননি। ...বরং অধিকাংশ জায়গায় বনজঙ্গল হাসিল করে চাষীরা নিজেরাই আবাদের জমি বৃদ্ধি করেছে ...জমিদারদের জন্য এসব উন্নতি কিছু হয়নি, তাঁরা শুধু উন্নতির ফলটুকু ভোগ করেছেন।"[৮৩]

এরকম আরো অনেকের বিবৃতি উপস্থিত করা যায়। বক্তব্য সকলেরই এক — চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চাষীর সর্বনাশ হয়েছে, চাষের অবনতি ঘটেছে, সেচ-ব্যবস্থা অবহেলিত হয়েছে; চাষের উন্নতির জন্য ভূস্বামীশ্রেণী বিন্দুমাত্র কষ্ট স্বীকার করেননি। তাঁরা কৃষকদের রক্তে নিজেদের মেদ-বৃদ্ধি করেছেন। অথচ রামমোহন রায়তদের জন্য 'বেদনাবোধ' অনুভব করেছেন, তাঁদের সমর্থনে দু'-চারটি কথা বলেছেন, 'খুদকাস্ত'দের রায়তীস্বত্ব-দানের সপক্ষে বলেছেন, এমন কি জমিদারদের সমালোচনাও করেছেন; কিন্তু বুর্জোয়া-আদর্শে প্রভাবিত হলেও সামন্তশ্রেণীর স্বার্থে রাজা জমিদারি-প্রথা উচ্ছেদের দাবি জানাননি, কিংবা সাধারণভাবে সমস্ত রায়তদের রায়তীস্বত্বের অধিকার দেবার জন্য কোনো দাবি তিনি উত্থাপন করেননি। রায়তদের উন্নতির বিনিময়ে তিনি ভূস্বামীশ্রেণীকে দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করতে চাননি। অথচ "১৭৯৩ সনের রেগুলেশন অনুসারে কর্ণওয়ালিস যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করে বাংলাদেশে নতুন জমিদারি প্রথা এবং একটা নতুন জমিদারশ্রেণী সৃষ্টি করেন, তা এপর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক জীবনে একটা মারাত্মক অভিশাপ হয়েই থেকেছে।"[৮৪] তাই রামমোহনের সমকালে জমিদারি-শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষকেরা বারেবারে বিদ্রোহে-বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন।

কিন্তু হায়! রামমোহন নীরব। তাঁর জীবৎকালে সংঘটিত কৃষক-বিক্ষোভের কোনো চিত্র বা তার সমর্থনে কোনো উক্তি তাঁর রচনায় পাওয়া যায় না। জন্ম তাঁর সামন্ত-পরিবারে, জীবনধারণ রায়ত-রক্তে রঞ্জিত অর্থে, সম্পদ-বৃদ্ধি তাঁর কোম্পানির সঙ্গে বাণিজ্য-সূত্রে, সমাজে ধনীব্যক্তি-রূপে প্রতিষ্ঠা তাঁর বাণিজ্য-সূত্রে লব্ধ অর্থ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে জমিতে লগ্নি করে। গোবর্ধন দিকপতি নামক নেতার নেতৃত্বে যখন ৪০০ চোয়াড় ও পাইক কোম্পানির শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চন্দ্রকোনা পরগণা আক্রমণ করেছেন (জুলাই, ১৭৯৮ খ্রী:), প্রায় সমগ্র মেদিনীপুর জেলা যখন বিদ্রোহীদের দখলে, তখন রাজা রামমোহন

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রকোনা পরগণায় রামেশ্বরপুর নামে বড় তালুক কিনেছেন, ক্রমে ক্রমে জমিদারি বাড়িয়েছেন।

শিক্ষা-গ্রহণের সময়ে, বৈষয়িক ব্যাপারে ও কোম্পানির কাজে রামমোহন বাংলা-বিহারের বিভিন্ন মফঃস্বল অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন। এই সময়ে কোম্পানির কর্মচারীদের নৃশংস অত্যাচার, জমিদার-মহাজনদের নিষ্ঠুর শোষণ-উৎপীড়ন আর জমিহারা কৃষকের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের প্রয়াস —এই সমস্ত চিত্র মফঃস্বল-বাসের সময়ে স্বাভাবিকভাবেই রামমোহনের চোখে পড়েছে, কানে এসেছে ; কিন্তু এ-সম্পর্কে তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়ার পরিচয় তাঁর রচনায় পাওয়া যায় না। এ-বিষয়ে রামমোহনের জীবনীকারেরা ও সমর্থকেরা নীরব ; যদিও তাঁরা ভাগলপুরে জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ-রাজকর্মচারীর সঙ্গে রামমোহনের ব্যক্তিগত সংঘর্ষের কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। রামমোহনের অর্থনৈতিক স্বার্থ ভূসম্পত্তির সঙ্গে জড়িত ছিল বলেই তাঁর বুর্জোয়া-দৃষ্টিভঙ্গি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং সে-কারণেই তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে কথা বলেছেন, জমিদার-মধ্যশ্রেণীকে শক্তিশালী করতে চেয়েছেন এবং কৃষক-বিদ্রোহ সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। যদিও রায়তদের সমর্থনে তিনি দু'-চার কথা বলেছেন, তাঁদের জন্য 'বেদনা' অনুভব করেছেন ; কিন্তু তা ছিল মূল্যহীন। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ও শোষণমূলক আইনগুলির উচ্ছেদ ছাড়া সামন্ত-শোষণ বন্ধ হয় না এবং কৃষকের মুক্তিলাভ ঘটে না।

সুতরাং রাজা রামমোহনের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিক মূল্যায়ন করে একথা বলা যায়, 'ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার সময় থেকে আরম্ভ করে পার্লামেণ্টে রাজস্বসংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করা পর্যন্ত সর্বস্তরেই রামমোহন ব্যবহারিক রাজনৈতিক মনোভঙ্গি ও আচরণের প্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে অন্বিত থেকেছেন এবং থাকতে চেয়েছেন।'[৮৫] এবং অন্যান্যদের প্রভাবিত করেছেন। তাই রাজা রামমোহনের জীবনাবসানের (২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) পরে তাঁর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আদর্শকে বহন করেছিলেন 'আত্মীয়সভা' ও 'ধর্মসভা'র মিলিত ভূস্বামী-সংগঠন —Landholders' Society। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগিতা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে আত্মবিস্তার ও সামাজিক-নেতৃত্ব অধিকার —এই ছিল উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কারকদের প্রধান লক্ষ্য। ব্রিটিশ-শক্তিনির্ভর দেশীয় বণিক-জমিদারদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে রাজার চিন্তায় ও কর্মে। সামন্ত-স্বার্থ ও বণিক-স্বার্থের প্রতিনিধি রাজা রামমোহনের চিন্তাধারায় ও কর্মকাণ্ডে ছিল স্ববিরোধিতা এবং সে-কারণেই উনিশ শতকের হিন্দুসমাজ-সংস্কার আন্দোলন সার্বিক পরিবর্তনের জন্য বাংলার গ্রামগুলিকে উদ্দীপিত করতে পারেনি। সামন্ত-স্বার্থ ও শিল্প-স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী বলেই এদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটল না — নবজাগরণের প্রাণ চাঞ্চল্য অনুভূত হল না বাংলাদেশের গ্রাম-জীবনে।

গ্রন্থ-নির্দেশ

প্রথম অধ্যায় : ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

১। সিরাজুল ইসলাম : বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো। পৃ: ৫
২। পূর্ণেন্দু পত্রী : পুরনো কলকাতার কথাচিত্র। পৃ: ২৪৫
৩। Sukumar Bhattacharya : The East India Company and the Economy of Bengal from 1704 to 1740. p. 17
৪। পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃ: ১১
৫। অতুল সুর : কলকাতা। পৃ: ২১-২২, ৩৯
৬। পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃ: ৫৮
৭। সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (১ম)। পৃ: ১২
৮। রমেশচন্দ্র মজুমদার . বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য়)। পৃ: ৩৭৯
৯। পূর্ববর্তী ৫ দ্রষ্টব্য। পৃ: ১০৬
১০। পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃ ৩৩
১১। সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় : বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা [১১০০-১৯০০ খ্রী:]। পৃ: ২৪৫
১২। J. C Marshman : History of Bengal, Vol. I. H 218
১৩। W. W. Hunter : Annals of Rural Bengal. p. 121
১৪। সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় : ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা (১৭৫১-১৮৫৫)। পৃ: ৮৬
১৫। পূর্ববর্তী ৭ দ্রষ্টব্য। পৃ: ১১৬
১৬। পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃ: ৬৮
১৭। পূর্ববর্তী ৭ দ্রষ্টব্য। পৃ ১৩-১৪
১৮। পূর্ববর্তী ৮ দ্রষ্টব্য। পৃ: ৩৭৯-৮০
১৯। Sirajul Islam : The Permanent Settlement in Bengal (1790-1819). p 9
২০। বিনয় ঘোষ : সূতানুটি সমাচার। পৃ: ১৯৮-৯৯
২১। বিনয় ঘোষ : বাদশাহী আমল। পৃ: ২০৮, ২১০
২২। পূর্ববর্তী ৮ দ্রষ্টব্য। পৃ. ৩৭৯
২৩। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। পৃ: ৯২

২৪। প্রাগুক্ত। পৃ: ৯২
২৫। পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃ: ২২৫-২৬
২৬। Sanjeebkumar Chatterjee : Bengal Ryots : Their Rights and Liabilities. Edited by A. C. Banerjee & B. K. Ghosh. Editors' Introduction. p. iii
২৭। পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃ: ২১০

দ্বিতীয় অধ্যায় : বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

১। Radhakamal Mukherjee : Land Problems of India. p. 16
২। K. Marx and F. Engels : On Colonialism. p. 309
৩। প্রাগুক্ত। পৃ: ৩১০
৪। বিনয় ঘোষ : বাংলার নবজাগৃতি। পৃ: ৫-৬
৫। প্রাগুক্ত। পৃ: ১০
৬। এন. এ. সিদ্দিকী : মোঘল-রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন-ব্যবস্থা (১৭০০-১৭৫০)। পৃ: ৪-৮
৭। বদরুদ্দীন উমর : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক। পৃ: ১-২
৮। গৌতম ভদ্র : মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ। পৃ: ২৯
৯। পূর্ববর্তী ৪ দ্রষ্টব্য। পৃ: ৪৪
১০। পূর্ববর্তী ৬ দ্রষ্টব্য। পৃ: ৪১
১১। পূর্ববর্তী ৪ দ্রষ্টব্য। পৃ: ৪৪
১২। Sirajul Islam : The Permanent Settlement in Bengal (1790-1819). pp 14-16, 18, 41, 42, 47 এবং সিরাজুল ইসলাম : বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো। পৃ: ১৫৯
১৩ বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা। পৃ: ১২
১৪ প্রাগুক্ত। পৃ. ১৩
১৫ আবদুল্লাহ্ রসুল : কৃষকসভার ইতিহাস। পৃ: ১২
১৬ রজনীপাম দত্ত : আজিকার ভারত (২য়)। পৃ: ৩৯
১৭ R. C. Dutta : The Economic History of India under Early British Rule. Vol. I. p. 46
১৮ নরহরি কবিরাজ : স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা। পৃ: ৩২
১৯ পূর্ববর্তী ১৬ দ্রষ্টব্য। পৃ: ৪১
২০। পূর্ববর্তী ১৩ দ্রষ্টব্য। পৃ: ১৮

২১। পূর্ববর্তী ১২ দ্রষ্টব্য (ইংরেজি গ্রন্থ)। পৃ: ১১
২২। প্রাগুক্ত। পৃ: ২২১
২৩। পূর্ববর্তী ৪ দ্রষ্টব্য। পৃ: ৪৮
২৪। প্রাগুক্ত। পৃ: ৪৮
২৫। সুপ্রকাশ রায় . ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (১ম)। পৃ: ১৩৫
২৬। পূর্ববর্তী ১৩ দ্রষ্টব্য। পৃ. ১৯
২৭। কার্ল মার্কস : ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী। পৃ: ১২৫-২৬
২৮। মার্কস-এঙ্গেলস : উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে। পৃ: ৮২
২৯। পূর্ববর্তী ১২ দ্রষ্টব্য (ইংরেজি গ্রন্থ)। পৃ: ৮২-৮৪
৩০। বিনয় ঘোষ : মেট্রোপলিটন মন, মধ্যবিত্ত, বিদ্রোহ। পৃ: ৮৭
৩১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ; রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য। পৃ: ৭৫
৩২। কিশোরীচাঁদ মিত্র : দ্বারকানাথ ঠাকুর (দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ কর্তৃক 'Memoir of Dwarkanath Tagore' গ্রন্থের অনুবাদ)। পৃ: ১০
৩৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম)। পৃ ১৯২
৩৪। পূর্ববর্তী ১২ দ্রষ্টব্য (ইংরেজি গ্রন্থ)। পৃ: ১৭৩ এবং অতুল সুর। কলকাতা। পৃ: ১২৯
৩৫। প্রাগুক্ত। পৃ: ১৮০-৮২ এবং প্রাগুক্ত। পৃ: ১২৯ ৩০
৩৬। অতুল সুর : কলকাতা। পৃ: ১২৮
৩৭। পূর্ববর্তী ১২ দ্রষ্টব্য (ইংরেজি গ্রন্থ)। পৃ: ১৭৪-৭৫
৩৮। প্রাগুক্ত। পৃ: ১৭৭
৩৯। প্রাগুক্ত। পৃ: ১৭৮-৭৯
৪০। প্রাগুক্ত। পৃ: ১৮৪
৪১। প্রাগুক্ত। পৃ: ১৮৫
৪২। প্রাগুক্ত। পৃ: ১৮৬-৮৭
৪৩। পূর্ববর্তী ৩৬ দ্রষ্টব্য। পৃ: ১৩১-৩২
৪৪। বিনয় ঘোষ : কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত। পৃ: ৪৬৮-৭৮
৪৫। পূর্ববর্তী ৩৬ দ্রষ্টব্য। পৃ: ১৩৩

তৃতীয় অধ্যায় : রায়ত-কৃষকের তিন শত্রু

১। Sirajul Islam : The Peramanent Settlement in Bengal (1790-1819). p. 3

২। বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য়)। পৃ: ৩৭
৩। প্রাগুক্ত (৩য়)। পৃ: ২৭৫
৪। সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (১ম)।
পৃ: ১৭৪
৫। রজনীপাম দত্ত : আজিকার ভারত (২য়)। পৃ: ৪২
৬। প্রাগুক্ত। পৃ: ৪২
৭। হেমচন্দ্র কানুনগো : বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা। পৃ: ১৭
৮। অরবিন্দ পোদ্দার : রামমোহন উত্তর পক্ষ। পৃ: ৩০
৯। বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা। পৃ: ২১
১০। পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য (১ম)। পৃ: ১৩৫
১১। প্রাগুক্ত (২য়)। পৃ: ১২৩
১২। পূর্ববর্তী ৮ দ্রষ্টব্য। পৃ: ২৮
১৩। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য।
পৃ: ৭৫
১৪। ঋষি দাস : রাজা রামমোহন। পৃ: ৩২
১৫। প্রাগুক্ত। পৃ: ৩৬
১৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : রামমোহন রায় (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা।
১ম খণ্ড, ১৬ সংখ্যা)। পৃ: ১৬
১৭। পূর্ববর্তী ৮ দ্রষ্টব্য। পৃ: ৩৪

চতুর্থ অধ্যায় : উনিশ শতকের কলকাতা

১। বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ। পৃ: ৬
২। বিনয় ঘোষ : বিদ্রোহী ডিরোজিও। পৃ: ৪৭
৩। পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃ: ২৫
৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম)। পৃ: ৯৬
৫। পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃ: ২৯৮
৬। অতুল সুর : কলকাতা। পৃ: ১৮৫
৭। পূর্ববর্তী ৪ দ্রষ্টব্য। পৃ: ২৩৯
৮। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। পৃ: ৫৬
৯। প্যারীচাঁদ মিত্র : ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত প্যারীচাঁদ রচনাবলী)। পৃ: ৪৫৯
১০। বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য়)। পৃ: ১০১
১১। পূর্ববর্তী ৬ দ্রষ্টব্য। পৃ: ১৯৩

১২। পূর্ববর্তী ৪ দ্রষ্টব্য। পৃ: ১২১
১৩। প্রমথনাথ মল্লিক : কলিকাতার কথা (মধ্যকাণ্ড)। পৃ: ১৪৩-৪৪
১৪। বিনয় ঘোষ : সুতানুটি সমাচার। পৃ: ৩৪২
১৫। Calcutta Gazette, 20th October, 1814
১৬। অতুল সুর : কলকাতার চালচিত্র। পৃ: ৪৪
১৭। পূর্ববর্তী ১৪ দ্রষ্টব্য। পৃ: ৩৩৫-৩৭
১৮। পূর্ববর্তী ৪ দ্রষ্টব্য। পৃ: ১২৩
১৯। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মজীবনী। পৃ: ৩৯
২০। কিশোরীচাঁদ মিত্র : দ্বারকানাথ ঠাকুর (দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ কর্তৃক 'Memoir of Dwarkanath Tagore' গ্রন্থের অনুবাদ)। পৃ: ৮১-৮৪
২১। প্রাগুক্ত। পৃ: ২৮৭
২২। পূর্ববর্তী ১০ দ্রষ্টব্য (৩য়)। পৃ: ৪৯৯
২৩। আবুল কাশেম চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নকশা : পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা (১৮২০-১৮৪৮)। পৃ: ৯১
২৪। বিনয় ঘোষ : মেট্রোপলিটন মন ● মধ্যবিত্ত ● বিদ্রোহ। পৃ: ২০
২৫। Calcutta Review. Vol IV, No. VIII. p, 364
২৬। Rev. K. S. Macdonald : Raja Rammohun Roy, The Bengali Religious Reformer p. 5
২৭। অরবিন্দ পোদ্দার : রামমোহন উত্তরপক্ষ। পৃ: ২৮
২৮। পূর্ববর্তী ২৩ দ্রষ্টব্য। পৃ: ৭৯

পঞ্চম অধ্যায় : উনিশ শতকের 'রেনেসাঁস'

১। বিনয়কৃষ্ণ দত্ত : ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বরূপ। পৃ: ৫
২। Mohit Moitra : A History of Indian Journalism, p. 7
৩। The English Works of Raja Rammohun Roy : Edited by K. D. Nag & D. Burman. Part IV, p. 95
৪। সুপ্রকাশ রায় : ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (১ম)। পৃ: ১৮৬
৫। Census Report, 1951. Vol. VI. Part IA. p. 437
৬। প্রাগুক্ত। পৃ: ৪৩৭
৭। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। পৃ: ৯১
৮। কাজী আবদুল ওদুদ : বাংলার জাগরণ। পৃ: ১
৯। যোগেশচন্দ্র বাগল : মুক্তির সন্ধানে ভারত কংগ্রেস পূর্ব যুগ। পৃ: ॥/০

১০। সুশীলকুমার গুপ্ত : উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ। পৃ: ১৫-১৬
১১। Alfred Von Martin : Sociology of the Renaissance. p. 3
১২। "এদেশে —বাংলাদেশে —নবজাগরণের সমসাময়িক কালে ঘটল বিপরীত ঘটনা।" —সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ : শিক্ষা ও শ্রেণীসম্পর্ক। পৃ: ১১
১৩। নরহরি কবিরাজ : বাঙলার জাগরণ : মার্কসীয় বিচার। নরহরি কবিরাজ কর্তৃক সম্পাদিত 'উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক'। পৃ: ১৬৩
১৪। প্রাগুক্ত। পৃ: ১৮৩
১৫। নরহরি কবিরাজ : বাঙলার জাগরণ ও ভদ্রলোক। ১৩ সংখ্যক টীকায় উল্লিখিত গ্রন্থ। পৃ: ২৬৪
১৬। বিনয় ঘোষ : বাংলার নবজাগৃতি। পৃ: ১২৪
১৭। উৎপল দত্ত : শেক্সপীয়ারের সমাজচেতনা। পৃ: ২০
১৮। Karl Marx : Capital. Part VIII, p. 787
১৯। প্রাগুক্ত। পৃ: ৭৮৬
২০। প্রাগুক্ত। পৃ: ৮৩৪
২১। প্রাগুক্ত। পৃ: ৮৩৫-৩৬
২২। মার্কস-এঙ্গেলস : উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে। পৃ: ৩৭, ৪৩
২৩। পূর্ববর্তী ১৩ দ্রষ্টব্য। পৃ: ১৬০-৬১
২৪। পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য। পৃ: ২৩
২৫। পূর্ববর্তী ৪ দ্রষ্টব্য। পৃ: ১৮৩
২৬। পূর্ববর্তী ১৬ দ্রষ্টব্য। পৃ: ১৫৩
২৭। পূর্ববর্তী ২ দ্রষ্টব্য। পৃ: ৫১
২৮। পূর্ববর্তী ১ দ্রষ্টব্য। পৃ: ১১
২৯। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। পৃ: ৩৮৪
৩০। রামমোহন রচনাবলী : অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত। পৃ: ৩০৪
৩১। R. C. Majumdar : On Rammohun Roy. p. 43
৩২। N. S. Bose : The Indian Awakening And Bengal. p. 175
৩৩। পূর্ববর্তী ৩০ দ্রষ্টব্য। পৃ: ১৫৩
৩৪। পূর্ববর্তী ৩ দ্রষ্টব্য। পৃ: ১০৬
৩৫। প্রাগুক্ত। পৃ: ১০৭
৩৬। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী। পৃ: ১২৬
৩৭। পূর্ববর্তী ৩ দ্রষ্টব্য। পৃ: ৯৫

৩৮। পূর্ববর্তী ৩১ দ্রষ্টব্য। পৃ: ৪০
৩৯। S. D. Collet : The life and letters of Raja Rammohun Roy, Edited by D. K. Biswas & P. C. Ganguli. p. 212
৪০। পূর্ববর্তী ১৬ দ্রষ্টব্য। পৃ: ১৩৮
৪১। Arabinda Podder : Renaissance in Bengal —Quests and Confrontations, 1800-1860. pp. 61-62
৪২। পূর্ববর্তী ৩ দ্রষ্টব্য (৪র্থ)। পৃ: ৩, ৪
৪৩। প্রাগুক্ত (৩য়)। পৃ: ৮৫
৪৪। প্রাগুক্ত (৪র্থ)। পৃ: ৮৩
৪৫। পূর্ববর্তী ৪ দ্রষ্টব্য। পৃ: ১৯৪
৪৬। পূর্ববর্তী ৩ দ্রষ্টব্য (৩য়)। পৃ: ৫০-৫১ ; প্র: ৪৮ এবং পৃ: ৮১-৮২
৪৭। B. B. Majumdar : History of Indian Social and Political Ideas. p. 36
৪৮। পূর্ববর্তী ৩ দ্রষ্টব্য (৪র্থ)। পৃ: ৮
৪৯। প্রাগুক্ত (৩য়)। পৃ: ৬৭
৫০। প্রাগুক্ত (৪র্থ)। পৃ: ১২
৫১। প্রাগুক্ত। পৃ: ১১
৫২। কৃষ্ণ কৃপালনী : দ্বারকানাথ ঠাকুর বিস্মৃত পথিকৃৎ। পৃ: ১৭
৫৩। প্রাগুক্ত। পৃ: ৮৮
৫৪। প্রাগুক্ত। পৃ: ৫০
৫৫। প্রাগুক্ত। পৃ: ৩৯
৫৬। প্রাগুক্ত। পৃ: ৮২-৮৩
৫৭। প্রাগুক্ত। পৃ: ৩৫৫
৫৮। প্রাগুক্ত। পৃ: ৮২
৫৯। প্রাগুক্ত। পৃ: ৩৯
৬০। প্রাগুক্ত। পৃ: ৮১
৬১। প্রাগুক্ত। পৃ: ৭৯
৬২। প্রাগুক্ত। পৃ: ৭৮
৬৩। প্রাগুক্ত। পৃ: ৭৮
৬৪। র. আ. উলিয়ানভস্কি : ভারতের সামাজিক আর্থনীতিক বিকাশ। পৃ: ২১

ষষ্ঠ অধ্যায় : আধুনিক শিক্ষা ও বাংলার কৃষক

১। মার্কস-এঙ্গেলস : উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে। পৃ: ৮৬

২। জে. ভি. স্তালিন : ভাষাবিজ্ঞানে মার্কসবাদ প্রসঙ্গে। পৃ: ৬৯
৩। প্রাগুক্ত। পৃ: ৬৬
৪। B. B. Majumdar : History of Indian Social and Political Ideas. p. 36
৫। The English Works of Raja Rammohun Roy : Edited by K D. Nag & D. Burman, Part IV. p. 3
৬। প্রাগুক্ত। পৃ: ৪
৭। প্রাগুক্ত। পৃ: ৮
৮। কুমুদকুমার ভট্টাচার্য : রামমোহন-ডিরোজিও : মূল্যায়ন (২য় সংস্করণ)। পৃ: ৩৯-৪১
৯। পূর্ববর্তী ৫ দ্রষ্টব্য (৪র্থ)। পৃ: ১৩২, ৬, ২৯, ১২
১০। কিশোরীচাঁদ মিত্র : দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ কর্তৃক অনূদিত। পৃ: ১২১
১১। কৃষ্ণ কৃপালনী : দ্বারকানাথ ঠাকুর বিস্মৃত পথিকৃৎ। পৃ: ১৯৮
১২। প্রাগুক্ত। পৃ: ২১৭
১৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য়)। পৃ: ৪৯৯
১৪। পূর্ববর্তী ১১ দ্রষ্টব্য। পৃ: ২২৫
১৫। প্রাগুক্ত। পৃ: ১৫২
১৬। R. C. Dutta : The Peasantry of Bengal. p. 2
১৭। রজনীপাম দত্ত : আজিকার ভারত (২য়)। পৃ: ৩৯
১৮। Mohit Moitra : A History of Indian Journalism. p. 7
১৯। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ : জনশিক্ষার প্রতিবন্ধক। নন্দন; শারদীয় সংখ্যা,
২০। কুমুদকুমার ভট্টাচার্য : আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা। পৃ: ১২
২১। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। পৃ: ৭২
২২। পূর্ববর্তী ১১ দ্রষ্টব্য। পৃ: ২৪
২৩। রাজনারায়ণ বসু : সেকাল আর একাল। পৃ: ২৬-২৭
২৪। বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা। পৃ: ৬৮
২৫। পূর্ববর্তী ২৩ দ্রষ্টব্য। পৃ: ২৪
২৬। পূর্ববর্তী ২০ দ্রষ্টব্য। পৃ: ২৪
২৭। পূর্ববর্তী ২১ দ্রষ্টব্য। পৃ: ৭০
২৮। প্রাগুক্ত। পৃ: ৭৫-৭৬
২৯। B. S. Goel & S. K. Saini : Mother Tongue and Equality of Opportunity in Education. p. 10
৩০। J. C. Marshman : History of Serampore Mission. Vol. 1 p. 63